কলকাতা ১৯২০-৪০: বাংলা সাহিত্যে যৌনতা এবং লিঙ্গসম্পর্কের উপস্থাপন ও বিন্যাস ভাঙনের সন্দর্ভকে লিঙ্গ-সচেতনতার প্রেক্ষিত থেকে বিশ্লেষণ

গবেষক

দেবলীনা ঘোষ

তত্ত্বাবধায়ক

ডঃ ইমন কল্যাণ লাহিড়ী

বিভাগীয় প্রধান, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

স্কুল অফ উইমেনস স্টাডিস-এর অধীনে পি. এইচ. ডি. উপাধির জন্য উপস্থাপিত সন্দর্ভ

রেজিস্ট্রেশন নং. – D-7/9SLM/65/15

রেজিস্ট্রেশনের তারিখ – ২৯/০৯/২০১৫

স্কুল অফ উইমেনস স্টাডিস

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

২০২২

CERTIFIED THAT THE THESIS ENTITLED

কলকাতা ১৯২০-৪০: বাংলা সাহিত্যে যৌনতা এবং লিঙ্গ সম্পর্কের উপস্থাপন ও বিন্যাস : ভাঙনের সন্দর্ভকে লিঙ্গ-সচেতনতার প্রেক্ষিত থেকে বিশ্লেষণ submitted by **Debalina Ghosh** for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in FISLM at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of **Dr. Iman Kalyan Lahiri** and that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere / elsewhere.

Countersigned by the

Supervisor .....

Candidate : Debalina Ghosh

Dated : 02/01/2023

Dated : 02/01/2023

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

গবেষণা সন্দর্ভটির প্রাথমিক খসড়া, তথ্য সংগ্রহ, পান্ডুলিপি তৈরি থেকে মুদ্রণ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন জনের সাহায্য, অনুপ্রেরণার কথা আমি গভীরভাবে অনুভব করি। প্রথমেই কৃতজ্ঞচিত্তে শ্রদ্ধা জানাই এই গবেষণাপত্রের তত্ত্বাবধায়ক ডঃ ইমন কল্যাণ লাহিড়ী মহাশয়কে, যিনি প্রতিটি পদক্ষেপেই দিয়েছেন প্রয়োজনীয় পরামর্শ, দিকনির্দেশ এবং কিভাবে গবেষণার কাজ শেষ করতে হবে তার সঠিক দিশা। আমার যাবতীয় ভুলত্রুটি ক্ষমা করেছেন অকুণ্ঠচিত্তে।

আমার শিক্ষক শ্রী অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সর্বময় সাহায্য, পরামর্শ এবং পাশে থাকা আমায় জীবনের প্রতিটি পর্বে সাহায্য করেছে, এবং করে চলেছে। তাঁর প্রতি জানাই আমার কৃতজ্ঞতা। ডঃ সঞ্জয় সাহা মহাশয় এবং ডঃ মানস ঘোষ মহাশয়কে সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করি। এঁদের দুজনের সাহায্য ব্যতিরেকে আমার গবেষণা সম্পূর্ণ হত না। ডঃ ঐশিকা চক্রবর্তীর সাহায্য ও অনুপ্রেরণা আমায় অশেষ সাহায্য করেছে। আমার কৃতজ্ঞতা জানাই তাঁকে। দুঃসময়ে প্রয়োজনীয় সমস্ত ধরণের সাহায্য দিয়ে আমায় কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন ডঃ অভ্র চন্দ মহাশয়।

কৃতজ্ঞতা আর ভালবাসা জানাই আমার বিভিন্ন বয়সী বন্ধুদের যারা গবেষণার প্রতিটি পর্বে আমার পাশে থেকেছে, কখনও বইয়ের সন্ধান এনে দিয়েছে, কখনও জানিয়েছে তাদের মূল্যবান মতামত, কখনও দেখে দিয়েছে প্রুফ এবং সহ্য করেছে আমার অন্যায় আবদার। সকলের নাম উল্লেখ করা সম্ভব নয় স্বল্প পরিসরে। অর্ণব, সোহিনী, সত্যব্রত, দেবব্রত, সৈকত, দেবায়ণী, দিব্যেন্দুদা, ফংচুদা, শবরদা, কৌশিক গুহ, সন্দীপ, প্রত্যয়দা, ডঃ সঞ্জীব মুখার্জী, বিলাস, শীর্ষ, বাপ্পাদিত্যের প্রতি আমার আন্তরিক ভালোবাসা

জানাই সবসময় আমায় সুপরামর্শদান এবং অনুপ্রাণিত করার জন্যে। গবেষণার প্রতিটি পর্বে আমার অত্যাচার সহ্য করে সন্দর্ভের মুদ্রণ এবং বাঁধাই শেষ করে সুন্দরভাবে গবেষণাপত্রটি যথাসময়ে আমার হাতে তুলে দেওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই সুরজিত ওরফে বাবুকে।

বিশেষভাবে স্মরণ করছি আমার মা, দিদি এবং তুরাই-কে এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের। যাদের প্রতি মুহূর্তের আবেগ, উদ্বেগ, উদ্দীপনা, অনুপ্রেরণা ও স্বার্থত্যাগের ফলে আমি আজ গবেষণার কাজ শেষ করতে পেরেছি। ধন্যবাদ জানাই রণজয় বন্দ্যোপাধ্যায়কে সব সময় পাশে থাকার জন্য। হয়ত অনেকের কথা বলা হল না, তাদের কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। কৃতজ্ঞতা জানাই আমার কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে যারা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করে এই গবেষণাসন্দর্ভটিকে সম্পূর্ণ করতে সাহায্য করেছেন। সর্বশেষ আমার দুইজন বন্ধুকে জানাই অকুণ্ঠ ভালোবাসা, কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাদের ছোট করব না, যারা ছাড়া আমার সমস্ত কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যেত— শুভাশিস সিংহ ঠাকুর এবং নির্মাল্য চন্দ।

তাং .....

পরিভাষা তালিকা

Affinity - সন্নিহিতি

Agent - করণিক/প্রতিনিধি

Allegorical - রূপকধর্মী

Atemporal zone - অ-কালিক পরিসর

Binary opposition - বিপরীতার্থক যুগ্মপদ/দ্বিত্ব

Concept of identity - পরিচিতির ধারণা

Conformist - প্রথাবাদী

Connotation - জাত্যর্থ

Contours - সীমান্যাস

Democratization - গণতন্ত্রীকরণ

Destabilized - বিস্থিত/স্থিতিচ্যুত

Determinism - নির্ধারণবাদ

Dichotomous - স্ববিরোধী

Discursive formation - তার্কিক সংগঠন

Dispassionate gaze - নিরাসক্ত চাহনি

Economy- অন্তঃবুনন/সংস্থান

Emblematic - প্রতীকস্বরূপ

Emotiveness - আবেগপ্রবণতা

Empathy - সহমর্মীতা

Erotic transfiguration – কামজ/কামদ রূপান্তর

Essentialist - অপরিহার্যতাবাদী

Ethnicity – কৌমসত্ত্বা

Exclusive - বহিষ্কারমুখী

Existence specific - অস্তিত্ব-নির্দিষ্ট

Exoticism - অদ্ভুতত্ব

Feminised - মেয়েলিকৃত

Foreclosed - প্রাকরুদ্ধ

Gender biased - লিঙ্গ-বৈষম্যমূলক

Gender insensitive - লিঙ্গ-অচেতন/অসংবেদী

Gender-centrism - লিঙ্গ-কেন্দ্রিকতা

Gendered intellect - লিঙ্গায়িত মনন

Generalizable - সাধারণীকরণযোগ্য

Grand narrative - অধি-আখ্যান

Hierarchy - ক্রমোচ্চ শ্রেণিবিভাগ/থাকবন্দী কাঠামো

Historicism - ইতিহাসবাদ

Historicity - ঐতিহাসিকতা

History of belonging - একাত্মতার ইতিহাস

Homeland - বাসভূমি

Homogeneous - সমসত্ত্ব

Imaginable – কল্পনাযোগ্য

Imaginary - কাল্পনিক

Inclusive – অন্তর্ভূক্তিমুখী

Ineffaceable - অনপনেয়

Inter-exchangeable – আন্তঃবিনিময়মুখী

Intersection - প্রতিচ্ছেদ

Intertextuality - আন্তঃরাচনিক

Irony - কৌতুকময় পরিহাস/বক্রোক্তি/প্রতিছলনা

Kinship – আত্মীয়তা/কৌমতা

Less deterministic - কম-নির্ধারিত

Linear - একরৈখিক

Literary criticism - সমালোচনা-সাহিত্য

Locale - অকুস্থল

Mass-market - গণ-বাজার

Methodological - প্রণালীবিদ্যাগত

Narrative - কাহিনি/আখ্যান

Normative discourse - মানদণ্ড নির্ণয়কারী/আদর্শ-স্থাপনকারী প্রতর্ক

Oxymoronic - বিরোধাভাস

Paradoxical - আপাত-বৈপরীত্য

Patrilocal - পিতৃস্থিত

Perennial - সনাতন

Personified - মৃন্ময়ী

Political - রাজনৈতিক

Political modernity - রাজনৈতিক আধুনিকতা

Politicization - রাজনীতিকরণ

Polular culture - জন/গণ সংস্কৃতি

Polular Sublime – জনপ্রিয় মহিমান্বিত/পরম

Problematize - সমস্যায়ণ

Problematized - সমস্যায়িত

Rupture - বিদারণ

Self-transcendence - আত্ম-দেহাতীত/নির্দেহাতীত

Sense of attachment - মায়া

Sentiment – আবেগ/ভাবাবেগ

Sentimentality - ভাবালুতা

Signified - জাত্যর্থ

Signifier - চিহ্নক/ শব্দ

Spectrality - ছায়ামূর্তি

Subalternized – নিম্নবর্গায়িত

Sublimation - ভাবসম্মিলন

Text - রচনা

Textuality - রাচনিকতা

Transitional – পরিবর্তনকালীন/রূপান্তরকালীন

Transport - স্থানান্তর

Trivialization – লঘুকরণ/মামুলিকরণ

Trivialized - মামুলিকৃত

Value - মান

Vernacularization – মাতৃভাষায়িত

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

স্বীকৃতি

পরিভাষা তালিকা ১ – ৫

ভূমিকা : ৬ – ৪৮
পরিবর্তনের রূপকল্প এবং অতিকথা

প্রথম অধ্যায় : ৪৯ – ৯২
'নবত্ব'-এর ধারণা ও লিঙ্গসম্পর্ক

দ্বিতীয় অধ্যায় : ৯৩ – ১৩০
আধুনিকতা, আধুনিকতাবাদ: সাহিত্যে লিঙ্গায়ণের স্বরূপ

তৃতীয় অধ্যায় : ১৩১ – ১৭৭
সাহিত্যে মনস্তত্ত্ব এবং প্রগতিবাদ: একটি নারীবাদী পাঠ

চতুর্থ অধ্যায় : ১৭৮ – ২১৭
জনপ্রিয় সাহিত্য: একটি লিঙ্গসচেতন অবিনির্মাণ

উপসংহার : ২১৮ – ২২৫
একটি আরম্ভের সূচনা

গ্রন্থতালিকা ২২৬ – ২৬১

ভূমিকা

পরিবর্তনের রূপকল্প এবং অতিকথা

... As the present now
Will later be fast
The order is rapidly fadin'
And the first one now
Will be the last
For the times they are a-changin'

Song by Bob Dylan.

অতীত বর্তমানের কাছে উপস্থাপিত হয় নানান আখ্যান-গল্প-কাহিনি-কিস্‌সা-কথাকণিকা অর্থাৎ ন্যারেটিভের মধ্যে দিয়ে। ইতিহাস রচনা প্রায়শই হয়ে ওঠে এমন এক প্রক্রিয়া যা বাছাই করা কিছু নিহিত স্মৃতিকে জাগিয়ে তুলে একটি অধি-আখ্যানের জন্ম দেয়। এভাবেই পরবর্তী সময়ের নির্মাণ ও পুনরুপস্থাপনায় অনেক ক্ষেত্রেই স্বাধীনতা পূর্ব কয়েকটি দশক, ব্রিটিশ বিরোধী মহাআখ্যানের এক সমসত্ত্ব একক হিসাবে উঠে আসে। যার আশেপাশে থেকে যায় অপরাপর স্রোতগুলি – সাংস্কৃতিক সংকট, সামাজিক পরিবর্তন, বিদ্রোহ, আত্মপরিচয়ের অনুসন্ধান, শাসকশ্রেণীর চরিত্র সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মানুষের নানাবিধ ধারণা ও ঔপনিবেশিক শাসনের সূত্র ধরে আসা আধুনিকতার সঙ্গে তাদের বোঝাপড়ার ইতিহাস।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করেছিল ভারত তথা বাংলাকে। যুদ্ধের বিস্তৃতি, মারণাস্ত্রের আবিষ্কার ও ব্যবহার, বৃহৎ সাম্রাজ্যগুলির গঠনে পরিবর্তন, পরাধীন দেশগুলির স্বাধীনতাকামী জাতীয়তাবাদ ও দেশাত্মবোধ, গণতন্ত্রের

প্রসার, যুব সমাজের জাগরণ, বিজ্ঞানের বিপুল উন্নতির পাশাপাশি পৃথিবীব্যাপী অর্থসংকট, জীবনযাত্রার মানের দ্রুত অবনমন, শ্রমিক, কৃষক ও নিম্নবিত্তের সঙ্গে মধ্যবিত্তের জীবনের ঘোর বিপর্যয়, সর্বোপরি ফ্যাসিবাদের উত্থান ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য চূড়ান্ত আকার নেয় উনিশ বিশ-তিরিশের দশকে। এর পাশাপাশি জাতীয় রাজনীতিতে গান্ধীজীর নেতৃত্বে আইন আমান্য আন্দোলনের সূত্র ধরে ঘটে বিপুল জনজাগরণ। ঔপনিবেশিক শাসনের নির্মমতার জেরে কারাবরণ করেন প্রায় তিরিশ হাজার সত্যাগ্রহী। এর অব্যবহিত পরেই আইন আমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। এই ঘটনার ঐতিহাসিক সম্ভাবনা বা সীমাবদ্ধতার বিচার বর্তমান নিবন্ধের সীমার বাইরে, তবু বলা যায় সমাজে তার প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী।

ব্যর্থতা-গ্লানি-লাঞ্ছনা-বিদ্রোহের বাস্তবতায় আত্মজিজ্ঞাসার নতুন পর্ব শুরু হয়। আমার উদ্দেশ্য হল আলোড়নপূর্ণ দুই দশকের (১৯২০-৪০) নতুন আত্মপরিচয়ের চিহ্ন-সম্বলিত সাহিত্যে যৌনতা ও লিঙ্গ-সম্পর্কের ধারণাকে পরখ ও পর্যালোচনা করা। এই অনুসন্ধান প্রাসঙ্গিক হবে কারণ তৎকালীন জাতীয়তাবাদী প্রতর্ক নারীকে নির্বাসন দিয়েছিল সংস্কৃতির *ভিতর পরিসরে* (*inner domain*)। সমসাময়িক সাহিত্য কতদূর পর্যন্ত লিঙ্গ-সম্পর্কের পুরুষ/পিতৃতান্ত্রিক ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করতে পেরেছিল বা আদৌ পেরেছিল কিনা সেটি পর্যালোচনা করাই আমার মূল উদ্দেশ্য। পরিবর্তন নাকি ধারাবাহিকতা, নাকি দুইয়ের মেলবন্ধন: এক্ষেত্রে মূল সুর কোনটি তা খুঁজে দেখতে চাই আমি। কারণ বহিরাঙ্গের পরিবর্তন হওয়া মানেই কিন্তু কাঠামোগত পরিবর্তন সবক্ষেত্রে ঘটে না। অনেক সময়ই বহিরাঙ্গে তথাকথিত ‘প্রগতিশীল’ চিহ্ন দেখা গেলেও সামগ্রিকভাবে তা পিতৃ/পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতার প্রভাবে আচ্ছন্ন থাকে। ভাষার কাঠামোর ভেতরেই ক্রিয়াশীল থাকে লিঙ্গ-বৈষম্য ও পিতৃতন্ত্রের মূল্যবোধ।

রচনা/ভাষ্যের ভেতরে পৌরুষ ও প্রাধান্যকারী যৌনতা-ধারনার চিহ্নগুলো প্রায়শই থেকে যায়। ফলত এই প্রশ্নগুলোর প্রতি উদাসীন বা অসচেতন থাকলে সামাজিক ইতিহাসচর্চার পরিসরও সীমাবদ্ধ হয়ে পড়তে পারে।

সমকালীন ও পরবর্তী রাচনিক উপস্থাপনে ১৯২০-র দশক একটি পরিবর্তনের সূচনাবিন্দু। সাহিত্য ও ইতিহাসচর্চায় এই সময়কে কেন্দ্র করে বিভিন্ন পরিবর্তন এবং অভিনবত্বের কথা বারবার বলা হয়েছে এবং এখনও হয়ে চলেছে। যে যে পরিবর্তনের কথা উঠে এসেছে সেগুলি সত্যিই ঘটেছিল কিনা, অথবা ঘটলেও সামগ্রিকভাবে আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্তরে তার তাৎক্ষণিক বা সুদূরপ্রসারি প্রভাব অনুসন্ধান করা আমার গবেষণার বিষয় নয়। পরিবর্তন আদৌ হয়েছিল কিনা বা তার অভিঘাত কতদূর ছিল সেই প্রশ্নের আলোচনা আপাতত স্থগিত রেখে এইটুকু প্রথমেই বলা যায় যে, ১২৯২০-র দশকে কলকাতা শহরে বহুমাত্রিক ও বহুস্বর মননের প্রকাশ দেখা গিয়েছিল সমাজ-রাজনীতি-সংস্কৃতির বিভিন্ন বর্গে। আমি বিভিন্ন বর্গ এবং ধারণাগুলিকে সমস্যায়িত (problematize) করার পক্ষপাতি।

এই সময়কার সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনায় ভূদেব চৌধুরী বলেছেন, 'এ-সব প্রতিক্রিয়া' হল '...কালের হাতের মার-এর মুখোমুখি এসে দাঁড়াবার চেষ্টা। অতএব কালের পরিচয়টাই ধরতে হয় আগে'।[1] অন্যদিকে ঐতিহাসিক সব্যসাচী ভট্টাচার্য তাঁর সাম্প্রতিক গ্রন্থে উক্ত কালপর্বকে বিশ্লেষণের জন্য বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসূত্র হিসাবে গ্রহণ করেছেন।[2] সুতরাং গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের অনুসরণে বলা যায়, সাহিত্য সমালোচক ও ঐতিহাসিক 'must critically

[1] চৌধুরী ভূদেব, *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা: চতুর্থ পর্যায় [রবীন্দ্রযুগ: দ্বিতীয় পর্ব]*, (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৪), পৃ. ২৭৪।

[2] ভট্টাচার্য সব্যসাচী, *বাংলায় সন্ধিক্ষণ: ইতিহাসের ধারা, ১৯২০-১৯৮৭*। প্রথম বাংলা সং. (নয়া দিল্লি: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১৮), পৃ. ৫-১০।

"interrupt" each other, bring each other to crisis, in order to serve their constituencies'।[3] সাধারণত আমরা বাস্তব আর কল্পনাকে দুটি বিপরীতার্থক (dichotomous) শব্দ বলে মনে করি। কিন্তু এরা দ্বান্দ্বিক ভাবে (বিরোধ ও মিলন) জড়িত, একে অন্যকে প্রভাবিত করে।[4] প্রথাগতভাবে লিখিত/রচিত ইতিহাসের পাশাপাশি গল্প, উপন্যাস, জীবনী, স্মৃতিকথা, সিনেমা-নাটক-যাত্রা, খবরের কাগজ, শোনা কথা ইত্যাদি কতশত রচনাকে (text) আশ্রয় করে আমরা প্রতিনিয়ত কাহিনির কক্ষপথে বিচরণ করছি। প্রতিটি উপস্থাপিত টেক্সটের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে অপরাপর সম্ভাবনা, বৈসাদৃশ্য, বিভিন্নতা যা প্রাধান্যকারী বয়ানকে প্রশ্ন করে। ইতিহাসের তথ্যসূত্র হিসাবে তাই ফ্যাক্ট ও ফিক্শনের মধ্যে যাতায়াত নিরন্তর। সেই কারণে গবেষণা যেন হয়ে ওঠে এক খননকার্য যা অতীত কুঠুরি থেকে বের করে আনে স্মৃতি যা থেকেও নেই, আর সেই সব বৈসাদৃশ্য যা চ্যালেঞ্জ করতে পারে ইতিহাসের মান্যতাকে। তাই প্রণালীগত (methodologically) দিক থেকে আমি সাহিত্যগত আর ইতিহাসগত রচনাগুলিকে সমগুরুত্বে বিবেচনা করেছি। কোনো একটি নির্দিষ্ট রচনার সাহিত্যগুণ বিচার করা নয় বরং বিভিন্ন রচনাকে আন্তঃরাচনিক প্রেক্ষিত (intertextuality) থেকে বিচার করে আলোচ্য সময়কে ধরতে চেয়েছি। সেই কারণে প্রয়োজন তৎকালীন আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির একটি সাধারণ ধারণা।

বিশ শতকের শুরুর দিক অবধি বাংলাদেশের সমাজকাঠামো ছিল গ্রামকেন্দ্রিক, কৃষিভিত্তিক। চাকরির কারণে কলকাতায় আসা যাওয়া করলেও মধ্যবিত্ত বাঙালীর মূল

---

[3] Gayatri Chakravorty Spivak, "A Literary Representation of the Subaltern: Mahasweta Devi's 'Stanadayini'", in Ranajit Guha ed., *Subaltern Studies V: Writings on South Asian History and Society.* (New Delhi: OUP, 2008), 92.

[4] সৌম্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, "কলকাতা: কল্পনাতে ও বাস্তবে"। *অশীন দাশগুপ্ত স্মারক বক্তৃতা ২০১৪*, (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ২২ জানুয়ারি ২০১৫), পৃ. ১১।

আকর্ষণ ছিল গ্রামের বাস্তুভিটে। ক্রমশ ম্যালেরিয়ার বিস্তার, জমি সংক্রান্ত কলহ, অর্থনৈতিক সংকট গ্রামের প্রতি আকর্ষণ শিথিল করে। তারা শহরের, বিশেষত কলকাতার বাসিন্দা হয়ে উঠতে থাকেন। কলকারখানা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি শ্রমিক সম্প্রদায় ব্যাপকতর হয়। ঐতিহাসিক তথ্যসূত্রের সমান্তরালে তৎকালীন ও পরবর্তী কালের বিভিন্ন সাহিত্যে এই বদলের ছবি ফুটে উঠেছে; বিশেষ করে মেসবাড়িগুলোর রমরমার কথা। গ্রাম-মফস্বল থেকে আসা অসংখ্য ছাত্র, চাকরিজীবী, বেকারের আশ্রয় হয়ে ওঠে মেসগুলো। এছাড়াও ছিল গ্রামতুতো, পাড়াতুতো বা পারিবারিক আত্মীয়তার সূত্রে কলকাতায় কোনো অবস্থাপন্ন বাড়িতে মাথা গোঁজার ঠাই করে নেওয়া। এই সময়ের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লিখতে গিয়ে সুকুমার সেন লিখেছেন, 'যাহার কিছুমাত্র উপায় ছিল সে শহরে — মুখ্যত কলিকাতায় — বারোমাসের বাসিন্দা হইল'।[5] স্বভাবতই এই সময়ের কলকাতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছিল চাকরিজীবী শহুরে মধ্যবিত্তের উত্থান, পাশাপাশি নিদারুণ বেকারত্ব।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দশ বছরের মধ্যে বেকার সমস্যা ভয়াবহ আকার নিয়েছিল। এই সূত্র ধরেই এসেছিল পারিবারিক সংস্কার বর্জনের প্রক্রিয়া। শহরবাসী মধ্যবিত্তের প্রয়োজন-রুচি-সাধ্যের মধ্যে সংঘাত অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ল। একদিকে যেমন বাল্যবিবাহ জনপ্রিয়তা হারাল তেমনই মেয়েরা ক্রমশ স্কুল, কলেজ, চাকরিতে যেতে আরম্ভ করল। সুকুমার সেনের ভাষায়, '...শিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙ্গালীর আর্থিক অবনতি দ্রুততর ঘটিতে লাগিল। বার-চৌদ্দ বছরের মধ্যে মেয়েদের বিবাহ দেওয়া দুরূহ হইতে লাগিল। অগত্যা মেয়েদেরও স্কুলে পাঠাইতে হইল। ইস্কুল-কলেজে পড়া মেয়েদের পক্ষে আর আগেকার একান্নবর্তীচালে আত্মীয়-পরিজন লইয়া চলা সম্ভব হইল না। সুতরাং ঘরের আয়তন ও

[5] সুকুমার সেন, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস: পঞ্চম খণ্ড ১৮৯১-১৯৪১*, (কলকাতা: আনন্দ, ২০১০), পৃ. ২৭১।

আবহাওয়া বদলাইতে লাগিল।'[6] স্বাভাবিক ভাবেই বাস্তবের অভিঘাতে মেয়েদের চিন্তা, চেতনা, রুচির ক্ষেত্রেও বিপুল পরিবর্তন হতে শুরু করল। পুরুষরাও পুরানো চিন্তাকাঠামো ছেড়ে বেরিয়ে বাস্তবের সঙ্গে সমঝোতা করতে বাধ্য হল। ১৩৩৪-র মাঘ মাসে 'কল্লোল' পত্রিকার 'ডাকঘর' শীর্ষক ফিচার থেকে উদ্ধৃত করেছেন ডঃ রবিন পাল, '...এমন অবস্থা আসিয়াছে একমাত্র পুরুষের সামান্য উপার্জনে আর একটি পরিবারের অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য বা বস্ত্রও যোগাড় হইয়া ওঠে না। এই অবস্থায় আবশ্যকবোধে নারীকেও উপার্জন করে পরিবারকে সাহায্য করিতে হইতেছে। এরূপ পরিবারও আছে, শিক্ষিতা নারীর উপার্জন দ্বারা সমগ্র পরিবার প্রতিপালিত হইতেছে।'[7] 'অর্থনৈতিক এই মন্দার অভিঘাতে গড়া বাঙালি শিক্ষিত তরুণের বাস্তবিক অসহায়তার ছবি নানা সূত্রে ধরা আছে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের "কল্লোল যুগ"-এ', বলে মন্তব্য করেছেন ভূদেব চৌধুরি।[8] আর ডঃ রবিন পালের মতে 'এই থেকেই জন্ম নেয় রাজনীতিক্ষেত্রে যেমন সন্ত্রাসবাদের ব্যাপকতা, সামাজিক ক্ষেত্রে তেমনি নানান *স্বেচ্ছাচারিতা* (তির্যক চিহ্ন আমার)।'[9] এই *স্বেচ্ছাচারিতা*-র মধ্যেই নিহিত ছিল মধ্যবিত্ত বাঙালির লিঙ্গ-সম্পর্ক ও আত্মজিজ্ঞাসার নতুন সম্ভাবনাগুলি।

বলাবাহুল্য, মননের জটিলতা ঔপনিবেশিকতা এবং জাতীয়তাবাদের যৌগিক আবর্তে আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। কলকাতার নাগরিক পরিসরে আধুনিকতা (modernity) এবং আধুনিকতাবাদ (modernism)-এর দ্বন্দ্ব এই সময়কালে নতুন মাত্রা পেয়েছিল। পার্থ চ্যাটার্জী দেখিয়েছেন যে, 'the history of our modernity has become intertwined with the history of colonialism, we have

---

[6] সেন, ২০১০, পৃ. ২৭২।

[7] ডঃ রবিন পাল, *কল্লোলের কোলাহল ও অন্যান্য প্রবন্ধ*। (কলকাতা: শ্রীভূমি পাবলিশিং, ডিসেম্বার ১৯৮০), পৃ. ৩৬।

[8] চৌধুরি, ১৯৯৪, পৃ. ২৭৫।

[9] পাল, ১৯৮০, পৃ. ৩৫।

quite been able to believe that there exists a universal of free discourse, unfettered by differences of race or nationality'। কমলকুমার মজুমদারের উপন্যাস *অন্তর্জলি যাত্রা* সংক্রান্ত আলোচনা প্রসঙ্গে চ্যাটার্জী তাঁর 'Talking about Our Modernity in Two Languages' প্রবন্ধে লিখেছেন যে, আমাদের আধুনিকতার প্রধান চালিকা শক্তি হল *মায়া* (sense of attachment)।[10] ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে আমরা আধুনিকতার অংশীভূত হয়েছিলাম, আধুনিক বিষয়ী হয়ে উঠতে না পেরেই। সেই কারণে, তিনি মনে করেন যে, বর্তমানের প্রতি আমাদের অতৃপ্তির বোধ তৈরী হয়েছে। তাঁর নিজের ভাষায়:

> At the opposite end from 'these days' marked by incompleteness and lack of fulfillment, we construct a picture of 'those days' when there was beauty, prosperity and a healthy sociability, and which was, above all, our own creation. 'Those days', for us is not a historical past; we construct it only to mark the difference posed by the present.[11]

শ্রী চ্যাটার্জী *মায়া* শব্দটির বহুমাত্রিক অর্থের মধ্যে থেকে 'sense of attachment' বা 'সংযুক্তির বোধ' অর্থটিকে গ্রহণ করেছেন, যা অলীক বা ভ্রমাত্মক নয় বরং স্নেহশীল, কোমল, করুণাঘন। পরিবর্তনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের চিহ্ন হিসাবে *মায়া*-কে বিচার করলে ভুল করা হবে। তাঁর মতে, অতীতের সঙ্গে আমাদের সংযুক্তির এই বোধের কারণেই এহেন অনুভূতির জন্ম হয়েছিল যে বর্তমানকে পরিবর্তন করার প্রয়োজন আছে। এবং আমাদের দায়িত্ব তাকে পরিবর্তন করা।[12]

---

[10] Partha Chatterjee, "Talking about Our Modernity in Two Languages", in *A Possible India* in *the Partha Chtterjee Omnibus* (New Delhi: OUP, 1999), 275.

[11] Chatterjee, 1999, 281.

[12] Chatterjee, 1999, 280.

এই দায়িত্ববোধের ইতিহাসও একমাত্রিক বা সমসত্ব ছিল না। বিশের দশকের পরিস্থিতিতে বর্তমানকে পরিবর্তনের দায়িত্ব, আধুনিকতাকে নিজস্ব প্রয়োজন ও ভঙ্গিমায় সংজ্ঞায়িত ও মূর্ত করার প্রয়াস এবং সেই সঙ্গে আত্মপরিচয়ের ক্ষুধা নতুন মাত্রা পেয়েছিল বলা যায়। স্বভাবতই বেড়েছিল ব্যক্তিক, মনস্তাত্বিক ও সামাজিক টানাপোড়েন। পার্থ চ্যাটার্জী মনে করেন আধুনিকতার প্রতি আমাদের মনোভাব তাই গভীরভাবে অনিশ্চয়তার-দ্ব্যর্থতার-অনির্দিষ্টতার। আর এই অনির্দিষ্ট রহস্যময় পরিসরটাই সৃজনশীল হয়ে উঠেছে সাহিত্যের আঙিনায়। আগেই উল্লেখ করেছি যে ঐতিহাসিক সব্যসাচী ভট্টাচার্য এই পর্বটিকে অনুধাবনের জন্য সাহিত্যকে অন্যতম আকর হিসাবে ব্যবহারের পক্ষপাতি। '১৯২০-র দশক থেকে বাংলার আত্মপরিচয় বা সত্তার নবতম ব্যাখ্যার সূচনা হয়েছিল। এই ধারা "নবজাগরণ" ও তার চূড়ান্ত পরিণতি সম্পন্ন সময় থেকে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন পর্যন্ত বিস্তৃত সময়কালের থেকে পৃথক করে বিশশতকীয় বাংলাকে'।[13] ঐতিহাসিক সব্যসাচী ভট্টাচার্য বিশশতকের প্রথম দশকগুলির কিছু স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে অন্যতম হল নতুন মধ্যবিত্ত মুসলিম শ্রেণির বিকাশ, রাজনীতির বাঙালিয়ানা (vernacularization) ও 'বাঙালি দেশপ্রেম' এবং রাজনীতি ও জনপরিসরে নারীদের অংশগ্রহণ ও এক নতুন ভদ্রমহিলার আবির্ভাব। এখানে উল্লেখ্য যে, সব্যসাচী ভট্টাচার্যের বাংলায় *সন্ধিক্ষণ: ইতিহাসের ধারা ১৯২০-১৯৪৭* গ্রন্থটিকে আমি আমার গবেষণায় বহুল ব্যবহার করেছি এবং কখনও কখনও আমার যুক্তির সপক্ষে সাক্ষ্য হিসাবেও তুলে ধরেছি।

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় পরিষ্কার করা প্রয়োজন যে সমগ্র বাংলার মনন ও সত্তার ইতিহাস আলোচনা করা এই নিবন্ধের সীমার মধ্যে সম্ভব নয়, যদিও ভবিষ্যতে আমি

[13] ভট্টাচার্য, ২০১৮, পৃ. ix। সব্যসাচী ভট্টাচার্য তাঁর সাম্প্রতিকতম এই গ্রন্থের অন্যতম প্রতিপাদ্য হিসাবে তুলে ধরেছেন বাংলার নতুন আত্মপরিচয়ের বিষয়টিকে।

গবেষণাটিকে আরও বিস্তৃত করার পক্ষপাতি, কিন্তু বর্তমানে আমি শুধু শহর কলকাতার মধ্যেই আলোচনা সীমায়িত রাখতে চাই। সেটি শুধুমাত্র স্থানাভাবে নয়, আমি বিশেষভাবে এই শহরের মানসিক স্থানাঙ্ক নির্ণয় করতে চাইছি যার সঙ্গে গোটা বাংলার পার্থক্য থাকাই স্বাভাবিক। কারণ বাংলার ইতিহাস সমসত্ত্ব বা একশিলাবৎ নয়। শহর থেকে গ্রামে, এমনকি ভৌগোলিক অঞ্চল ভেদেও মানসিকতার পার্থক্য ঘটে যায়। মধ্যবিত্তের সত্তার পুনর্নির্মাণের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত কলকাতা শহর। তাই আমি গবেষণায় কলকাতা শহরটিকে চিহ্নিত করেছি, যে সমস্ত সাহিত্য নিয়ে পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আমি কাজ করব (উপন্যাস-গল্প-প্রবন্ধ-স্মৃতিকথা- জার্নাল), তার অকুস্থল (locale) হিসাবে। এই সমস্ত সাহিত্য বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে শহরের মননকে ভাষান্তরিত করেছে, শুধুমাত্র একটি ভৌগোলিক স্থান হিসাবে নয় বরং একটি কল্পিত পরিসর হিসাবে কলকাতার স্থানিকতা বিস্তারিত হচ্ছে এই সময়, একটি অঞ্চল হয়ে উঠছে আকাঙ্ক্ষা ও হতাশার প্রতিমূর্তি। আমার প্রতিপাদ্য এই যে আধুনিকতার টানাপোড়েনের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতাও রূপায়িত হয়েছে আধুনিক শহরের ছায়ামূর্তি (spectrality) হিসাবে, একটি স্থান, যা স্মৃতির, আকাঙ্ক্ষার, প্রেতের।[14] শহরটির ভৌগোলিক স্থানিকতার সঙ্গে আছে তার চলিষ্ণু-কাল্পনিক পরিসর। 'কায়িক বিস্তারের পাশাপাশি রয়েছে তার মায়িক বিস্তার'।[15] এই মায়িক বিস্তারের পরিসরটি বিরাট। কোনো সমসত্ত্ব বা সরলরৈখিক উপস্থিতি নয়। প্রাত্যহিক কলকাতার সঙ্গে 'অবিচ্ছেদ্য সম্পূরক হিসেবে এক অপর-নগর'[16] জুড়ে আছে। শহরের কায়িক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে মফস্বলের প্রভাব। জনপরিসরে কলকাতার শহুরে নেতৃত্ব কমজোর হতে থাকে, সেই স্থান নেয় মফস্বলের নতুন প্রজন্ম।

---

[14] Supria Chaudhury, 'In the City' in *Apu and After*, ed. Moinak Biswas (Calcutta: Seagull Books, 2006), 254.

[15] শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, *প্রসঙ্গ: জীবনানন্দ*, (কলকাতা: গাঙচিল, জানুয়ারি, ২০১১), পৃ. ১৭৯।

[16] তদেব।

পার্শ্ববর্তী গ্রাম, ছোট শহর ও কলকাতার বিস্তীর্ণ পশ্চাদভূমির জীবনযাত্রার অনুপ্রবেশের ফলে (যা এতদিন এলিট গোষ্ঠীর অবজ্ঞার বিষয় ছিল) সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলেও নতুন মাত্রা যুক্ত হল।[17] ১৯২০-র দশকে কলকাতায় অভিবাসিত হওয়া নতুন প্রজন্মের শিক্ষিতদের অধিকাংশই ছিলেন পূর্ববঙ্গের 'বাঙাল'। কলকাতার সঙ্গে গ্রামের সম্পর্কও ছিল দ্বান্দ্বিক। একদিকে শহরের আকর্ষণ, অন্যদিকে স্মৃতিমেদুর কল্পনার গ্রামে ফেরার আকাঙ্ক্ষা এবং না ফিরতে পারার বেদনা। এই দ্বন্দ্বও আত্মজিজ্ঞাসার নতুন পর্বে ইন্ধন যুগিয়েছিল, কেননা তৎকালীন সাহিত্যিকদের অধিকাংশই ছিলেন জেলা, মফস্বল থেকে আগত। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই ক্রমে শহরের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে পড়েন। কেউ কেউ হয়তো বাস করেতেন কলকাতার বাইরে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে নতুন সত্তা নির্মাণের পরিসরটি তৈরী হয়েছিল কলকাতাকে কেন্দ্র করেই।

স্বভাবতই ১৯২০ ও তার পরবর্তী দশকে বাংলা সাহিত্যে নতুন তরঙ্গের প্রকাশ দেখা যায়। একদিকে যেমন রবীন্দ্রসাহিত্যের আত্তিকরণ ও প্রত্যাখ্যান, পাশাপাশি নতুন সৃজনের স্পৃহা নিয়ে বাংলা সাহিত্যিক ও পাঠক মহলে যথেষ্ট আলোড়ন শুরু হয়। বিশ শতকের তৃতীয় দশকে তারুণ্যের উচ্চকিত স্বর শোনা গিয়েছিল 'কল্লোল' (১৯২৩), 'কালিকলম' (১৯২৬), 'প্রগতি' (১৯২৭), 'সংহতি' (১৯২৪), 'উত্তরা' (১৯২৫), 'বিচিত্রা' (১৯২৭) প্রভৃতি পত্রিকায় এবং আলাদা করে উল্লেখের দাবি রাখে 'পরিচয়' পত্রিকা (১৯৩১)। বিরোধ সৃষ্টিতে ইন্ধন যুগিয়েছিল 'শনিবারের চিঠি' (১৯২৮)। তৎকালীন বাংলা সাহিত্য পর্যালোচনা করলেই বোঝা যায় মধ্যবিত্তের পারিপার্শ্বিকতা ও চিন্তাকাঠামোয় নতুন উপাদান সংযুক্ত হয়েছিল। প্রখ্যাত বামপন্থী সাহিত্যিক চিন্মোহন সেহানবীশ এই প্রসঙ্গে

[17] ভট্টাচার্য, ২০১৮। বিশদে জানার জন্য দ্রষ্টব্য উক্ত গ্রন্থের সত্তার "পুনর্নির্মাণ ১৯২০" *দশক* অধ্যায়টি। এই পর্বে নতুন বাঙালি স্বাজাত্যপ্রেম, রাজনীতির বাঙালিয়ানা, কলকাতার আধিপত্য ও গ্রামবাংলা সহ আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করেছেন তিনি, যা আমার গবেষণার ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

লিখেছেন, "প্রগতি লেখকদের আন্দোলনের পৃষ্ঠপটটি স্পষ্টতই রাজনৈতিক।...ঐ আদি পর্বে সাহিত্যকর্মের জটিলতা সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধির চাইতেও তখন স্বাভাবিক ছিল বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের ও সামাজিক প্রগতির সঙ্গে সাহিত্যিক প্রগতির সাযুজ্যের অসঙ্কোচ স্বীকৃতি"।[18] সমসাময়িক সাহিত্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-হতাশা-দিশাহীনতার পাশাপাশি নতুনকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। 'আধুনিকতা', 'প্রগতি', 'নতুনত্ব', 'অতি আধুনিকতা' ইত্যাদির সংজ্ঞাকে বুঝে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। এর সঙ্গেই ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত ছিল 'সাহিত্যধর্মে সীমানা'[19] নির্ধারণের প্রক্রিয়া।

যুদ্ধ বিধ্বস্ত মানুষের মনোবিকলনের উৎস খুঁজতে গিয়ে বাঙালি বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিকদের অনেকেই এইসময় ফ্রয়েড, ইয়ুং বা অ্যালফ্রেড অ্যাডলারের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। যৌনলালসা – 'লিবিডো'-র উদ্গমণই যে সমস্ত মানসিক প্রেরণা ও উদ্দীপনার উৎস সে বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছিল। অন্যদিকে ছিল গোর্কি বা হ্যামসুনের মতো 'রিয়েলিস্ট' বা 'স্যোসালিস্ট-রিয়েলিস্ট'-দের প্রভাব। অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত ধারাবাহিকভাবে অনুবাদ করলেন ন্যুট হ্যামসুনের *প্যান* (*মীনকেতন*)। বাস্তব জীবন ও তার মৌল সংঘর্ষ তাঁদের কাছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল রুশ বিপ্লবের সফলতায় 'প্রোলেতারিয়েত' সমাজ ও নতুন মানুষের অভ্যুদয়ের প্রতিশ্রুতি। ১৩৩২ বঙ্গাব্দের ভাদ্র থেকে 'কল্লোল' পত্রিকাতেও বলশেভিক বিপ্লবের আদর্শ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছিল।[20] বিভিন্ন লেখাপত্রে তাঁরা শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে মার্ক্সিয় নন্দনতত্ত্ব প্রয়োগ করতে শুরু করেন। নতুন সত্তা নির্মাণের এই প্রক্রিয়ার

---

[18] চিন্মোহন সেহানবীশ, *৪৬নং একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রসঙ্গে*, (কলকাতা: সেরিবান, ২০০৮), পৃ. ৫৬।

[19] ঠাকুর, শ্রাবণ, ১৩৩৫; সেনগুপ্ত, ভাদ্র, ১৩৩৫; বিচিত্রা পত্রিকায় শ্রাবণ ১৩৩৫ (১৯২৭) বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'সাহিত্য ধর্ম' নামক প্রবন্ধের প্রতিবাদে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত বিচিত্রা পত্রিকাতেই ভাদ্র সংখ্যায় 'সাহিত্যধর্মে সীমানা' নামক প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

[20] অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, *কল্লোল যুগ*,(কলকাতা: এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা: লি:, আশ্বিন, ১৪২১); সেন, ২০১০; ভুদেব, ১৯৯৪; সত্যেন্দ্রনাথ রায়, *বাংলা উপন্যাসের আধুনিকতা*, (কলকাতা: গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড), শ্রাবণ, ১৩৯৪।

সূচনা অবশ্য কল্লোল পর্বে প্রথম ঘটেনি। ভারতী পত্রিকার নরেশ চন্দ্র সেনগুপ্তের যৌন-মনস্তাত্ত্বিক রচনা, অথবা চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশ্চাত্য ভাবধারায় সামাজিক বাস্তবতার চিত্রণে এর স্বীকৃতি ছিলই। তবে এই পর্বে নারী-পুরুষের সম্পর্ক ও যৌনতা নিয়ে আলোড়ন তীব্র হয়েছিল।[21] আলোচিত সাহিত্যিকদের মধ্যে ছিলেন অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, গোকুল নাগ, মোহিতলাল মজুমদার, দীনেশরঞ্জন দাশ, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, জগদীশ গুপ্ত, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায় প্রমুখ। সেই সময়ে অসংখ্য মেয়েরা লেখালিখির জগতে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। তাদের মধ্যে অনেকেরই বই বিক্রির সংখ্যা ছিল বিপুল। বহু সংস্করণ প্রকাশিত হত। আজকের দিনে যাকে 'বেষ্ট সেলার' বলে প্রভাবতী দেবী সরস্বতী বা অনুরূপা দেবীর বইগুলি ছিল সেই পদবাচ্য। গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন রাধারানী দেবী, শৈলবালা ঘোষজায়া, নিরুপমা দেবী প্রমুখ। পুরুষ লেখকদের প্রাধান্য দিয়ে প্রথম দিকের কয়েকটি অধ্যায় আলোচনা করে শেষে একটি অধ্যায়ে মেয়েদের লেখালিখি সম্পর্কীত আলোচনা করে সমতা বিধানের পক্ষপাতী আমি নই। সমগুরুত্বে বিবেচনা করতে চাই নারী ও পুরুষ উভয়ের রচনা। তবে একটি বিষয় স্মরণে না রাখলে বাস্তবের প্রতি ন্যায় বিচার করা হবে না। তা হল, নারী ও পুরুষের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থানের পার্থক্য। বেশিরভাগ সময়েই নারীকে পুরুষের তুলনায় অধিক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়; এবং তাদের উপরে চেপে থাকে সামাজিক শর্ত ও যুগ যুগ ধরে শর্তাধীন (social condition and conditioning) হয়ে থাকার চাপ ও অভ্যাস। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে বিশদে এই বিষয়ে আলোচনা হবে। আলোচনার প্রারম্ভে অন্তত এটুকু বলা যায় যে, সাহিত্যে নিশ্চিতভাবেই

[21] সেন, ২০১০, পৃ. ২৭৩; 'স্পষ্ট যৌন-আবেগমূলক রোচক সাহিত্যের গুরু' অভিধা দিয়েছেন তিনি নরেশ সেনগুপ্তকে; পাল, পৃ. ৪৩।

তাঁরা নতুনত্ব এনেছিলেন। 'এই প্রথম সর্বহারা, নিম্নবর্গীয়, নিম্ন মধ্যবিত্ত তথা নানান ধরণের প্রান্তিক নারী ও পুরুষ'-এর আবির্ভাব হয়েছিল।[22]

আমার উদ্দিষ্ট অংশের মানুষজন সমাজের একটি ক্ষুদ্র বর্গের প্রতিনিধি। শিক্ষিত বাঙালি (উহ্যভাবে হিন্দু) মধ্যবিত্ত হল এমন একটি বর্গ যারা সচেতনভাবে ইওরোপীয় আলোকায়নের সর্বজনীনবাদী ধারণাগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।[23] আমি বর্তমানে যে এই বর্গটির (বিশেষত কলকাতাবাসী বা কেন্দ্রিক) মধ্যেই আমার গবেষণা সীমাবদ্ধ রেখেছি তার কারণ মূলত দুটি। প্রথমত, আমার গবেষণার মূল কেন্দ্র হল সাহিত্য। যার চর্চাকারী (লেখক বা পাঠক) সমাজের একটি সীমিত অংশ। বিশ শতকের একেবারে শুরুর দিকের বাংলায়, বিশেষ কোনো গবেষণা ছাড়াই বলা যায়, তারা হলেন শহুরে উচ্চবর্ণ হিন্দু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ। সেই শ্রেণিরও আণুবীক্ষণিক একটি অংশ হলেন সাহিত্যিকরা, যারা মূলত পুরুষ, স্বাভাবিকভাবেই নারী সেখানে অত্যন্ত প্রান্তিক। দ্বিতীয়ত, আগেই উল্লেখ করেছি এই অংশটাই মূলত আহৃত ধারণাগুলির সঙ্গে কথোপকথনে গিয়েছিলেন বা সমন্বয় ঘটাতে চেয়েছিলেন নিজ নিজ শর্ত অনুযায়ী। তাই আমি আমার ইতিহাসগত উপাদান সংগ্রহ করবো এই বর্গের মধ্যে থেকেই। মধ্যবিত্ত বাঙালিকে একটি বর্গ হিসাবে তুলে ধরার কারণ প্রধানত প্রণালীবিদ্যাগত (methodological); এবং অবশ্যই কলকাতা ও তার বৌদ্ধিক সমাজ সম্পর্কে আমার জানাবোঝা অন্য স্থান ও অন্য ভাষার সমাজের থেকে গভীর। যেভাবে দীপেশ বলেছেন, '...it is only Bengali – and in a very particular kind of Bengali – that I operate with an everyday sense of historical depth and diversity a

[22] ভট্টাচার্য, ২০১৮, পৃ. ২।

[23] Dipesh Chakrabarty, *Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference*, (New Jersey: Princeton University Press, 2000), 20.

language contains'।[24] তাই এই ভাষার উপমা রূপক অলঙ্কারের মধ্যেই আমি খুঁজতে চেয়েছি যাবতীয় পক্ষপাতের জলছাপ ও চ্যুতিরেখাগুলি। আর সেই কারণেই আমার সন্দর্ভটিও বাংলায় লিখতে স্বাচ্ছন্দবোধ করেছি। বাংলা ও বাঙালিকে ব্যতিক্রমী বা প্রতিনিধিত্বমূলক হিসাবে পেশ করার কোনো উদ্দেশ্য আমার নেই এবং সেই বিতর্কে ঢোকার পরিসরও এখানে নেই।

এই আধুনিকতার স্বরূপ স্বম্পূর্ণ ভাবে হিন্দু – উচ্চারণ অনুচ্চারণ সচেতনতা এবং অসচেতনতায়। আমরা জানি যে কিভাবে আপাত নিরপেক্ষ ধারণাগুলি আধিপত্যময় সংখ্যাগরিষ্ঠের বাচনকেই আয়ত্ত বা অনুকরণ করে। কেন এই কাজে আমি মুসলিম সমাজ ও তার শিক্ষিত বৌদ্ধিক মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে আলোচনার মধ্যে রাখলাম না তার কারণ (অজুহাতই বোধহয়) হিসাবে দেখানো যেতে পারে তথ্যের অপ্রতুলতা এবং যতটুকু যা আছে তা সংগ্রহজনীত প্রভূত সমস্যা। পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের রাজনীতি সমাজতত্ত্ব বা ইতিহাসচর্চা সবকিছুই মুসলমান সমাজকে তথাকথিত অপর হিসাবে বিবেচনা করেছে। আবার দীপেশ চক্রবর্তীর কথা ধার করে বলতে হয়, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমি হিন্দু ও মুসলমান বাঙালির ঐতিহাসিক পার্থক্য সম্পর্কে অবহিত, 'which this book (here thesis) cannot but reproduce'। এই প্রসঙ্গে চক্রবর্তী জে.এইচ. ব্রুমফিল্ডকে উদ্ধৃত করে বলেছেন, একশো বছরেরও বেশি সময়কাল ধরে হিন্দু উপাখ্যানগুলিতে বাংলার মুসলমানরা উপস্থাপিত হয়েছেন "বিস্মৃত সংখ্যাগরিষ্ঠ" হিসাবে।[25] ভারতীয় বাঙালি ঔপনিবেশিকতা বিরোধী জাতীয়তাবাদ সজোরে স্বাভাবিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে

---

[24] Chakrabarty, 2000, 20.

[25] চক্রবর্তী, ২০০০, পৃ. ২১। উদ্ধৃত করেছেন জে. এইচ. ব্রুমফিল্ড, "দ্য ফরগটেন মেজরিটি: দ্য বেঙ্গলি মুসলিমস অ্যান্ড সেপ্টেম্বর ১৯১৮" নামক প্রবন্ধ, ডি. এ. ল্যো (সম্পা.) *সাউন্ডিংস ইন মোডার্ন সাউদ এজিয়ান হিস্ট্রি* (লন্ডন: অয়েডেনফেল্ড অ্যান্ড নিকোলসন, ১৯৬৮), পৃ. ১৯৬-২২৪।

হিন্দুদের। তাই বাঙালি আধুনিকতার আখ্যান আর হিন্দুর কাহিনি অঘোষিতভাবে সমার্থক হয়ে পড়েছে। এই ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রমের ক্ষমতা আমার নেই।

নারী পুরুষের সম্পর্কের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উল্লেখ না করা অনুচিত। যদিও কল্লোল গোষ্ঠীর সামাজিক বাস্তবতা ও যৌনতা নিয়ে আতিশয্যের বিরোধিতা করেছিলেন তিনি,[26] তবুও নারী সম্পর্কে তাঁর সম্পূর্ণ নতুন মূল্যবোধ ও মূল্যায়ণের প্রকাশ ঘটতে শুরু করেছিল ১৯১০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকেই। সুমিত সরকার রবীন্দ্রনাথের অপেক্ষাকৃত আগের আর পরবর্তীকালের প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাসের তুলনামূলক আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে লিঙ্গ-প্রসঙ্গে তাঁর চিন্তা ভাবনার ক্ষেত্রে একটি রূপান্তর ঘটেছিল। যার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল প্রথম *ঘরে বাইরে* (১৯১৬) উপন্যাসে। সরকার উদ্ধৃত করেছেন নিখিলেশের স্বগতোক্তি : "আমার স্ত্রী, অতএব ও আমারই! ও যদি বলতে চায়, 'না, আমি আমিই'। তখনই আমি বলব, সে কেমন করে হবে, তুমি যে আমার স্ত্রী! স্ত্রী! ওটা কি একটা যুক্তি! ওটা কি একটা সত্য! ঐ কথাটার মধ্যে একটা আস্ত মানুষকে আগাগোড়া পুরে ফেলে কি তালা বন্ধ করে রাখা যায়?"[27] সুমিত সরকার স্বদেশী যুগ উত্তর বাংলার জাতীয়তাবাদ আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, 'জাতীয়তাবাদের অগ্রগতির ফলে যে নারী সমস্যার একটি বিশেষ ধরণের "সমাধান" চালু হয়ে যায়, এ কথাটা প্রায় স্বতঃসিদ্ধভাবে ধরে নেওয়া হয়েছে।' কিন্তু তিনি জোর দিয়েই বলেছেন, '"Nationalist resolution"[28] কথাটা অনেক সময় একটু বেশি অপরিবর্তনশীল ভাবে দেখা হয়েছে। স্বদেশী অভ্যুত্থানের অবসানের পর নানাধরণের নতুন চিন্তা-প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়। তার

---

[26] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩৩৫; সাহিত্য ধর্ম, অচিন্ত্য সেনগুপ্তকে লেখা চিঠি, (৩১ আশ্বিন, ১৩৩৫); সেন, ২০১০, পৃ. ২৭৫-৭৯, ২৮১-৮২।

[27] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ঘরে বাইরে,* উদ্ধৃত করেছেন সুমিত সরকার, "জাতীয়তাবাদ ছাড়িয়ে: স্বদেশী যুগোত্তর বাংলার কয়েকটি দিক", *অধ্যাপক অশীন দাশগুপ্ত স্মারক বক্তৃতা,* ৩, (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ২০০১), পৃ. ৪।

[28] Partha Chatterjee, "The Nationalist Resolution of the Women's Question", in S. Sangari & S. Veid edited *Recasting Women*, (New Delhi, India: Kali for Women, 1989).

প্রভাব নারী মুক্তির প্রশ্নেও ছড়িয়ে পড়ে – আর শুধু রবীন্দ্রনাথের লেখায় নয়, অন্য কিছু নিদর্শনও খুঁজলে পাওয়া যাবে।'[29] ১৯৩৬ সালে নারী প্রশ্ন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের শেষ লেখার কথা উল্লেখ করেছেন শ্রী সরকার যা নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠা বা autonomy-র দাবিকেই ঊর্ধ্বে তুলে ধরে। উদাহরণ স্বরূপ আমরা *চতুরঙ্গ* (১৯১৬) ও *শেষের কবিতা* (১৯২৮) উপন্যাস দুটির কথা উল্লেখ করতে পারি। চতুরঙ্গে চারজনের ভেতরকার সম্পর্কের আলোছায়া, অস্থিরতা, ছেদ ও নৈঃশব্দের বিকাশ প্রচলিত লিঙ্গ-সম্পর্কের পরিধিকে অতিক্রম করে যায়। তৈরী হয় নতুন সম্ভবনা। শেষের কবিতার আপাত চাকচিক্যের আড়ালে উঁকি দেয় বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানকে অস্বীকারের প্রতিস্পর্ধা। একথা ঠিক যে, রবীন্দ্রনাথের প্রেমে শরীরী চাহিদাকে অতিক্রম করে যায় মানসী আকাঙ্খা কিন্তু প্রকাশের ভঙ্গিমায় তা ভালোবাসার প্রথাগত ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করার ক্ষমতা রাখে। হয়তো সবসময় সোচ্চারে নয়, কখনও নীরবে। কিন্তু ভাষার আলোছায়া, কল্পনা, রচনা-চিহ্নের মধ্যে চাপা পড়ে থাকে লিঙ্গ-সম্পর্কের অপরাপর নির্মাণ এবং রচনার উপমা ও অলঙ্কারের (tropes and metaphors) মধ্যে নিহিত থাকে ভিন্ন স্বর, ভিন্ন পরিসর হয়ত সেখানে নর-নারী সমান তলে দাঁড়াতে পারে। রবীন্দ্রনাথের রোম্যান্টিকতার চরিত্র বা ব্যাপ্তি নিয়ে বিতর্কে না গিয়ে মালিনী ভট্টাচার্যের অনুসরণে বলা যায়, 'রোম্যান্টিক কবিদের অনুপ্রেরণা কখনো কখনো এমন প্রতিবাদী উচ্চারণকে সম্ভব করে'।[30]

এই নির্মাণ-পুনর্নির্মাণের প্রক্রিয়ায় সংঘাত অবশ্যম্ভাবী ছিল। পুরানোপন্থী ও রক্ষণশীলদের পক্ষ থেকে 'অতি আধুনিক' বলে চিহ্নিত করে এই সাহিত্যিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল মূলত দুটি – পশ্চিমী অনুকরণ ও যৌনতা নিয়ে বাড়াবাড়ি। প্রসঙ্গত

---

[29] সরকার, ২০০১, পৃ. ৫।

[30] মালিনী ভট্টাচার্য, "পরাধীনের রোমান্টিকতা ও যুগসন্ধির রবীন্দ্রনাথ", *সুশোভনচন্দ্র সরকার স্মারক বক্তৃতা ২০০২*। (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ১৯ অগাস্ট ২০০২), পৃ. ২।

উল্লেখ্য, বেশকিছু কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকের বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ উঠেছিল। তার মধ্যে বুদ্ধদেব বসু (*রজনী হল উতলা*) ও অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত (*বিবাহের চেয়ে বড়ো*) উল্লেখযোগ্য। এমনকি পরবর্তীকালের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতাদের মধ্যেও উপরোক্ত সাহিত্যিকদের রচনায় দেহসর্বস্বতা নিয়ে সমালোচনাত্মক মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে।[31] স্বভাবতই সমকালে বিতর্ক ছিল তীব্র। মনঃসমীক্ষণ, বামপন্থার প্রভাব বা সামাজিক বাস্তবতার (social realism) চিত্রণকে বিদেশী হিসাবেই সাধারণভাবে গণ্য করা হত। এটি আরও বেশি করে ঘটেছিল কারণ এই যুগের সাহিত্যিকদের অনেকেই ইংরাজি ভাষায় বিশেষ পারদর্শী, ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক বা চর্চাকারী। বিদেশি সাহিত্যের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ ছিল নিবিড়।[32] তবে আজকের দিনে আমরা derivative discourse বা 'পরজ বয়ানে'র তত্ত্ব অনুসারে ইংরাজি সাহিত্যের সঙ্গে আধুনিক মননের সম্পর্ককে বোঝার চেষ্টা করতে পারি। মালিনী ভট্টাচার্যের মতে সৃজনশীল সাহিত্য পাঠ ও তার আত্তিকরণের প্রক্রিয়াকে বোঝার ক্ষেত্রে পরজ বয়ান 'অর্থহীন সামান্যীকরণে' পরিণত হতে পারে।[33] তাই সাহিত্যে ও রোম্যান্টিকতার সম্বন্ধ নির্ধারণের চেষ্টা আপাতত মুলতুবি রেখে এইটুকু বলা যায় যে ১৯২০-৪০ পর্বে নারী-পুরুষের সম্পর্ক নির্ধারণেও নতুন প্রয়াস দেখা দিয়েছিল। পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধগুলি মূলত অক্ষত থাকলেও, বিধিনিষেধ অতিক্রমের চেষ্টা হয়েছিল। অন্তত আগ্রহ তৈরি হয়েছিল বিষয়ী হিসাবে নারীকে নতুন করে পর্যালোচনার। বৌদ্ধিক ও সামাজিক স্তরে এক শ্রেণির নারীর অংশ গ্রহণের ফলে তার বিষয়ী অবস্থান চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছিল। 'পরিবর্তনকামী ও বিরোধীদের দ্বন্দ্বের ফল স্বরূপ একটি সামাজিক রূপান্তরের প্রয়াস

---

[31] অসিত বন্দোপাধ্যায়, *আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত,* (কলকাতা: মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ ১৩৬৭); সেন, ২০১০।

[32] বন্দোপাধ্যায়, ১৩৬৭, পৃ. ২৬১-২৭২।

[33] ভট্টাচার্য, ২০০২, পৃ. ২।

নিঃসন্দেহে' দেখা গিয়েছিল।[34] আর এই বিষয়ে কল্লোল ও কিঞ্চিৎ পরবর্তীকালে পরিচয়গোষ্ঠীর ভূমিকা অনস্বীকার্য।

বহির্জগতেও উনিশশ বিশ/তিরিশের দশক নারী আন্দোলন ও চেতনার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ। মেয়েদের রাজনীতিতে যোগদান, নতুন সংগঠন তৈরী ইত্যাদি রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধিতেও নতুন মাত্রা আনে। বলা বাহুল্য এই 'সচেতনতা' সীমাবদ্ধ ছিল মূলত শহরাঞ্চলের শিক্ষিত, তথাকথিত আলোকপ্রাপ্ত মহিলাদের মধ্যেই। জাতীয়তাবাদ ও নারী সচেতনতার প্রশ্নটি জটিল আবর্তের মধ্যে দিয়ে ভারতে তথা বাংলায় রূপ নিয়েছে। তার চরিত্র ও রূপায়ণের প্রক্রিয়া সংক্রান্ত বিতর্ক আজও অমীমাংসিত। সেটা এই মুহূর্তে আমার আলোচ্য নয়। শুধু এইটুকু বলা যায় পারিপার্শ্বিক ঘটনাপ্রবাহের অভিঘাতে বহির্জগতে, রাজনৈতিক পরিসরে মেয়েদের অংশগ্রহণ লক্ষনীয় ভাবে বেড়েছিল। ১৯২৫ সালে 'ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অব উইমেন্স'-র ভারতীয় শাখা গঠিত হয়। ১৯২৭ সালে 'অল ইন্ডিয়া উইমেন্স কনফারেন্স' অনুষ্ঠিত হয়। ১৯২০র দশক থেকেই বাংলার মহিলাদের ভোটাধিকারের সপক্ষে অভিযান শুরু হয়। জাতীয় রাজনীতি ও কম্যুনিস্ট পার্টিতেও মেয়েদের আংশগ্রহণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। তবে জানকী নায়ারের মতামত এই প্রসঙ্গে প্রণিধাণযোগ্য, '"অভিপ্রেত বিধি লঙ্ঘন" করা সত্ত্বেও এই সব মহিলারা জাতীয়তাবাদী পিতৃতান্ত্রিকতার "প্রভুত্ববাদী আশা-আকাঙ্খার" সঙ্গে সহমত হয়েছিলেন'।[35]

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার যে, ১৯২০-৩০-এর দশক সম্পর্কে প্রায় সকলেই পূর্বতন সময়ের সঙ্গে একটা ছেদ (rupture) বা বিরতি/ভাঙন (break)-র কথা বলছেন। বলছেন পরিবর্তনের কথা। সাহিত্যিকরা যে

[34] ভট্টাচার্য, ২০১৮, পৃ. ৩।

[35] Janaki Nair and Mary E. John, *A Question of silence: The Sexual Economy of Modern India*, (New Delhi: Kali for Women, 1998), 82-100.

রাজনৈতিক মতাদর্শের অংশীদার হোন না কেন, বা তাঁদের প্রেক্ষাপট যাই হোক না কেন, এই 'ছেদ' বা 'বিরতি'-র সাপেক্ষে নিজেদের অবস্থান নির্ণয় ও ব্যাখ্যা করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। ফলত এই ভাঙন/ছেদ-এর সন্দর্ভটিকেই (discourse of rupture) আমি সমস্যায়িত (problematize) করতে চাইছি। যে তার্কিক সমষ্টিটি (discursive formation) আমার গবেষণার কেন্দ্রীয় বিষয় সেটি নিঃসন্দেহে কোনো সমসত্ত্ব একক নয়, বরং বহু বর্গ ও তাদের আন্তঃসম্পর্কের জটিলতা বিদ্যমান। সাহিত্যের আঙিনায় স্পষ্ট উচ্চারণের সমান্তরালে বক্রোক্তি, রূপক, অলঙ্কারও (tropes and metaphors) সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। সমস্যায়িত করার প্রক্রিয়ায় আমি বরং রূপক-অলঙ্কারের উপরেই বেশি মনোযোগ দেব কারণ লিঙ্গ-সম্পর্ক ও যৌনতা হল এমন একটি পরিসর যা অধিকাংশ সময়েই সব থেকে বেশি নীরব বা বড় জোর বলা চলে স্ব-বিরোধী। মিশেল ফুকোর অনুসরণে তাই বলতে পারি এই নৈঃশব্দই বলতে পারে অনেক অনুচ্চারিত কথা এবং যেটি কোনো বয়ানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ :

> Silence itself – the things one declines to say, or is forbidden to name, the discretion that required between different speakers – is less the absolute limit of discourse, the other side from which it is seperated by a strict boundary, thsn an element that functions alongside the things said, with them and in relation to them within over-all stategies. there is no binary division to be made between what one says and what one does not say; we must try to determine the different ways of not saying such things, how those who can and those who cannot speak of them are distributed, which type of discourse is authorized, or which form of discretion is required in either case. there is not one but many silences, and they are an integral part of the strategies that underlie and permeate discourses.[36]

[36] Michel Foucault, *History of Sexuality*, trans. Robert Hurley, (Australia: Penguin Books, 2008), 27.

তাই যে সমস্ত রচনায় লিঙ্গ-সম্পর্কের টানাপোড়েন বা উত্তেজনার ইঙ্গিত আছে সেগুলিকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমি পরিবর্তন বা ছেদের বয়ানকে বুঝে নিতে চাইব ভিন্ন ভিন্ন নৈঃশব্দের নিরিখে, যে নৈঃশব্দগুলি অন্তর্নিহিত থাকে সব বয়ানেই। নৈঃশব্দের আড়ালেই লুকিয়ে থাকে ইশারা, সংকেত আর অপর সম্ভাবনার ভান্ডার। আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে সাহিত্যিক ও ইতিহাসগত অথ্যসূত্রকে আমি সমগুরুত্বে বিবেচনা করব। কারণ তারা পরিপূরক। সেই কারণে এই পর্বের সাহিত্যের পরিবর্তন এবং ধারাবাহিকতাকে চিহ্নিত করার জন্য ঐতিহাসিক তথ্য ও ব্যাখ্যাগুলিকে গভীরভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন। যেমন লিন্ডা হাচিন দেখাতে চেয়েছেন, অতীত সর্বদা ইতিমধ্যেই (always already) রাচনিকভাবে উপস্থাপিত (textualised): '...অতীতের ঘটনা বিরাজ করে বস্তুগতভাবে, কিন্তু জ্ঞানতাত্ত্বিক পরিভাষায় আজ আমরা তাদের জানতে পারি কেবলমাত্র রচনার মাধ্যমে। ইতিহাসে তাদের উপস্থাপনের মাধ্যমে অতীতের ঘটনাগুলিতে অর্থ সংযুক্ত হয়, অস্তিত্বময় হয় না'। তাঁর নিজের ভাষায়, '...past events existed empirically, but in epistemological terms we can only know them today through texts. Past events are given meaning, not existence, by their representation in history'।[37] তাই এই দুই দশকের ঐতিহাসিক ও কল্পিত উপস্থাপনের মধ্যে স্থুল বিভাজন করা এবং নথিভূক্ত 'তথ্য'-কে প্রেক্ষাপট হিসাবে ব্যবহার ও সাহিত্যিক রচনাকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রবণতাই সমস্যাজনক হয়ে উঠতে পারে। এর বদলে বরং আমি দেখতে চাই কিভাবে একই উপমা-অলঙ্কার-রূপক বিছিয়ে থাকে কোনও একটি বিশেষ সময়ের যাবতীয় উপস্থাপনার ভিতরে, তা সে ঐতিহাসিক হোক বা কাল্পনিক। সুতরাং

[37] Linda Hutcheon, *The Politics of Postmodernism*, 2nd ed., (London & New York: Routledge, 2005), 75.

বলা যেতে পারে যে ছেদ বা বিদারণের বয়ান সম্বলিত সব ধরণের রচনাকেই আমি বিচার করব একটি অবচ্ছিন্ন আন্তঃরাচনিক (intertextual) সমগ্র হিসাবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমার উদ্দেশ্য থাকবে বাছাই করা কিছু সাহিত্যধর্মী রচনার লিঙ্গভিত্তিক পাঠ, কিন্তু অবশ্যই সাহিত্যগুনমান বিচার করা নয়।

পরিশেষে নারীবাদী তাত্ত্বিক কাঠামো ও দিশা ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু কথা বলা প্রয়োজন। প্রারম্ভেই স্পষ্ট ভাবে জানাতে চাই যে, আমার গবেষণা নারীবাদী পরিপ্রেক্ষিত ও তত্ত্ব আশ্রয় করে রচিত হয়েছে নিঃসন্দেহে, কিন্তু আমি আমার অনুসন্ধানের মাধ্যমে বিশেষভাবে সেই সমস্ত নারীর অশ্রুত কণ্ঠস্বর তুলে ধরার চেষ্টা করিনি যাঁরা এতদিন পর্যন্ত ছিলেন অবদমিত বা প্রান্তিক। পুরুষ সাহিত্যিকদের কলমে নারী বা নারীকেন্দ্রিক প্রশ্নগুলি কিভাবে প্রাসঙ্গিকতা পাচ্ছে বা বিষয় হয়ে উঠছে বা আদৌ উঠছে কিনা সেটি পর্যালোচনা করাও আমার গবেষণা বহির্ভূত। আমার নির্বাচন করা সাহিত্যে নারী কিভাবে লিঙ্গায়িত বিষয়ী হিসাবে উপস্থাপিত হয়ে চলেছিল তা আমি অনুসন্ধান করতে চাইছি না। কিংবা কেট মিলেট ও অন্যান্য দ্বিতীয় তরঙ্গের নারীবাদীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে খুঁজে দেখতে চাইছি না কিভাবে পুরুষ সাহিত্যিকদের রচনায় নারী ও তার যৌনতার উপস্থাপন ঘটেছে এবং কিভাবে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মতো পিতৃতান্ত্রিকতা সেখানে কাজ করে গেছে। বা সত্তরের দশকের নারীবাদচর্চায় (gynocritical) যেভাবে নারীর 'আত্মীকৃত চেতনা/উপলব্ধি'-র তুলে ধরার ধারা তৈরী হয়েছিল তাকে অনুসরণ করাও আমার উদ্দেশ্য নয়[38] অর্থাৎ মেয়েদের হারিয়ে যাওয়া বা উপেক্ষিত লেখা খুঁজে বার করা।

[38] গাইনোক্রিটিক বা গাইনোক্রিটিসিজম পরিভাষাটি নির্মাণ করেছিলেন এলেন শোয়াল্টার সত্তরের দশকে। মহলা লেখকদের রচনাকে একটি বিশেষ ধারা হিসাবে চিহ্নিত করে ঐতিহাসিক গবেষণা যার উদ্দেশ্য। পুরুষের সাহিত্যিক ঐতিহ্যকে প্রতিস্থাপন করতে চেয়েছিলেন তাঁরা নারীর একান্ত নিজস্ব কণ্ঠস্বরকে তুলে এনে।

এই কথা উল্লেখ করা খুব জরুরি যে, লিঙ্গ-সম্পর্ক বলতে আমি স্থানাভাবে কেবলমাত্র বিষমলিঙ্গ অর্থাৎ নারী-পুরুষের যৌনতা এবং লিঙ্গ-সম্পর্ক নিয়ে বর্তমান গবেষণা নিবন্ধে আলোচনা করব। সমলিঙ্গ-সমকামী বা অন্যান্য অনেক ধরণের যৌনতা ও তাতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যবর্তী সম্পর্ক নিয়ে গবেষণার ইচ্ছে আছে ভবিষ্যতে। আমি এই বিষয়ে অবহিত যে আমার নির্বাচিত কালপর্বে 'অপর' বা 'অন্য' যৌনতা সংক্রান্ত আলোচনা করা অনেক বেশি কঠিন, কারণ তথ্যসূত্রের অপ্রতুলতা। আজকের সমাজেও হেটেরোসেক্সুয়াল নরম্যাটিভ ডিসকোর্স অর্থাৎ বিষমলিঙ্গের মান-নির্ণায়ক সন্দর্ভের বাইরে অন্য যাবতীয় যৌনতার অভিজ্ঞতা ব্রাত্য, উপেক্ষিত, এমনকি নিপীড়িত ও অবদমিত। সুতরাং স্বাভাবিক বুদ্ধিতেই অনুমান করা যায় যে, তৎকালীন পরিস্থিতি কিরকম ছিল। সর্বসমক্ষে সমকামীদের নিজেকে প্রকাশের সামান্যতম সুযোগ ছিল না। কিন্তু সমাজে অপরাপর চর্যা ও অভ্যাসের উপস্থিতি সম্পর্কে ইশারা পাওয়া যায় নানাভাবে।

সুস্পষ্টভাবে বলতে গেলে আমার বিচার্য বিষয় হল আলোচ্য কালপর্বের সঙ্কট, হতাশা, বিক্ষোভ আর পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন রচনার মধ্যে – যার মধ্যে অধিকাংশই সাহিত্যিক উপাদান প্রয়োজনে তথাকথিত অ-সাহিত্যিক উপাদানও অল্প-বিস্তর ব্যবহার করেছি – লিঙ্গ-সম্পর্কের ধারণা (উপলব্ধি/কল্পমূর্তি)-তে কোনো ধরণের পরিবর্তন ঘটেছিল কিনা। 'ধারণা/কল্পমূর্তি' (perception) শব্দটি ব্যবহারের মধ্যে একটি সম্ভাব্য ঝুঁকি থেকে যায়, তা হল আমি যেন অসতর্কভাবে ইতিহাসের একটি সন্ধিক্ষণে নারী পুরুষের চেতনা সম্পর্কে কিছু বলার প্রচেষ্টা করছি। সেই কারণে পুনরাবৃত্তি প্রয়োজন যে, আমি 'ধারণা'-র কথা আমি আলোচনা করতে চলেছি তা সম্পূর্ণ পাঠগত বা রাচনিক (textual)।

লিঙ্গ ধারণার ক্ষেত্রে ‘পরিবর্তন’ বলতে আমি ঠিক কি বোঝাতে চাইছি সেটি আরও একটু পরিষ্কার করে বলা প্রয়োজন। আমি গবেষণার মধ্যে দিয়ে লিঙ্গসম্পর্কের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ভাঙনগুলিকে চিহ্নিত করতে চাইছি না যার মাধ্যমে পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধ বয়ান নির্মান করা সম্ভব। শীশ্নার্থকেন্দ্রিক সন্দর্ভে নারীর হয়ত কোনো স্থান নেই একমাত্র ছায়ামূর্তিসম, বিপজ্জনক অপর হয়ে ওঠা ছাড়া। পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধ বয়ান নির্মাণের জন্য নারীর নির্দিষ্ট বিষয়ী (fixed subject) হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াটিও সমস্যাজনক হয়ে উঠতে পারে। কারণ ‘সাবজেক্ট’ শব্দটিকে ‘বিষয়ী’-তে রূপান্তরের মধ্যেই একটা সমস্যা নিহিত আছে। ‘সাবজেক্ট’ শব্দে অন্তত তিনটি অর্থের খেলা চলে। একাধারে তা বিষয়, বিষয়ী এবং প্রজা। অধীনতা আর বিষয়ীতার ফাঁকে জড়ানো তার অ(ন)ন্য অস্তিত্ব। নারী হয়ে পড়ে তথাকথিত ‘হিউ-ম্যান’ বা মানবের ল্যাকিং আদার বা অধঃপতিত অপর। যে ভাষায় সে পিতৃতন্ত্রকে প্রশ্ন করে, প্রতিস্পর্ধা জানায় সেই ভাষাও লিঙ্গায়িত (gendered), সেই ভাষার প্রতিটি শব্দ-অক্ষরের গায়ে লেগে আছে পুরুষানুক্রমিক চর্চার জলছাপ, যারা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিবর্তিত, পরিবর্তিত, প্রতিসৃত হয়ে চলেছে। শব্দ আর অর্থ পারস্পরিক টানাপোড়েনে দোলায়িত। আর এই অর্থের নির্মাণের প্রক্রিয়াটাও ক্ষমতা, অর্থনৈতিক বাস্তবতা, সামাজিক রীতি নীতি, ধ্যান ধারণা নিরপেক্ষ নয়। যে সমাজ যে কাঠামো প্রতি মূহুর্তে ভিন্নতার টুঁটি চেপে ধরে সেই সমাজের ভাষাতেই তো নিজেকে প্রকাশ করে ‘অপর’। বুঝতে শেখে, বলতে শেখে, রুখে দাঁড়ায়। পিতৃতন্ত্রের যে বয়ানগুলি অর্থ নির্ধারণ করে তাকেই প্রশ্ন করা প্রয়োজন, নাহলে তার ফাঁদে পা দেওয়া অবশ্যম্ভাবী। ‘অধিকার’ নামক ধারণার পিছনেও আছে পুংবাদের অমোঘ নির্ঘোষ, ফলত সচেতন না থাকলে নারীবাদের সমানাধিকারের দাবীও নিয়ে পড়তে পারে একই স্থানাঙ্কে। অর্থাৎ অধিপত্য-বিরোধিতার আখ্যানও শেষমেশ হয়ে উঠতে পারে অধি-আখ্যান (grand

narrative)। তাই নারীর কণ্ঠস্বরকে খুঁজে বার করার বদলে হয়তো আমাদের উচিৎ নৈঃশব্দকে চিহ্নিত করতে পারা, তার উপস্থিতি নয় বরং অনুপস্থিতি, সেই প্রচেষ্টাকে খুঁড়ে বার করা যা হয়তো ইতিমধ্যেই ব্যর্থ হয়েছে। যে অন্তর্ঘাতমূলক শক্তির প্রতি আমার আগ্রহ তাকে জাক দেরিদার 'অবিনির্মানের আন্দোলন' ('movements of deconstruction')-এর সঙ্গে সমার্থক বলা যেতে পারে।

> The movements of deconstruction do not destroy structures from the outside. They are not possible and effective, nor can they take accurate aim, except by inhabiting those structures. Inhabiting them *in a certain way*, because one always inhabits, and all the more when one does not suspect it. Operating necessarily from the inside, borrowing all the strategic and economic resources of subversion from the old structure, borrowing them structurally... the enterprise of deconstruction always in a certain way falls prey to its own work.[39]

সুতরাং, সংক্ষেপে বলা যেতে পারে নারী মুক্তি বা নারীর ক্ষমতায়নের সপক্ষে যুক্তি পেশ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। বরং প্রথাগতভাবে দৃঢ়প্রোথিত যাবতীয় প্রতিষ্ঠান, বর্গ, আকার, চরিত্র, ধারণা, সংজ্ঞা ও চিত্রকল্পকে সমস্যায়িত করা এবং আত্মপরিচয় ও প্রতিরোধের সন্দর্ভকে বিস্থিত (destabilized) করে সীমানার প্রসারণকে চিহ্নিত করাই আমার গবেষণার উদ্দেশ্য। আমার এখানে পরিষ্কার করে বলা উচিৎ যে, আমি নারী শব্দের ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে শব্দটির আক্ষরিক বা সমাজতাত্ত্বিক অর্থের থেকে আরও বেশি কিছু বোঝাতে চাইছি। নারীর জাত্যার্থ এখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রতীকী। আমি অর্থকে প্রসারিত করতে চাইছি যতদূর সম্ভব। সন্দর্ভের বিভিন্ন অংশে নারী শব্দের

[39] Jacques Derrida, Of Grammatology, trans. Gayatri Chakrabarty Spivak, (New Delhi: Motilal Banarsidass, 1994), 24.

ব্যবহার হয়েছে প্রান্তিক, যুক্তিবাদ ও বৈজ্ঞানিকতার বিপ্রতীপে অবস্থানকারী, আধুনিকতার প্রস্তাবিত পথের সঙ্গে তির্যক সম্পর্কে থাকা, প্রভূত্ববিস্তারকামী-একমাত্রিক-অনড় এবং মান্য সন্দর্ভের বিরোধী একটি বর্গ হিসাবে। যাদের জীবনচর্যা ছাপ ফেলে যায় প্রান্তিক-মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্ত-অভিজাত প্রতিটি সাংসারিকতায়। প্রশ্ন করে ঘেরাটোপের মান্যতাকে। যাদের উচ্চারণের পাশাপাশি নিঃশব্দও বহুমাত্রিকতায় ভাস্বর। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, নারীকে এহেন বর্গ হিসাবে চিহ্নিত করার অর্থ কিন্তু নারীকে সমস্ত দোষ-ত্রুটির ঊর্ধ্বে স্থাপন করা নয়। বরং এই বাস্তবতাও স্বীকার করা দরকার যে, ব্যক্তি হিসাবে একজন নারী মান্য সন্দর্ভকে আত্মস্থ করতে পারে এবং সামগ্রিকভাবে নারীসমাজ পিতৃতন্ত্রের ও ক্ষমতার বাচনের বাইরে অবস্থান করে না বা করতে পারে না। এই সত্য স্বীকার্য যে, বংশানুক্রমে পিতৃতন্ত্রের বয়ান ও বাচনের ধারক এবং বাহক হতে উঠতে পারে নারী। তার মধ্যে যাবতীয় পক্ষপাত (শ্রেণি-বর্ণ-জাতি-লিঙ্গ-ধর্ম-ভাষা প্রভৃতি) থাকতে পারে বা থাকে। কেন্দ্রের মতোই প্রান্তিকরাও এক নয় বহু এবং বৈচিত্রময়।

সাহিত্য নিরীক্ষণ, পর্যালোচনা এবং উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাদি

আকর গ্রন্থগুলি যেহেতু মূল অংশে আলোচ্য তাই এখানে আমি সেই বইগুলি আলোচনার মধ্যে রাখছি না। আলোচ্য ঐতিহাসিক কালপর্বকে জানা; তার আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক সংবেদন এবং মননকে জানা এবং অনুভবের জন্য আমি কতকগুলি বইয়ের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করেছি, প্রচুর সাহায্য নিয়েছি বা বলা ভালো, যথেচ্ছভাবে সন্দর্ভে ব্যবহার করেছি। এছাড়াও, তাত্ত্বিক ও প্রকরণগত কাঠামো নির্মাণের জন্যও কয়েকটি গ্রন্থ আমায় বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। দেখার দৃষ্টিকোণের প্রসারতা

থেকে শব্দভাণ্ডার সৃজন – প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমি লাভবান হয়েছি। নিম্নলিখিত অংশে আমি সেই বইগুলি নিয়ে কিছু আলোচনা করতে চাই।

রিটা ফেলস্কি *দ্য জেন্ডার অফ মডার্নিটি* গ্রন্থে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছেন, আধুনিকতার লিঙ্গ (জেন্ডার) কাকে বলে? কোনও একটি ঐতিহাসিক কালপর্বের কি লিঙ্গ থাকতে পারে? সাধারণভাবে প্রশ্নগুলি খুবই বিমূর্ত লাগে। তাই তিনি বলছেন যে, 'রাচনিকতার ঐতিহাসিকতা (historicity of textuality) এবং ঐতিহাসিকতার রাচনিকতা'-র ধারণাটি প্রাথমিক পর্যায়ে যতটা দুরূহ বলে মনে হত, হয়ত ততটা নয়'। রিটার মতে, যদি আমাদের অতীত সম্পর্কে ধারণা অবশ্যম্ভাবীভাবে কাহিনি (narrative)-র ব্যাখ্যমূলক যুক্তি দ্বারা রূপায়িত হয়ে থাকে, তাহলে যে গল্পগুলি আমরা নির্মাণ করি সেগুলিও লিঙ্গ প্রতীকিবাদের (symbolism) অপরিহার্য উপস্থিতি ও ক্ষমতাকেই উন্মোচিত করবে। এই আধুনিক পরিসরেই সম্ভবত সব থেকে বেশি করে সাংস্কৃতিক রচনাগুলি পুরুষত্ব ও নারীত্বের রূপক দ্বারা সম্পৃক্ত হয়ে আছে। সেই কারনেই ইতিহাসের লিঙ্গ-কেন্দ্রিকতা, এবং তার সঙ্গে ঐতিহাসিকতার লিঙ্গের প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রীটা এই বিষয়টিকেই তাঁর বইয়ের পরবর্তী আলোচনার leitmotif বলে অভিহিত করেছেন। উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন যে আমার গবেষণার মূল সুরটিও এই তারেই বাঁধা।

নারীবাদী প্রতর্কে স্থিরীকৃত বিষয়ী(fixed subject)-র নির্মাণ প্রক্রিয়াটাকে সমস্যায়িত (problematize) করার জন্যে আমি প্রতিনিধিত্বকারী উদাহরণ হিসেবে দুটো পাঠকে বেছে নিয়েছি। জুডিথ বাটলারের 'Contingent Foundations: Feminism and Question of 'Postmodernism'' আর ডোনা হারাওয়ের *A Manifesto for Cyborgs: Science, Technology, and Socialist Feminism in the 1980s*। উত্তর-আধুনিকতা আর নারীবাদের মধ্যেকার সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে বাটলার

বলেছেন, রাজনীতির জন্য স্থিতু/নির্দিষ্ট বিষয়ীর কল্পনা করা সব সময়েই গণ্ডগোলের। কারণ তা রাজনীতির সীমা বা পরিসরকেই সীমায়িত করে। সমালোচনার যেকোনো ইশারাই সেখানে প্রাকরুদ্ধ (foreclosed)। বলা ভালো এহেন বিষয়ীর নির্মাণের প্রক্রিয়াটাই ভিন্নতর সম্ভবনাগুলোকে আত্মস্যাৎ করে নেয়। তার নির্মাণ প্রক্রিয়া সম্ভবপর হয় 'অ(ন্যা)ন্য'-কে বহিষ্কার (exclusion)-এর মধ্যে দিয়ে। অপরের অস্তিত্ব মুছে দেওয়ার বিনিময়েই তৈরী হয় একটা সুস্থিত, সার্বজনীন বিষয়ী। তিনি 'বিষয়ী'-র ধারণা থেকে সরে আসছেন না বরং তিনি বিষয়ীর সংস্থানের (constituting the subject) প্রক্রিয়াটিকেই সমস্যায়িত করতে বলছেন।

আমরা সার্বজনীন ও সামগ্রিক বিশ্ববীক্ষার এক সুনির্দিষ্ট বিরোধী-আখ্যান পাই হারাওয়ের সাইবর্গ ম্যানিফেস্টোতে। নারীবাদের বিষয়ী হিসাবে তিনি সামনে এনেছেন সাইবর্গের ধারণাকে। যার কোনো জন্মলগ্ন নেই, সামগ্রিকতা নেই, আশীর্বাদ বা আশঙ্কা নেই, নেই প্রকৃতির সঙ্গে কোনো একতা। পিতার পাঁজর বা মাতার গর্ভ থেকে যে জন্মায়নি। যার নিষ্টা একমাত্র স্থানিকতায়, শ্লেষে, সংলগ্নতায়, বিকৃতিতে। সাইবর্গ ভেঙে দেয় যাবতীয় প্রচলিত প্রত্যয়গুলোকে। জৈব-নিশ্চয়তার ভিতকে নস্যাৎ করে লহমায়। মানুষ-পশু, যন্ত্র-জৈবিক, দেহী-বিদেহী ইত্যাদি দ্বিত্তের সীমারেখা ভেঙে দেয়। হারাওয়ে সরাসরি সাইবর্গকে রাজনৈতিক কর্মকান্ডের বিষয়ী হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু এই বিষয়ী স্থিরিকৃত নয় বরং চূড়ান্ত ভাবে বিস্থিত/ স্থিতিচ্যুত (destabilized)। হারাওয়ের মতে সমাজতন্ত্রী বা নারীবাদী দুই শিবিরই তাদের জ্ঞানতাত্ত্বিক কাঠামোয় স্থানু/সার্বজনীন বিষয়ীকে কেন্দ্রে স্থাপন করে, নিষ্পেষণের বিবিধ উপায়কে আত্মীকৃত করেছে। আর অন্য সমস্ত সম্ভাবনাকে বাদ দিয়েছে। হারাওয়ে তাই মনে করেন একমাত্রিক বস্তুনিষ্ঠতায় বা কোনো বিশেষ বিশেষণে নারীবাদকে ধরা যাবে না। সুতরাং আত্মপরিচয় (identity)–র

ভিত্তিতে কোনো একতাও সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে তিনি সন্নিহিতি (affinity)-র কথা বলেছেন, একমাত্র যার মাধ্যমেই সংযোগ সম্ভব। অর্থ্যাৎ হারাওয়ে যৌন-ভিন্নতার বাইরে গিয়ে নারীবাদের জন্য বিষয়ীর সন্ধান করলেন, যা বিস্থিত।

চারু গুপ্তা *সেক্সুয়ালিটি, অবসিনিটি, কমিউনিটি* গ্রন্থে দুটি পৃথক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন – ঔপনিবেশিক শাসনের শেষ পর্বে উত্তর ভারতে পিতৃতন্ত্রের পুনর্গঠন এবং এই সময়কালেই হিন্দু সংগঠন এবং মতাদর্শের উগ্র রূপ গ্রহণ। চারু পরিচিতির ধারণা (concept of identity)-কে সর্বজনীন অর্থে না ধরে, কৌশলগত এবং অবস্থানগত অর্থে দেখতে চেয়েছেন। তিনি তুলে ধরেছেন কিভাবে পুরুষতন্ত্রের অভ্যন্তরে এবং পুরুষতন্ত্রের সাহায্যে একমাত্রিক সাম্প্রদায়িক পরিচিতি তৈরী হয়। ক্ষমতাশালী আধুনিক হিন্দু নারীর পরিচিতি নির্মাণের জন্য সাহিত্যে এবং জনপ্রিয় সাংস্কৃতিকচর্চায় কিভাবে একটি বিশেষ যৌনতার ভাবমূর্তির উপস্থাপন ঘটেছে, তাও তিনি আলোচনা করেছেন। 'নতুন রাষ্ট্র'-এর সঙ্গে 'নতুন হিন্দু নারী'-র পরিচিতি নির্মাণ অঙ্গাঙ্গী জড়িত। স্বাভাবিক ভাবেই নারীর এই অনড়, অনমনীয় সংজ্ঞায় বাদ পরে যাবে অন্য যাবতীয় পরিচিতি। চারু দাবি করেছেন 'অন্দর' (private), 'বাহির' (public) বলে দুটি পৃথক পরিসর কখনওই ছিল না—যদিও হিন্দুত্বের দৃঢ় ঘোষনার জন্য পারিবারিক পরিসরটি খুবই প্রয়োজনীয় ছিল। যেকোনো স্থানিক ও রাজনৈতিক চর্চার মধ্যেই বিবিধ ও বহুসত্ত্ব পরিসর জড়িয়ে থাকে, এবং এই পরিসরগুলি ভেতর থেকেই অস্থিত। নারীত্বের নতুন আদর্শও ক্রিয়াশীল ছিল সর্বস্তরে। স্তরগুলির মধ্যে সীমারেখা ছিল অস্পষ্ট। ব্যক্তিগত পরিসরের সমস্যাগুলি আলোচিত হত প্রকাশ্যে, জনপরিসরে – বাজার, রেলস্টেশন, ছাপাখানা বা সাহিত্যে। তৎকালীন সময়ের যৌনতা, অশ্লীলতা এবং গোষ্ঠীর ধারণাকে বুঝতে চারু গুপ্তার গ্রন্থটির কাছে খুবই উপকার পেয়েছি।

আশিস নন্দী *এক্সাইলড অ্যাট হোম* (অধ্যায়: 'উওম্যান ভার্সেস উওম্যানলিনেস ইন ইন্ডিয়া', 'দ্য সাইকোলজি অফ কলোনিয়ালিজম', 'দ্য আনকলোনাইজড মাইন্ড') গ্রন্থে ভারতীয় সমাজের অন্তর্লীন মনস্তত্ত্বের সন্ধান করতে চেয়েছেন। কৃষিজীবী সমাজের নারীর আদিরূপ (architype)-এর ধারণা প্রবাহিত হয়েছে আধুনিক সময়েও। বিভিন্ন উপমা ব্যবহৃত হয়েছে নারীকে প্রকৃতির সঙ্গে একান্ত করে ভাবার ক্ষেত্রে। আশিস নন্দী মনে করেন, ভারতীয় সমাজে মাতা-পুত্র সমঝোতাই হল প্রধান ভিত্তি। ভারতীয় পুরুষদের ভয় এখানে নয় যে, সে নারীসুলভ হয়ে পড়বে বা তার পৌরুষ হারাবে। পৌরুষ (potency) এমন কোনও বিশেষ গুণ নয় যার জন্য সে সংগ্রাম করে বা বাইরের সঙ্গে লড়ে। বরং নন্দীর মতে, এখানে পুরুষের ভীতি হল নারী যদি তার নীতি থেকে বিচ্যুত হয়, অর্থাৎ নারী প্রতারণা করবে, হিংসা করবে, দুষিত করবে বা মাতা হিসাবে রক্ষা করতে ব্যর্থ হবে। বস্তুত, ভারতীয় সংস্কৃতির একটি অন্তর্মুখী বৈশিষ্ট্যের ধারাবাহিকতার কথা উঠে আসছে। সৃজনশীলতা এবং নারীসুলভতার প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গী পাশ্চাত্যের থেকে পৃথক। নারীত্ব এবং ক্ষমতার ঐতিহ্যগত আন্তঃসম্পর্কটি ঔপনিবেশিক শাসনের কাছে সমস্যাজনক হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল। ভারতীয় মনস্তত্ত্বের এই ভাষ্য, অন্যান্য ব্যাখ্যার সমান্তরালে আমায় অপর সম্ভাবনাগুলিকে খতিয়ে দেখতে সাহায্য করেছে।

প্রভিন্সিয়ালিজিং ইওরোপ নামক দীপেশ চক্রবর্তীর বইটি মূলত দুটি ভাবে বিভক্ত। প্রথমে তিনি আলোচনা করেছেন ইতিহাসবাদ এবং আধুনিকতার আখ্যান সম্পর্কে। পরের অংশে আছে উচ্চবর্ণের হিন্দু, শিক্ষিতদের আধুনিকতার কিছু প্রসঙ্গ বা বিষয় সম্পর্কে ঐতিহাসিক অনুসন্ধান। তাঁর মতে উনিশ শতকের ইউরোপের দুটি বৌদ্ধিক উপহার হল – 'ইতিহাসবাদ' এবং 'রাজনৈতিক'-এর ধারণা, যা আধুনিকতার সঙ্গে সংযুক্ত। একই সঙ্গে আধুনিকতা এবং আলোকপ্রাপ্তির ধারণা দুটি পাশ্চাত্যের সঙ্গে ভৌগোলিকভাবে

সংযুক্ত। সেখান থেকে যাবতীয় ধারণা ছড়িয়ে পড়ে বাইরের দিকে। ঐতিহাসিক সময়কাল নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে ইতিহাসবাদ দ্বারা। ইতিহাসবাদ ঐতিহাসিক সময়কালকে ব্যাবহার করে পাশ্চাত্য ও অ-পাশ্চাত্যের মধ্যে সাংস্কৃতিক পার্থক্যের মাপকাঠি হিসাবে। অর্থাৎ অনেক আগে থেকে এবং বেশি এগিয়ে থাকা দেশগুলির (অবশ্যই পাশ্চাত্যের) মধ্যে পিছিয়ে থাকা বা পরে 'অগ্রগতি'-র সুচনা হওয়া দেশগুলি খুঁজে পাবে নিজেদের ভবিষ্যত। বিভিন্ন চিন্তাবিদের রচনা আলোচনা করে দীপেশ চক্রবর্তী দেখিয়েছেন যে, উনিশ শতকের এই ইতিহাসবাদ পাশ্চাত্য-বহির্ভূত দেশগুলিকে বুঝিয়েছিল যে, তারা এখনও প্রস্তুত নয়, পর্যাপ্তভাবে উন্নত নয়, তাই এখনও অপেক্ষা করতে হবে।

বিশ শতকে ঔপনিবেশিকতাবিরোধী গণতান্ত্রিক দাবীগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল স্বায়ত্ব শাসন, যা ঔপনিবেশিক প্রভূর অপেক্ষাগারের (waiting room) ধারণাকে খণ্ডন করে কালিক সক্রিয়তার (temporal action) ধারণাকে সজোরে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, তাৎক্ষণিক (now)-কে সামনে আনার মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ অ-পাশ্চাত্য সমাজগুলিতে রাজনৈতিক আধুনিকতার প্রশ্নটির একেবারে কেন্দ্রে এসেছিল ইতিহাসবাদের সমালোচনা, পরে নয়, 'এখন'-ই যা হওয়ার হবে। তার জন্য প্রস্তুতির আর প্রয়োজন নেই। 'এখনও নয়'-এর যুক্তি দিয়ে ঔপনিবেশিক প্রভূ কর্তৃক স্বায়ত্ব শাসন নাকচ হওয়ায় জাতিয়তাবাদী অভিজাতরাও এই 'অপেক্ষাগার'-এর ধারণাকে নস্যাৎ করতে শুরু করেছিল। বিশ শতকের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল প্রথাগতভাবে শিক্ষিত না হয়ে ওঠা বা নাগরিকত্বের ধারণা ছাড়াই রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ক্রিয়ায় যোগদান করেছিলেন বিপুল সংখ্যক কৃষক। দুই বিশ্বযুদ্ধের মাঝের কালপর্বে ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে দ্রুত পালটে যাচ্ছিল বাঙালি মধ্যবিত্তের জগত। এই বদলে যাওয়া জগতের সামাজিকতাকে বুঝতে আড্ডার ইতিহাসের শরণাপন্ন হয়েছেন দীপেশ চক্রবর্তী। আধুনিক বিষয়ী হিসাবে

বিধবা নারী-র উত্থানের প্রশ্নটিও আলোচনা করেছেন তিনি। এছাড়াও ইতিহাসবাদের সমালোচনা পেশ করেছেন তিনি। সুতরাং সামগ্রিকভাবেই তাত্ত্বিক এবং পরিস্থিতিগত বোঝাপড়ার জন্য এই বইটি আমায় প্রভূত সাহায্য করেছে।

রজত কান্ত রায়ের *এক্সপ্লোরিং ইমোশানাল হিস্ট্রি* বইটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কারণ তিনি ভারতীয় জাগরণের (Indian awakening) অনুভূতির ইতিহাস অনুসন্ধান করতে চেয়েছেন। এই ইতিহাস রচনার মূল উপাদান হিসাবে সাহিত্যকেই তিনি চিহ্নিত করেছেন। এই বিষয়ে যেহেতু ইতিপূর্বে খুব বেশি কাজ হয়নি, সেকথা রায় নিজেই জানিয়েছেন, তাই তাঁর গ্রন্থটি আমায় বিশেষভাবে উপকৃত করেছে। রায় মনে করেন, ভারতীয় জাগরণে নারীর নিজস্ব মন তৈরি হয়েছিল, সাহিত্যে যার প্রকাশ ঘটেছিল প্রেমের বিভিন্নতায়। পুরাতন যৌন-নৈতিকতার সঙ্গে তীব্র পার্থক্য সূচীত হয়েছিল এই সময়। পার্থক্যের মূল কারণ হল নারীর নিবিড় সত্য অন্বেষণ। নারী এখন আর প্রেমিকার বিমূর্ত ব্যক্তিত্বের প্রতীক স্বরূপ নয়, সে এখন নিজের অধিকারবলেই এক স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, পৌরানিক সত্য প্রকাশের প্রণালী বা কামজ আবেদনের উপকরণ নয়। সে আর পরকীয়া বা স্বকীয়া নয়, কোনো পুরুষের সম্পত্তি নয় সে, নিজের অধিকারে বলিয়ান সে। রজতকান্ত রায় মনে করেন চিন্তাজগতে এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের বৈপ্লবিক প্রভাব পড়েছিল পরিবার ও সমাজ জীবনে। পিতৃতন্ত্র তার ভিত্তি পরিবর্তন করেছিল। তা সত্ত্বেও অনুভূতির ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতার উপরেই তিনি জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে, বিরহ এবং ভাব-সম্মিলনের আন্তঃসম্পর্ক একটি শক্তিশালী সমবায় হিসাবে থেকে গিয়েছিল, আধুনিক ভারতীয় সমাজে পরিস্থিতির নানা পরিবর্তন সত্ত্বেও। পাশ্চাত্য প্রভাবের সময়কাল হিসাবে তিনি ১৯২০ ও ৩০ এর দশককে চিহ্নিত করেছেন, যে সময়ে কিছু লেখক পাশ্চাত্য পরীক্ষানিরীক্ষার প্রতি বিমুগ্ধতা পোষন করতেন, আর এই আবেগতাড়িত পদক্ষেপই বেশ

কয়েকজন শক্তিশালী লেখককে দেশীয় অনুপ্রেরণার উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল বলে তিনি মনে করেন। কারণ '"আপ টু ডেট" থাকার এই আবেগতাড়িত বাসনা সর্বদা সব থেকে ভাল ফল উৎপাদন করে না।'[40] আমার সন্দর্ভে এই গ্রন্থের সঙ্গে আমার নিবিড় কথোপকথন হয়েছে। একদিকে যেমন উপকৃত হয়েছি, অন্যদিকে তাঁর দাবী সমসময় মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি। তাই অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর মূল প্রতর্কের সমালোচনার মধ্যে দিয়ে আমার যুক্তিগুলি পরিবেশিত হয়েছে।

শিপ্রা সরকার, অনমিত্র দাশ সম্পাদিত *বাঙালির সাম্যবাদ চর্চা* গ্রন্থটিতে বাংলার সাম্যবাদী, বামপন্থী ও মার্কসবাদীচর্চার আদি থেকে চল্লিশের দশকের শেষ পর্যন্ত ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে সংকলিত লেখাগুলির সাহায্যে। প্রবন্ধগুলির সজ্জা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে ১৯১০-৩০-এর মধ্যে রাশিয়া, সাম্যবাদ, কম্যুনিজম ইত্যাদি নিয়ে খুব স্পষ্ট না হলেও বৌদ্ধিক স্তরে আগ্রহ ও চর্চা শুরু হয়েছিল। ভারতের বিকল্প ভবিষ্যৎ সম্পর্কীত আলোচনায় গান্ধি-মার্কস-লেনিন পাশাপাশি আলোচিত হতে শুরু করেন। রাশিয়া সম্পর্কেও মোটের উপর সপ্রশংস মনোভাব বজায় ছিল। আলোচনাকারী ব্যক্তিরা বা পত্রিকাগুলি সে সবসময় সাম্যবাদী বা বামমনস্ক ছিলেন তা নয়। সাম্যবাদী না হয়েও শ্রমিক-কৃষকের অবস্থার উন্নতির জন্য অনেকেই আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন বা কলম ধরেছিলেন। মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের এক অংশও বলশেভিক/সাম্যবাদী আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ফ্যাসিবাদ বিরোধিতার সময় কম্যুনিস্টদের সামাজিক প্রভাব বৃদ্ধি ঘটেছিল, লেখক শিল্পী সংঘে সমাবেশ হয়েছিল বহু উজ্জ্বল নক্ষত্রের। *প্রগতি লেখক সংঘ*-র বিভিন্ন বক্তব্য এবং অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ সংকলিত হওয়ার ফলে, তৎকালীন সাহিত্যিক ও বৌদ্ধিক মননের একটি স্পষ্ট ছবি পাওয়া যায়। জানা যায় মন্বন্তরের সময়ও

[40] Rajat Kanta Ray, *Exploring Emotional History: Gender, Mentality and Literature in the Indian Awakening,* (New Delhi: Oxford University Press, 2003), 81.

ত্রাণকার্যে স্বতঃস্ফূর্ত যোগদানের ফলে কৃষক ও জনসমাজেও প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল কম্যুনিস্টদের। এমনকি মেয়েদের জন্য আলাদা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি গঠিত হয়েছিল। সাহিত্যে নবত্বের ধারণা এবং প্রগতিবাদের প্রয়োগ বোঝার জন্য এই গ্রন্থটির বিশেষ সাহায্য পেয়েছি।

এছাড়াও গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের বিভিন্ন রচনা এবং বিশ্লেষনী ধারা আমার দৃষ্টিকোণ নির্মাণের ভিত্তি তৈরি করেছে। মিশেল ফুকোর যৌনতার ইতিহাস-এর কথা অবশ্যই উল্লেখ্য। আমার সন্দর্ভের মূল অংশে এঁদের লেখা নিয়ে আলোচনা থাকবে। এছাড়াও ঐতিহাসিক পটভূমি সম্পর্কে ধারণা, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও তথ্যের জন্য আমি বিশেষ করে চারটি গ্রন্থের প্রতি কৃতজ্ঞ – সব্যসাচী ভট্টাচার্যের *বাংলায় সন্ধিক্ষণ: ইতিহাসের ধারা ১৯২০-১৯৪৭*, শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পলাশি থেকে পার্টিশন*, এবং সুমিত সরকারের *মডার্ণ ইন্ডিয়া* এবং *মডার্ণ টাইমস*। একটি বিষয়ের উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন: বাংলা ভাষায় সমাজবিজ্ঞান, দর্শন বা তাত্ত্বিক লেখালিখি সংক্রান্ত প্রভূত সমস্যার কথা। কোনও মান্য পরিভাষা বাংলায় নেই বললেই চলে। বাক্য গঠনেও সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এই সমস্যায় আমায় অনেকদূর সাহায্য করেছে প্রদীপ বসুর *বাংলা ভাষায় সমাজবিদ্যাচর্চা* গ্রন্থটি। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের জন্য আমায় নির্ভর করতে হয়েছে মূলত সুকুমার সেন, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস: পঞ্চম খন্ড*, ভূদেব চৌধুরির *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা*, গোপিকানাথ রায়চৌধুরির *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথা সাহিত্য* সহ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষেত্র গুপ্ত প্রমুখ লেখকের গ্রন্থগুলির উপর। এছাড়াও তৎকালীন সময়ে মোহিতলাল মজুমদার, প্রথম চৌধুরি থেকে গোপাল হালদার – অনেকের লেখার সাহায্য নিয়েছি আমি।

অধ্যায় বিভাজন

আমার সন্দর্ভটি ভূমিকা এবং উপসংহার ছাড়া চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত— ভূমিকা: পরিবর্তনের রূপকল্প এবং অতিকথা, প্রথম অধ্যায়: 'নবত্ব'-এর ধারণা ও লিঙ্গসম্পর্ক, দ্বিতীয় অধ্যায়: আধুনিকতা, আধুনিকতাবাদ: সাহিত্যে লিঙ্গায়ণ, তৃতীয় অধ্যায়: সাহিত্যে মনস্তত্ত্ব এবং প্রগতিবাদ: একটি নারীবাদী পাঠ, চতুর্থ অধ্যায়: জনপ্রিয়তা: একটি লিঙ্গসচেতন অবিনির্মাণ। এছাড়াও আছে উপসংহার: একটি আরম্ভের সূচনা।

প্রথম অধ্যায়: নবত্বের ধারণা ও লিঙ্গসম্পর্ক

বিশের দশকে বর্তমানকে পরিবর্তনের দায়িত্ব, আধুনিকতাকে নিজস্ব প্রয়োজন ও ভঙ্গিমায় সংজ্ঞায়িত ও মূর্ত করার প্রয়াস এবং সেই সঙ্গে আত্মপরিচয়ের ক্ষুধা নতুন মাত্রা পেয়েছিল বলা যায়। ১৯২০-র দশক থেকে বাংলার আত্মপরিচয় বা সত্তার নবতম ব্যাখ্যার সূচনা হয়েছিল। এই ধারা "নবজাগরণ" ও তার চূড়ান্ত পরিণতির সময় থেকে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন পর্যন্ত বিস্তৃত সময়কালের থেকে পৃথক করে বিশশতকীয় বাংলাকে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে নবত্ব, নতুন সাহিত্য প্রসঙ্গে বিতর্কের সূত্রপাত বিশের দশকের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে প্রগতি লেখক সংঘের সময়কাল ছাড়িয়ে এই বিতর্ক বারবার মাথাচাড়া দিয়েছে। তৎকালীন ও পরবর্তী সময়ের সাহিত্যের ইতিহাসবিদরাও এই সময়কালকে নতুনযুগ বা নব বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বলে উল্লেখ করেছেন। ঠিক কোন সময়ে এই নবত্বের সূচনা সেই বিতর্কের নিষ্পত্তি আমার উদ্দেশ্য নয়। আগেও উল্লেখ করেছি জনমানসে এবং আলোচনার পরিধিতে উক্ত সময়কাল সম্পর্কে নবত্ব বা পরিবর্তনের ধারণা ভালমতোই ছিল এবং এখনও আছে। বলা হত 'কল্লোলের' সাধনাই

ছিল নবীনতার, অনন্যতার সাধনা। 'যেমনটি আছে তেমনটিই ঠিক আছে, এর প্রচণ্ড অস্বীকৃতি'। 'আধুনিক মানেই প্রগতিপন্থী। প্রগতি মানেই প্রচলিত মতানুগত না হওয়া'।[41]

এই নবত্বের ধারণাটির সঙ্গেই আমি বোঝাপড়া করতে চাইছি প্রথম অধ্যায়ে। 'পরিবর্তন' বা নতুনত্ব'-র ধারণাকেই সমস্যায়িত করতে চাই। রিটা ফেলস্কি দেখিয়েছেন, আধুনিকতার চিহ্নগুলির মধ্যে অন্যতম হল নতুনত্ব বা নবত্বের ধারণা, উদ্ভাবন এবং ভবিষ্যতের ধারণা। 'পুরাতনের শেষ' এই ধারণার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে নতুন সূচনার বোধ। প্রায়শই অবক্ষয় এবং অধঃপতনের ধারণা সহাবস্থান করে ভবিষ্যৎ ও উজ্জ্বল নবপ্রভাতের উদিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে। বর্তমানের খিন্ন ক্লিষ্ট দীনতা থেকে যেনবা মুক্তি দিতে পারে একমাত্র সামনের না দেখা ভবিষ্যৎ। 'বর্তমান' এখানে যেন অতীতে পরিণত, ইতিমধ্যেই যাকে ত্যাগ করে, পিছনে ফেলে আসা হয়েছে। এবং ভবিষ্যতের অভিমুখে যাত্রার এই গতি একরৈখিক, সর্বদা সামনের দিকে। তাই আধুনিকতার মধ্যেই নিহিত থাকে যুগান্তরের ধারণা। একটি যুগের অবসানের মধ্য দিয়ে নতুন যুগের সুত্রপাত। এই কল্পিত ভবিষ্যতে নারীত্ব কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছিল। অর্থনৈতিক, সামাজিক, আইনি, সাংস্কৃতিক পরিসরে নারীর পরিবর্তীত অবস্থান অনেক মহিলাকেই অনুপ্রাণিত করেছিল এই ধারণা তৈরি করতে যে, সবকিছুর পরে নারীই আধুনিক জীবনের পরিবর্তনশীলতা এবং নবত্বের মেজাজ ও উদ্দীপনাকে সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত করতে পারে। আধুনিকতা এমন একটি যুগ যেখানে আধুনিক হয়ে ওঠা হল একটি মান (value)। বলা ভালো, আধুনিকতা হয়ে ওঠে এমন একটি মৌলিক মান, যার নিরিখে অন্যান্য মানগুলির মূল্যায়ণ করা হয়। এই অধ্যায়ে আমি সাহিত্যে পরিবর্তন, ভাঙন এবং নবত্বের ধারণা নিয়ে আলোচনা করব। কলকাতার আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি

[41] গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য,* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১৮), পৃ. ১৭৬।

চালচিত্র হিসাবে ঘুরে ফিরে আসবে। বোঝার চেষ্টা করত পরিবর্তনের ধারণাটি স্বয়ং লিঙ্গায়িত হয়ে উঠতে পারে কিনা।

দ্বিতীয় অধ্যায়: আধুনিকতা, আধুনিকতাবাদ: সাহিত্যে লিঙ্গায়ণ

উপনিবেশিক ছায়ায় উচ্চশিক্ষিত, তথাকথিত আলোকপ্রাপ্ত, শহুরে মধ্যবিত্ত বাঙালি মনন ও সংবেদনকে বোঝার জন্য আধুনকিতা এবং আধুনিকতাবাদ সংক্রান্ত আলোচনা বিশেষ প্রয়োজনীয়। বিশ শতকের শুরু থেকেই জাতীয়তাবাদ-আধুনিকতা সম্পর্কে নাগরিক জীবনে একটি চর্চার বাতাবরণ তৈরি হচ্ছিল। ভারতের সমাজ ও রাজনীতি ছিল জটিলতা ও স্ববিরোধে ভরপুর। দীপেশ চক্রবর্তী তাঁর *প্রভিনশিয়ালাইজিং ইওরোপ: পোষ্টকোলোনিয়াল থট আন্ড হিস্টরিক্যল ডিফারেন্স* গ্রন্থের শুরুতেই কতকগুলি ধারণার উল্লেখ করেছেন, যথা – নাগরিকত্ব, রাষ্ট্র, নাগরিক সমাজ, জনপরিসর, মানবিক অধিকার সমূহ, আইনের সমানাধিকার, অন্দর-বাহিরের পার্থক্য, প্রজা/বিষয়ীর ধারণা, গনতন্ত্র, জনপ্রিয় সর্বভৌমত্ব, সামাজিক ন্যায়, বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ ইত্যাদি। তাঁর মতে এই সবকটি ধারণার উপরেই পড়েছিল ইওরোপিয় ধ্যান ধারণা ও ইতিহাসের গভীর চাপ। উপরোক্ত এবং আরও কিছু সম্পর্কীত ধারণা চরম পরিণতি পেয়েছিল ইওরোপিয় আলোকায়ন এবং উনবিংশ শতকের যাত্রাপথে, তাই এই সবকিছুর সঙ্গে বিচ্ছিন্ন ভাবে কারোর পক্ষে রাজনৈতিক আধুনিকতার কথা ভাবাও সম্ভব নয়। আর ইওরোপিয় ঔপনিবেশিক প্রভূরা উনবিংশ শতক জুরে তাদের উপনিবেশগুলিতে একাধারে আলোকায়িত মানবতাবাদ প্রচার করেছে আর প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাকে অস্বীকার করেছে। এই বিষয়টি উল্লেখ করলাম তার কারণ বিংশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলা, তার সাহিত্য-মনন-চিন্তন-আবেগ উক্ত ধারণা ও ধারণার নির্মাণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত। আধুনিক শিক্ষিত বাঙালি

মধ্যবিত্ত শ্রেণি হল, প্রথম এশিয় সামাজিক গোষ্ঠী যাদের মানসিক জগত রূপান্তরিত হয়েছিল পাশ্চাত্যের সঙ্গে তাদের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে। কিন্তু সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রভাব নির্ণয় করা খুবই দুরূহ ও অনিশ্চিত ব্যপার। তবুও বলা যায়, বাস্তব পরিস্থিতি এবং তার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ বিদেশি তত্ত্ব ও সাহিত্য থেকে চিন্তার উপাদান সাহিত্যিকরা সংগ্রহ করেছিলেন। যুদ্ধের পটভূমিকায় ঔপনিবেশিক শাসনের দ্বৈত সত্তা সম্পর্কেও সচেতনতা এসেছিল।

এই প্রেক্ষাপটে আধুনিকতা নামক বর্গ বা ধারনাটিকেও আমি সমস্যায়িত (problematize) করে দেখতে চাইব সেই ধারণাটির নির্মাণের ভেতরেও থেকে গেছে কিনা নির্ধারণবাদী (deterministic) মনোভাব। রিটা ফেলস্কির কথা আগেই বলেছি, যিনি আধুনিকতার লিঙ্গ সন্ধানের প্রয়াস নিয়েছেন। তাঁরই মতে, আধুনিকতার কোনও সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য নেই। বরং তা স্ববিরোধে পরিপূর্ণ। আত্ম-সচেতন বিষয়ী, সন্নিধি (juxtaposition), মন্তাজ, স্ববিরোধ, বিরোধাভাস, অনিশ্চয়তা এবং বিষয়ীর অমানবিকীকরণ ইত্যাদি সবই আধুনিক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য। একাধারে রূপান্তরপ্রাপ্তি (transmutation) এবং ধারাবাহিকতা (continuity), দুইয়েরই অবস্থান আধুনিকতার ভিতরে। আধুনিকতার বৈচিত্রময় পরিসরে আছে – প্রাত্যহিক ও নগর জীবন, ঔপনিবেশিক আধিপত্যবাদ, সামগ্রিকতা ও ইতিহাসবাদ এবং ইতিহাসবাদের বাইরে নারীর অবস্থান, আধুনিক জীবনের খন্ডতা, আধুনিকতাবাদের নতুন স্থান-কাল ও কালীনতার ধারণা এবং নারীর উপস্থাপন সময়হীনতায়, লিঙ্গ-রাজনীতি ও আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়া, মুদ্রণ ও প্রকাশনার প্রভাব, পুরুষের উপর পুরুষত্ব প্রমাণের দায়িত্ব, নারী ও নাবালকের উপর সাহিত্যের কুপ্রভাব নিয়ে আলোচনা, বাস্তববাদ, এবং সামাজিক বাস্তববাদ ইত্যাদি নানা কিছু। উনিশ শতক শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই

প্রকৃতিবাদ ক্রমশ জায়গা করে নিতে থাকে। এবং শিল্পের ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক ও মূল্যবোধের জায়গায় কিছু পরিবর্তন ঘটে, অন্য একটি বিশ্বাস স্থান গ্রহণ করে। যেখানে কলঙ্কময় সামাজিক বাস্তবতার যাবতীয় তথ্য নথিভূক্ত করার একটা দেখা যায়। আধুনিকতা চিহ্নিত হয় গতিময় সক্রিয়তা, উন্নতি, এবং সীমাহীন অগ্রগতির প্রতি আকাঙ্ক্ষার দ্বারা। নব্য স্বশাসিত বুর্জোয়া বিষয়ী সংযুক্ত থাকে শিল্প উৎপাদন, যুক্তিবাদ এবং প্রকৃতির উপর আধিপত্যের ক্রমান্বয়ে গতিবৃদ্ধির সঙ্গে। তার বিপ্রতীপে আছে অপর এক আধুনিক ব্যক্তিমানুষ যে একইসঙ্গে অনেকটাই অ-সক্রিয় এবং আরও অনেক বেশি অনিশ্চিত। আধুনিকতার নারীবাদী সমালোচনায় তাই **আ**ধুনিক বিষয়ী হিসাবে অ-সক্রিয়, অনিশ্চিত, তথাকথিক অ-প্রকাশ্য নারী সত্ত্বার উন্মেষের কথা উঠে এসেছে। নারীবাদী ও উন্মাদিনীর আধুনিক বিষয়ী হিসাবে উত্থানের কথা ভাবা হয়েছে। মেয়েদের লেখায় আধুনিক উপাদান, নারীর আন্তঃসম্পর্কের বহুস্বর, নারীর যাপন/ দৈনন্দিনতা, আধিপত্য-স্থায়ীত্ব-শৃঙ্খলার বিপ্রতীপে অবস্থান এবং লিঙ্গকেন্দ্রিকতার বিরোধিতা এই সবই আধুনিকতারই বৈশিষ্ট্য। সুতরাং বিশ শতকের আধুনিকতার ধারণাকে প্রশ্ন করার মধ্য দিয়ে আমি লিঙ্গ-সম্পর্ককে বুঝে নিতে চাইব।

তৃতীয় অধ্যায়: মনস্তত্ত্ব এবং প্রগতিবাদ: একটি নারীবাদী পাঠ

বিশের দশকের সাহিত্যের বিরুদ্ধে অন্যতম অভিযোগ ছিল দেহজ কামনা, যৌনচেতনা এবং প্রকট যৌনতার প্রকাশ। পাশ্চাত্যের প্রভাবেই এই যৌনতার প্রতি আগ্রহের জন্ম কিনা সেই বিষয়ে বিতর্ক আজও চলেছে। সদ্য তারুণ্যে পা দেওয়া দুই সাহিত্যিকে তাদের প্রথম লেখার জন্য অশ্লীলতার অভিযোগেও অভিযুক্ত হতে হয়েছিল। অচিন্ত্য সেনুগুপ্তের *বিবাহের চেয়ে বড়* এবং বুদ্ধদেব বসুর *রজনী হল উতলা*। পরিবর্তনের

সন্দর্ভে মনস্তত্ত্ব এবং যৌনতা বিশেষ মাত্রা যুক্ত করেছিল একথা বলাই বাহুল্য। একদিকে ছিল সমাজে প্রতিষ্ঠিত মান্য নৈতিকতার ধারণার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ অন্যদিকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। এই প্রেক্ষিতে বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশের কথা স্মরণে রাখা প্রয়োজন। আলোচ্য কালপর্বের কিছু বছর আগেও নরনারীর প্রাক-বিবাহ বা বিবাহ বহির্ভূত প্রেম ছিল প্রায় নিষিদ্ধ। ছেলেমেয়ের মেলামেশার সুযোগ প্রায় ছিল না বললেই চলে। তাই প্রেমের প্রকাশের পটভূমি হিসাবে প্রায়শই সাহিত্যে বৈষ্ণবচর্চা ও চর্যার অনুষঙ্গের প্রয়োজন পড়ত। অধিকাংশ কাহিনির পরিণতিই হত প্রায় বাধ্যতামূলকভাবেই বিয়োগান্তক। ১৯২০-র দশক থেকেই দেখা যায় রোম্যান্সের বহিঃপ্রকাশ হিসাবে ধর্মীয় জীবনচর্চাকে ব্যবহারের এই ধারার বাইরে গিয়ে নারী-পুরুষের সম্পর্কে দেখতে চেয়েছেন অনেকেই। ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের *প্রেমের কথা নামক* গ্রন্থটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে ললিত কুমার উক্ত রচনাটি লিখেছিলেন এই অন্তর্নিহিত ধারণা থেকে যে উপন্যাসে প্রেমের প্রকাশ হল একটি নতুন ঘটনা। এটি এমন একটি অভিজ্ঞতা যা পূর্বে কোনোদিন সাহিত্যে নথিভূক্ত হয়নি বা কবিতায় বিশ্লেষিত হয়নি।

পুরাতন যৌন-নৈতিকতার সঙ্গে তীব্র পার্থক্য সূচীত হয়েছিল এই সময়। পার্থক্যের মূল কারণ হল নারীর নিবিড় সত্য অন্বেষণ। চিন্তাজগতে এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের বৈপ্লবিক প্রভাব পড়েছিল পরিবার ও সমাজ জীবনে। রজতকান্ত রায় মনে করেন পিতৃতন্ত্র তার ভিত্তি পরিবর্তন করেছিল। রায় তাঁর গ্রন্থে নারীবাদী ও উত্তর আধুনিক তত্ত্ব ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকার কথা নিজেই জানিয়েছেন। কিন্তু আমি নারীবাদী প্রকরণ ব্যবহার করেই খতিয়ে দেখতে চাই, বিষমলঙ্গের আদর্শস্থাপনকারী বয়ান ও নৈতিক মানদণ্ডের কোনও পরিবর্তন আদৌ ঘটেছিল কিনা। কারণ কেবলমাত্র যৌনতার প্রকাশ ঘটার মাধ্যমেই কোনও পাঠ (text) লিঙ্গ-সংবেদী হয়ে ওঠে না। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই

তথাকথিত বিপথগামী স্বেচ্ছাচারী নারীর কর্তৃত্ব, প্রতিনিধিত্ব এমনকি তার আত্মসচেতনতাকেই অস্বীকারের মধ্যে দিয়ে তাকে বিশেষভাবে আদর্শায়িত করে পুরুষ লেখক তার আরাধনা করে থাকে। নারীর যৌনতা এবং মনস্তত্ত্বকে বোঝার চেষ্টার মধ্যেও লুকিয়ে থাকতে পারে অপরিহার্যতাবাদী (essentialist) দৃষ্টিকোণ। স্বভাবতই আলোচনায় আসবে পাশ্চাত্যের প্রভাব এবং বৈষ্ণব রসতত্ত্বের ধারাবাহিকতার প্রশ্নটিও। আলোচ্য সময়ের সাহিত্যে আরও দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্যভাবে উঠে এসেছে – বস্তুনিষ্ঠা বা রিয়েলিজমের দিকে ঝোঁক এবং প্রগতির ধারণা। 'ভারতবর্ষ', 'প্রবাসী', 'বসুমতী', 'বঙ্গবাণী' প্রভৃতি পত্রিকায় 'বাস্তব' প্রবণতার পরিচয় ফুটে উঠেছিল তাকে আরও তীক্ষ্ণ, তীব্র করে তুলেছিলেন 'কল্লোলগোষ্ঠী'। যৌনমনস্তত্ত্বের অসঙ্কোচ রূপায়ণ, নিম্নবিত্ত্বের দৈনন্দিন আখ্যান উঠে এল তাঁদের লেখায়। যথারীতি সাহিত্যমহলে যুগপৎ তার প্রশংসা ও নিন্দা শুরু হল। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই ঝোঁকের নাম দিয়েছিলেন 'রিয়েলিটি কারি পাউডার'। রুশ বিপ্লবের সময় থেকে রুশ সাহিত্যের উপর আগ্রহ আরও বাড়তে শুরু করেছিল। উনিশ শতকের আর বিশ শতকের গোড়ার রাশিয়ার সাধারণ মধ্যবিত্ত এবং আত্মকেন্দ্রিক হতাশ ব্যর্থ বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে নিজেদের মিল পেয়েছিলেন অনেকেই। লোকায়ত জীবনের তুচ্ছ নগ্ন যন্ত্রণাবিদ্ধ ছবি এক দুর্নিবার আকর্ষণের বিষয়বস্তু হয়ে উঠল। আবার অন্যদিকে ফরাসী সাহিত্যের সঙ্গে বুদ্ধিজীবী বাঙালির পরিচয় ছিলই। ক্রমশ ফরাসী বাস্তববাদ ও প্রকৃতিবাদের (Naturalism) আগ্রহের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছিল বিশের দশকের তরুণ সাহিত্যিকদের মধ্যে। ফ্লব্যের এবং জোলার প্রভাবের কথা বিভিন্ন সাহিত্য সমালোচক উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও স্ক্যান্ডিনেভিয় নুট হ্যামসুন এবং জোহান বোয়ারের বিশেষ প্রভাব ছিল কল্লোল গোষ্ঠির উপর। তিরিশের দশক থেকে বাস্তবাদের পাশাপাশি সমাজবাস্তবতা এবং প্রগতির ধারণাও বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল

সাহিত্যিকদের। বিশের দশকের নানা বিভেদ ভুলে ফ্যাসিবাদের বিরোধিতায় গড়ে উঠেছিল *নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ*, ১৯৩৬ সালে। তার ইশতেহারে ঘোষনা করা হয়েছিল ভারতীয় সমাজ আজ আমূল পরিবর্তনের মুখোমুখি, তাই লেখক শিল্পীদের একমাত্র কর্তব্য বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের উপর যাবতীয় জোর দিয়ে প্রগতিবাদী সাহিত্যের ধারাকে বেগবান করা।

আমি এই অধ্যায়ে প্রগতিবাদের ধারণাকে সমস্যায়িত করার মধ্যে দিয়ে আধিপত্যকামী বাচনের কোনও উপস্থিতি আছে কিনা খুঁজে দেখতে চাইব। উপরোক্ত ধারণাগুলির মতই নারীবাদী প্রকরণের হস্তক্ষেপের ফলে আমাদের সামনে এমন কিছু মাত্রা উঠে আসতে পারে যা লিঙ্গকেন্দ্রিকতাকে নির্দেশ করে। উদাহরণস্বরূপ, যে সমস্ত শব্দ ও পরিভাষা আগে মূল্য-নিরপেক্ষ ছিল— আবেগপ্রবণ, অতিনাটকীয়, কল্পনাপ্রবণ বা রোম্যান্টিক, বাস্তববাদের আগমণের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলির গায়ে নঞর্থক জাত্যর্থ যুক্ত হয়ে পড়ল। তার ফলে শব্দগুলি হঠাৎ করেই হয়ে পড়ল মেয়েলি, পুরানোপন্থী। মনে করা হতে থাকল এই বিশেষ শব্দ বা তার ভাবগুলি বাস্তবকে উপস্থাপিত করতে অপারগ। এই জাতীয় শব্দ প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে যেন বা তৈরি হয় এক রম্য ভ্রম এবং প্রকাশিত হয় ভাবের অতিশয়োক্তি বা জ্বালা যন্ত্রণাময় বাস্তবের প্রতিচ্ছবি নয়। এমতাবস্থায় সাহিত্যক্ষেত্রে নারীর পদচারণা শুরু হলে, নারীত্বের সঙ্গে সংযুক্ত সৌন্দর্যবোধকে আরও সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। অনুভূতি (Sentiment) আর আবেগপ্রবণতা (emotiveness)-কে নামিয়ে আনা হল 'ভাবালুতা' (sentimentality)-র স্তরে।

বাস্তববাদের সঙ্গে একদিক থেকে যেমন সংযুক্ত প্রকৃতিবাদ, অন্যদিকে আবার সমাজবাস্তববাদের সঙ্গেও তার ঘনিষ্টতা। প্রকৃতিবাদের সঙ্গে সঙ্গে চলে আসে বিবর্তনবাদী

ধারণাও। প্রগতি ও বিবর্তনের দুটি ধারণাই *আধুনিক*-কে ঐতিহাসিক কালপর্ব এবং মাননির্ণায়ক প্রকল্প হিসাবে বিবেচনা করেছে। সেই কারণেই অধুনা বহু নারীবাদী এই সমস্ত ধারণা সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দিহান এবং তারা মনে করেন এই জাতীয় ধারণাগুলি মূলগতভাবেই পুরুষ-কেন্দ্রিক রাজনৈতিক আধুনিকতার পরম্পরা বহন করে। আধুনিক নারীবাদী প্রেক্ষিত থেকে আমি বাস্তববাদী রচনাগুলিকে দেখতে চাইব।

চতুর্থ অধ্যায়: জনপ্রিয়তা: একটি লিঙ্গসচেতন অবিনির্মাণ

জনপ্রিয়তাকে একটি বিষয় হিসাবে গ্রাহ্যতা দিয়ে পৃথক অধ্যায় হিসাবে রাখার পিছনে স্বভাবতই বিশেষ কারণ আছে। আমি দেখতে চাইবো জনপ্রিয় এবং বহুল বিক্রিত কাহিনি সম্পর্কে যে মনোভাব সেটি নির্মাণের রাজনীতি এবং সমালোচকদের (বিশেষত নিজেদের রাজনৈতিকভাবে সচেতন বলে যারা দাবি করেন) আন্তর্সম্পর্কের সংগঠন (economy) কিভাবে কাজ করে। জনপ্রিয় আঙ্গিকের প্রতিরোধী ক্ষমতা বিচার করতে গিয়ে, বাণিজ্যিক ভাবে দারুণ সফল সাহিত্যকে সাংস্কৃতিকচর্চা (cultural studies) প্রায় সবসময়ই বিশ্লেষণের বাইরে রেখেছে, এমনকি তাকে সমালোচনাযোগ্য বলেও বিবেচনা করা হয়নি। কেবলমাত্র পাশ্চাত্যে নয়, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেও দেখা গেছে এই জাতীয় সাহিত্য সম্পর্কে তাচ্ছিল্যের মনোভাব। সাংস্কৃতিকচর্চা বা তাত্ত্বিক গবেষণায় এখনও বাংলা সাহিত্যের যথাযোগ্য বিশ্লেষণ তো হয়নি বটেই, জনপ্রিয় মহিলা সাহিত্যিকদের বেশিরভাগ রচনা সঠিকভাবে সংরক্ষিতও নয়। অধিকাংশ সময়েই দেখা যায় বহুল বিক্রিত এবং অতি-জনপ্রিয় সাহিত্যে কিছু নঞর্থক তকমা এঁটে দেওয়া হয় – ‘অশ্লীল’, ‘ভাবপ্রবণ’, ‘উত্তেজক’ ইত্যাদি। সেই কারণের এই জাতীয় সাহিত্যের পুনর্পাঠ জরুরি যাতে বিকল্প বা বিরোধী-পাঠের প্রস্তাবনা করা যায়। এই বিরোধী-পাঠের মধ্য

দিয়ে হয়ত কাল্পনিক, খামখেয়ালি, সুখপ্রদ, কার্নিভালেস্ক অতিরেকের মধ্যে বিধ্বংসী ক্ষমতাকে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এই ধরণের রচনায় নারীসুলভ এবং জনপ্রিয় মিলেমিশে তৈরি করতে পারে একটি যমজ-প্রতিপক্ষ যা বিরুদ্ধতা করে পিতৃতান্ত্রিক নিষেধ, নিয়ন্ত্রণ, সংবরণ এবং আইনের সামগ্রিক যুক্তিকে। সাধারণত দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী দুটি শিবির থেকেই জনপ্রিয় সাহিত্যকে কঠোর ভাবে সমালোচনা করা হয়। সাংস্কৃতিক ও নৈতিক মানদন্ডের অবক্ষয়ের অভিযোগ তোলেন রক্ষণশীলরা, অন্যদিকে বামপন্থীদের সমালোচনার কারণ এই জাতীয় সাহিত্যগুলি প্রতিক্রিয়াশীল কারণ সেগুলি প্রাধান্যকারী বুর্জোয়া মতাদর্শ দ্বারা চালিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিভিন্ন সময়ে স্বর্ণকুমারী দেবীর লেখা ও তার বহুল বিক্রি সম্পর্কে অবজ্ঞাসূচক মন্তব্য করেছিলেন। বহুক্ষেত্রেই দেখা যায় সাহিত্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে লিঙ্গের ভূমিকা চলে আসছে সামনে। বিশেষত সাংস্কৃতিক রুচির প্রশ্নে, শিল্পের মানদণ্ডে মহিলাদের লেখাকে মর্যাদাহানিকর হিসাবে দেখিয়ে গালাগালি করার প্রবণতা স্থান-কাল ভেদে চলেছে এবং আজও চলছে। রিটা ফেলস্কি মহিলা রচিত জনপ্রিয় কাহিনিগুলির চারটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন– পলায়নবাদী, কল্পনাশ্রয়ী, গীতিনাটক বা অতিনাটকীয় এবং ভাবালুতাপূর্ণ। এবং এই বৈশিষ্ট্যগুলির বিশেষণ করে দেখিয়েছেন কীভাবে এই আঙ্গিক প্রতিস্পর্ধী হয়ে উঠতে পারে। তার সঙ্গে সমস্যার দিক গুলিও তুলে ধরেছেন। আমি অন্তিম অধ্যায়ে রিটার এই প্রণালীবিদ্যার অনুসরণ করার পক্ষপাতী।

এছাড়াও আমার সন্দর্ভের সঙ্গে যুক্ত থাকবে ভূমিকা ও উপসংহার এবং একটি পরিভাষা তালিকা।

প্রথম অধ্যায়

'নবত্ব'-এর ধারণা ও লিঙ্গসম্পর্ক

What is youth? [...] and if youth is the time of inexperience, what is the connection between inexperience and a longing for the absolute? Or between the longing for the absolute and revolutionary fervor?'

Milan Kundera, postscript to *Life is Elsewhere*

ওরে ও তরুণ নিশান! বাজা তোর প্রলয়-বিষাণ
ধ্বংশ-নিশান উড়ুক প্রাচী-র প্রাচীর ভেদী![1]

তৎকালীন ও পরবর্তী সময়ের সাহিত্যিক উপস্থাপন, সাহিত্যের ইতিহাস এবং প্রথাগত ইতিহাসচর্চায় বারংবার নানাভাবে উনিশ শতকের বিশ-তিরিশের দশক দুটি নবত্বের, ভাঙনের আর পরিবর্তনের সূচনাবিন্দু হিসাবে উঠে এসেছে। নতুনের ধারণার সঙ্গেই ওতপ্রোতভাবে জড়িত পরিবর্তন-ছেদ-বিরতির ধারণা। 'নতুন' বা 'নব'-র ধারণাটির নির্মাণ প্রক্রিয়ার সঙ্গেই জুড়ে থাকে সেই অপর (এখানে পুরাতন), যাকে সে বদলাতে চায়, জয় করে প্রতিষ্ঠা করতে চায় নিজেকে। যেহেতু আমি এই 'নবত্বে'-র ধারণাটিকেই সমস্যায়িত (problematize) করতে চাই, খুঁজে দেখতে চাই ধারণাটিই লিঙ্গায়িত হতে পারে কিনা। সেই কারণে আমাদের আলোচ্য সময়সীমায় নবত্বের ধারণাটি কিভাবে আলোচনার বিষয় (discursive) হয়ে উঠল বা একটি বিশিষ্ট বর্গ (distinguishable Category) হিসাবে স্বীকৃতি পেল, তা আমরা বোঝার চেষ্টা করব।

---

[1] নজরুল ইসলাম, *ভাঙার গান*। দ্বিতীয় মুদ্রণ, (কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিমিটেড, শ্রাবণ, ১৯৪৯), পৃ. এক। গ্রন্থটির প্রকাশকের কথায় লেখা আছে: 'ভাঙার গান' প্রথম সংস্করণ বের হওয়ার পরেই ব্রিটিশ সরকারের রোষে পড়ে, ফলত দীর্ঘদিন তার প্রকাশ ও প্রচার বন্ধ ছিল।

স্বভাবতই নবত্বের কালিক (temporal) এবং ঐতিহাসিক বাস্তবতার (historicity)-র আলোচনাও গুরুত্ব পাবে। যেহেতু আমাদের বর্তমান আলোচনার ক্ষেত্র মূলত সাহিত্য বা সাহিত্যধর্মী উপস্থাপন, তাই মূল ঝোঁক থাকবে সেই দিকেই, পাশাপাশি অন্যান্য তথ্যসূত্রও সমগুরুত্বে আলোচিত হবে। আলোচ্য কালপর্ব এবং পরবর্তীকালের নানাবিধ রচনাকে অনুসরণ করে আমরা খুঁজে দেখতে চাইব এই নবত্বের বৈশিষ্ট্য কী, সমাজ-জীবনের কোন পরিস্থিতি মানুষকে নতুনভাবে ভাবতে বাধ্য করছে; বা বলা ভালো, নতুন হয়ে ওঠার, এবং বর্তমান (যা আসলে পুরাতন)-কে অস্বীকার বা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে নতুনকে আলিঙ্গন করার তাগিদ যোগাচ্ছে।

অধ্যায়ের শুরুতেই 'বিদ্রোহী' কবি নজরুল ইসলামের একটি কবিতার কয়েকটি পংক্তি উল্লিখিত হয়েছে। কবিতাটিতে কোন পুরাতনকে ধ্বংস করে নতুনের বিজয়কেতন ওড়াতে চেয়েছিলেন নজরুল? সন্দর্ভের নিরিখে 'বিদোহী' শব্দটি বিশেষ দ্যোতনা বহন করছে। কবিতাটিও বিশেষ তাৎপর্যবাহী। অসহযোগ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে এটি রচিত। ১৯২১ সালে কুমিল্লা থেকে কলকাতায় ফেরবার পথে তিনি রচনা করেছিলেন 'ভাঙার গান' কবিতাটি। এরপর কলকাতায় এসে থাকতে শুরু করেন মুজাফফর আহমেদের সঙ্গে ৩/৪ সি, তালতলা লেনের বাসাবাড়িতে। সেখানে ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে রচিত হয় আরও একটি বিখ্যাত কবিতা, 'বিদ্রোহী'। মুজফফর আহমেদ লিখছেন, 'নজরুল তার জীবনের শ্রেষ্ট সৃষ্টি আমাকেই প্রথম পড়ে শোনালো...'।[2] মজাফফর আহমেদের লেখা থেকেই জানা যায় লেখাটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 'বিজলী' পত্রিকায়, ১৯২২ সালের ৬ই জানুয়ারি, অর্থাৎ পৌষ মাসের ২২শে। তারপর

[2] আহমদ, মুজফফর, *কাজী নজরুল ইসলাম: স্মৃতিকথা*, (কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৩), পৃ. ১২২।

আবার ‘মোসলেম ভারত’ পত্রিকায় ছাপা হয় পরের বছর কার্তিক মাসে। অতঃপর বেশ কয়েকটি পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল কবিতাটি। সেই সপ্তাহের ‘বিজলী’ নাকি উনত্রিশ হাজার ছাপা হয়েছিল, ফলত প্রায় দেড়-দু’লক্ষ লোকের হাতে তা পৌঁছায়।[3] এর আগে পর্যন্ত নজরুলের কবিখ্যাতি ছিল স্বল্প মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু ‘বিদ্রোহী’ আপামর সমাজে ছড়িয়ে পড়ল, ঝড় তুলল।[4] নামকরণ থেকেই স্রষ্টার মনোভাবটি পরিষ্কার। কবিতাটি নিয়ে বিশদে আলোচনা করার প্রয়োজন আছে। পরিবর্তনের সময়কাল সূচনার প্রতীক হিসাবে আমরা এই কবিতাটিকে গ্রাহ্য করতে পারি। সমগ্র রচনা জুড়ে যে সমস্ত যন্ত্রণা, আকাঙ্ক্ষা, উন্মাদনা, অভিপ্রায়ের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করেছেন কবি, তা শুধুমাত্র স্থান-কাল-পাত্রের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে না। একটি অস্তত্ববাদী বর্গ হিসাব উঠে আসছে তাঁর যন্ত্রণাবোধ এবং তাকে পেরোতে চাওয়ার দুর্দমনীয় বাসনা; সেই কারনেই তা স্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছিল তৎকালীন বাঙালিকে (অবশ্যই অথাকথিত ভাবে শিক্ষিত বাঙালিকে)। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের *কল্লোল যুগ* এবং মণীশ ঘটকের *মান্ধাতার বাবার আমল* নামক স্মৃতিকথায় ‘বিদ্রোহী-কবি’ সম্পর্কে তৎকালীন তরুণ লেখকদের উচ্ছ্বাসের কথা ফুটে উঠেছে। প্রথমবার কল্লোলের আড্ডায় গিয়ে নিজের অভিজ্ঞতা বলেছেন মণীশ ঘটক, ‘আশাতিরিক্ত ভিক্ষা পেলে ভিখিরীর যা দশা হয়, আমারো তথা হাল। ডাকসাইটে নজরুল, প্রখ্যাত শৈলদা – তাদের সঙ্গে আমি এক আসরে! “বল বীর, বল উন্নত মম শির” মনে পড়ল,...’[5]। আবার অচিন্ত্যের বর্ণনায়, ‘...রাস্তার উপরে জনতা ভিড় করে আছে আর ঘরের মধ্যে কে একজন তরুণ গাইছে

---

[3] তদেব, পৃ. ১২৩।

[4] ঋত্বিক মল্লিক, *নজরুলের ধূমকেতু: সম্পাদকীয় বিষয়সূচি ও অন্যান্য*, (কলকাতা: পত্রলেখা, ২০১৯), পৃ. ১২।

[5] মণীশ ঘটক, যুবনাশ্ব ছদ্মনামে লিখিত, *মান্ধাতার বাবার আমল*, (কলকাতা: প্রকাশক অনুল্লিখিত, রচনাকাল ১৯৭৮, প্রকাশ
সাল নেই), পৃ. ১১।

তারস্বরে। সন্দেহ কি, শুধু 'বিদ্রোহী'র কবি নয়, কবি বিদ্রোহী। তার কণ্ঠস্বরে প্রাণবন্ত প্রবল পৌরুষ, হৃদয়স্পন্দী আনন্দের উত্তালতা। গ্রীষ্মের রুক্ষ আকাশে যেন মনোহর ঝড় হঠাৎ ছুটি পেয়েছে। কর্কশের মাঝে মধুরের অবতারণা।'[6] 'বিদ্রোহী'-র কবি আর 'বিদ্রোহী-কবি'-র সত্তা মিলেমিশে একাকার হয়ে যেতে শুরু করেছিল জনমানসে। রবীন্দ্রনাথও তাঁর সদ্য লিখিত *বসন্ত* গীতিনাট্য নজরুল ইসলামকে কেবলমাত্র উৎসর্গই করেননি, নিজের নাম দস্তখত করে তাকে দুই কপি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। নজরুল তখন জেলে, রাজদ্রোহের অপরাধে, ১৯২২ সালের 'ধূমকেতূ' পত্রিকায় সম্পাদকীয় হিসাবে 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতাটি লেখার জন্য।[7] উৎসর্গীকৃত বইটি পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে বলতে বলেছিলেন, 'আর বলো, কবিতা লেখা যেন কোনও কারণেই সে বন্ধ না করে। সৈনিক অনেক মিলবে, কিন্তু যুদ্ধে প্রেরণা যোগাবার কবিও চাই'।[8]

যুদ্ধ যে চলছিল তার ইশারা বিভিন্ন স্তরেই পাওয়া যায়। তাকে শুধুমাত্র প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত বা জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের মধ্যে ধারিত করা সম্ভব নয়। পরবর্তীকালের চর্চায় বিশ-তিরিশের দশকের সাহিত্য এবং সাহিত্যিকদের সম্পর্কে প্রায়শই একটা অভিযোগ ওঠে যে, সাহিত্যিকরা ছিলেন মূলত পাশ্চাত্যমুখী। বিদেশী বা বিশেষত ইংরাজি সাহিত্য তাদের দেখার ও লেখার দৃষ্টিকোণ পরিবর্তন ও গঠন করেছিল। কিন্তু এই ব্যাখ্যা অতিসরলীকরণ বলে আমার মনে হয়।[9] শিক্ষিত, শহুরে

---

[6] অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, *কল্লোল যুগ*, (কলকাতা: এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা: লি:, আশ্বিন, ১৪২১), পৃ. ২৬।

[7] ঋত্বিক মল্লিকের *নজরুলের ধূমকেতু: সম্পাদকীয় বিষয়সূচি ও অন্যান্য* গ্রন্থটি থেকে জানা যায়, এই কবিতাটি নজরুল আনন্দবাজার পত্রিকার জন্য লিখেছিলেন। কিন্তু তারা প্রকাশ করতে রাজি হয়নি।

[8] ঋত্বিক মল্লিক, *নজরুলের ধূমকেতু: সম্পাদকীয় বিষয়সূচি ও অন্যান্য*, (কলকাতা: পত্রলেখা, ২০১৯), পৃ. ২৭।

[9] সন্দর্ভের পরবর্তী অংশে আমি যুক্তি সহকারে উক্ত দাবির ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করব।

বাঙালির মননের স্তরে চলছিল নানা ধরণের সংঘাত। প্রতিটি সংঘাতকে আলাদা ভাবে সবসময় হয়ত চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। কখনও সমান্তরাল, কখনও সমাপতিত, কখনও বা স্ব-বিরোধী নানা সংঘাতে বিব্রত ছিলেন তারা। সাহিত্যে, বা সাহিত্যিকদের চিঠিপত্র, স্মৃতিকথায় তা মধ্যে মধ্যে উঠে আসে। পরাধীনতার গ্লানি কখনও তীব্রতায়, কখনও বা চোরাস্রোতে প্রবহমাণ ছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানসে। তার সঙ্গে পাশ্চাত্যশিক্ষা এবং বিশেষত বিদেশী সাহিত্য পাঠ বাঙালি শিক্ষিত বুদ্ধিবৃত্তিকে নতুনভাবে ভাবতে বাধ্য করেছিল। আধুনিকতা এবং আধুনিকতাবাদের দ্বন্দ্বের প্রশ্নটিও বিশেষ তাৎপর্যবাহী।[10] বহির্বিশ্বের বৌদ্ধিক সম্পদকে আত্মস্থ করার পাশাপাশি নিজের দেশ, দেশীয় ঐতিহ্য ও জ্ঞানভান্ডারকে খতিয়ে দেখা এবং দেশী-বিদেশী ধারার তুলনামূলক আলোচনার মধ্য দিয়ে নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে বোঝাপড়া করার প্রয়াস দেখা দিচ্ছিল। বলাবাহুল্য এই বোঝাপড়া একমাত্রিক, সরলরৈখিক বা একমুখী নয়। তরুণ সাহিত্যিকদের মধ্যেও নানাবিধ প্রচেষ্টা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছিল নিজের আকাঙ্ক্ষা-হতাশা-আশা-বিরোধ-যন্ত্রণার বহিঃপ্রকাশ করার তাগিদে। বহিঃপ্রকাশের আঙ্গিক নিয়েও তারা সন্তুষ্ট থাকতে পারছিলেন না। ভাঙাগড়া চলছিল অবিরত। কারোর ঝোঁক বেশী পাশ্চাত্যাভিমুখী, কারোর দেশজ ঐতিহ্যে, বা এই দুইয়ের বাইরে মিলন-আত্তীকরণের স্বতন্ত্র প্রক্রিয়াও সচল ছিল। বাঙালি স্বাজাত্যবোধের প্রকাশ নানা আঙ্গিকেই ধরা দিচ্ছিল: অনুসন্ধিৎসা, পাঠাভ্যাসে বদল, ইতিহাসচর্চা, অর্থনীতি, নৃতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব; সাম্যবাদ, মনঃসমীক্ষণের মতো নতুন ধারায়। বাংলা ১৩২১ সনের বৈশাখ মাসে ‘সবুজপত্র’ পত্রিকার প্রকাশ ঘটে। সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী পত্রিকার মুখবন্ধ শুরু করেছেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের উপদেশ উল্লেখ করে – ‘একটা নতুন কিছু করো’। দেশ বিদেশ দুই দিক থেকেই

[10] পরের অধ্যায়ে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা থাকবে।

নবজীবনের নবশিক্ষা গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন প্রমথ চৌধুরী। তাঁর মতে, 'ভাবের বীজ যে দেশ থেকেই আনো-না কেন, দেশের মাটিতে তার চাষ করতে হবে। চীনের টবে তোলামাটিতে সে বীজ বপন করা পন্ডশ্রম মাত্র'।[11] 'দেশের অতীত ও বিদেশের বর্তমান, এই দুটি প্রাণশক্তির বিরোধ নয়, মিলনের উপর আমাদের সাহিত্যের ও সমাজের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।[12] এই নবজীবন যে লেখায় প্রতিফলিত হয় সেই লেখাকেই সাহিত্য হিসাবে বিবেচনা করেছেন তিনি। 'একটা নতুন কিছু করার জন্য নয়, বাঙালির জীবনে যে নূতনত্ব এসে পড়েছে তাই পরিষ্কার করে প্রকাশ' করাই তাঁদের উদ্দেশ্য। বাদবাকি বাজে লেখা বহির্ভূত করার উদ্দেশ্যেই নতুন একটি প্রত্রিকা প্রকাশ করতে চেয়েছেন। স্থানাভাবে 'স্ত্রীপাঠ্য শিশুপাঠ্য স্কুলপাঠ্য এবং অপাঠ্য প্রবন্ধসকল' তাঁরা চেয়েছেন বর্জন করতে।[13] তরুণ সাহিত্যিকদের মধ্যে সব থেকে পরীক্ষাপ্রবণ ছিলেন কল্লোলগোষ্ঠী। ফলত তাদের কেন্দ্র করে বিতর্ক আজ অবধি চলে আসছে। সৃষ্টিশীলতার সঙ্গে ভাঙাগড়ার সম্পর্ক অহর্নীশ। যেকোনো উত্তাল সময়ে সেই সম্পর্ক আরও জটিল হয়ে উঠবে, সেটাই স্বাভাবিক। সাহিত্যাসরে এই বহুমুখী প্রচেষ্টার ফলে হয়ত কখনও কখনও কোলাহল সৃষ্টি হয়েছে।[14] কিন্তু কল্লোলগোষ্ঠীও নতুনত্বের দাবিতে মূল-বিচ্ছিন্ন হয়েছিল বলে মনে হয় না। পাশ্চাত্য সাহিত্য ও তত্ত্ব পাঠের প্রভাব নিশ্চিত ভাবেই ছিল। তার সঙ্গে ছিল নিজের দেশ ও তার অতীত বর্তমানকে বোঝার প্রচেষ্টা।

---

[11] প্রমথ চৌধুরী, *প্রবন্ধসংগ্রহ,* (বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ২০১০), পৃ. ৪৩।

[12] তদেব, পৃ. ৪৫।

[13] তদেব, পৃ. ৪৪-৫।

[14] ডঃ রবীন পালের গ্রন্থের নামই কল্লোলের কোলাহল ও অন্যান্য প্রবন্ধ। ভূদেব চৌধুরীর অভিধা: কল্লোল ও কলোচ্ছ্বাস। রবীন্দ্রনাথের *সহজপাঠ*-এর একটি পংক্তি উদ্ধৃত করে সুকুমার সেন কল্লোলগোষ্ঠী সম্পর্কীত পরিচ্ছেদের নাম দিয়েছেন "কল্লোলে কোলাহলে জাগে এক ধ্বনি"।

রজতকান্ত রায়, তাঁর *এক্সপ্লোরিং ইমোশানল হিস্ট্রি* গ্রন্থে দেখিয়েছেন উনবিংশ শতকের শেষ থেকেই বিভিন্ন লেখকদের রচনায় 'নব যুগ', 'নব ভাগ', নব্য বঙ্গ' ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে নতুন সময়ের চিত্রায়ণ শুরু হয়েছিল। নতুন সময় নিয়ে কথা বলতেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, কৈলাসবাসিনীদেবী, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ। কিন্তু রজতবাবুর মতে উনবিংশ শতকে একটি নতুন বৃত্ত তৈরী হলেও নতুন যুগ এসেছিল এমনটা বলা যায় না। কৈলাসবাসিনীদেবীর কথা অনুযায়ী তারা ছিল 'নব্য সম্প্রদায়ী'। কিন্তু বিশশতক থেকে সূচনা হল নতুন ভাবপ্রবাহের। রজত রায়ের কথায়, 'a new stream of consciousness'। অধ্যাপক রায় রামতনু লাহিড়ী ও শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রসঙ্গ তুলে তিনি দেখিয়েছেন যে, তাঁরা ১৯০৩ সাল নাগাদও 'রেনেস্যাঁস' শব্দটি ব্যবহার করেননি। এবং তখনও বুদ্ধি বিভাষার ক্ষেত্রে ইতালি বা ইউরোপের সঙ্গে তুলনা করে কোনো সমান্তরাল আলোচনার প্রবণতা ছিল না।[15] স্যর রোপার লেথব্রিজ[16] শিবনাথ শাস্ত্রীর *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ* বইটির অনুবাদ করেছিলেন এবং সেটির নাম দিয়েছিলেন, *Ramtanu Lahiri, Brahman and Reformer: A History of Renaissance in Bengal*। স্যর রোপার রামতনু লাহিড়ীর সময়কালকে 'রেনেস্যাঁস'-এর সঙ্গে *সমলয়-সম্পন্ন* (synchronous) বলে উল্লেখ করেছেন। রজতকান্ত রায় মনে করেন এর পর থেকেই এই নতুন যুগ 'বাংলার রেনেস্যাঁস' বলে চিহ্নিত হতে শুরু করল বাংলা বা বাঙালির ঘটনাক্রম বলে উল্লেখ করার পরিবর্তে। তারপরই ১৯২০-৩০-এর গান্ধি আন্দোলনের অভিঘাতে যে ঘটনাপ্রবাহের জন্ম হল তা

---

[15] Rajat Kanta Ray, *Exploring Emotional History: Gender, Mentality and Literature in the Indian Awakening*, (New Delhi: Oxford University Press, 2003), 30.

[16] স্যর রোপার লেথব্রিজ ছিলেন ব্রিটিশ পন্ডিত এবং আধিকারিক। তিনি বাংলার শিক্ষা দপ্তর, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং এশিয়াটিক স্যোসাইটি অফ বেঙ্গলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

সেই মুহূর্তে ভারতে এবং বহির্বিশ্বে 'Indian Awakening' বলে পরিচিত হল। ফলে বাংলার বিষয়টিকে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রয়োগের একটা সুযোগ তৈরি হল। ১৯১৮ সাল থেকে অরবিন্দের বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল যেখানে 'Renaissance in India' শিরোনামটি ব্যবহৃত হয়েছিল। সব্যসাচী ভট্টাচার্য প্রায় একই সময়ে নতুন বৈশিষ্ট্য হিসাবে বাঙালি প্রাদেশিকতার কথা উল্লেখ করেছেন। অধ্যাপক রায়ের ভাষায়, '"Renaissance" appeared repeatedly in discourse upon the phenomenon which was the sense of novelty'। এবং বিশশতকের শুরু থেকেই 'রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদানকারী নারী পুরুষ সকলের মধ্যেই এই সচেতনতা কাজ করত যে তাঁরা এক ভিন্ন ধরণের সৃষ্টিশীল কার্যকলাপে যোগদান করছেন'[17]। কেবলমাত্র রাজনৈতিক পরিসরে নয়, মনন ও বৌদ্ধিক চর্চার ক্ষেত্রেও অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে এই সচেতনতা বা বোধ কাজ করেছিল। আর সেই সূত্র ধরেই হয়ত এই ধারণাটি গ্রন্থিবদ্ধ হয়েছিল যে, অব্যবহিত পূর্ববর্তী সময় ছিল সাংস্কৃতিক দিক থেকে নিষ্ফলা বা অবক্ষয়ী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কল্লোল যুগের প্রত্যেকেই আগের যুগের সীমাবদ্ধতা থেকে বেরতে চেয়েছেন, তৈরি করতে চেয়েছেন নতুন ভাষা। বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 'এতে সন্দেহ নেই যে ইংরেজ ওদের যে সাহিত্য আমাদের দেশে আনলে, তা আমাদের চিত্তবৃত্তিতে বিপ্লব ঘটিয়েছে। তবে এও সত্য যে বাংলাদেশে ক্ষেত্রও প্রস্তুত ছিল— আমাদের মনটাই সাহিত্যিক। য়ুরোপীয় কালচার ঠিক জায়গা পেয়েছিল আমাদের মধ্যে। সোনার ফসল ফলল ইংরেজ আসার দরুন নয়,

[17] Ray, 2003, 31.

আমরা ওদের সাহিত্য পেয়েছিলুম বলে। ইংরেজ না হয়ে ফরাসি যদি হত আজ আমরা সব মোঁপাসা হয়ে উঠতুম। আমরা ব্যাকুল ছিলুম, তাই পাওয়ামাত্র নিয়েছি।'[18]

'ভাঙার গান' এবং 'বিদ্রোহী' কবিতার প্রসঙ্গে আমরা ফিরে আসব সাহিত্যের ক্ষেত্রে নবত্বের ধারণাটিকে কাটাছেঁড়া করে বুঝে নেওয়ার তাগিদে। তার আগে তৎকালীন বাংলার আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা করা আলোচনার স্বার্থেই জরুরি। পরবর্তী অংশের আলোচনাকে আমরা সময়ের চালচিত্র হিসাবে বিবেচনা করতে পারি, যার প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে বোঝার চেষ্টা করব নবত্বের ধারণা ও রূপকল্পগুলিকে।

রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি: বহুস্বর বহুস্রোত, বিরোধ-সমন্বয়

মরা গাঙে বান এসেছে জয় মা বলে ভাসা তরী...
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বদেশ পর্যায়, ১৯০৫।

'যখনই চক্ষু উন্মীলন করিলাম তখনই দেখিলাম আমাদের জাতীয় জীবনের নূতন প্রভাতের অরুণিমা চারিদিকে হাসিতেছে'। '... আমরা এই নূতন হাওয়া, নূতন আলোর সঙ্গে সম্বন্ধ পাতাতে চাই'। ১৯৪২ সালের এক কথোপকথনে বিনয় সরকার বলছেন, কিছুদিন আগে জন্ম হলে হয়ত হতাশ বা ভগ্নোদ্যম হয়ে 'আগাপাছা' ভাবতেন বা দেশের লোকদের 'গাল' দিতে দিতে উন্নতিকে 'মেলাঙ্কলি ড্রীম' বিবেচনা করতে

---

[18] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "গ্রন্থ পরিচয়", বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে আলোচনার অনুলিপি, মে, ১৯৪১, *রবীন্দ্র রচনাবলী: খণ্ড ৭*, সুলভ সংস্করণ, (কলকাতা: বিশ্বভারতী, বৈশাখ, ১৪০৯), পৃ. ৭৫০।

পারতেন। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন নতুন ভাবে ভাববার জমি প্রস্তুত করেছিল।[19] বঙ্গভঙ্গ স্বদেশী পরবর্তী বাংলা তথা ভারতের চিত্রপটে ঘটনা বৈচিত্র কিছু কম ছিল না। রাজনৈতিক এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রভূত ঘটনাবলির মধ্যে আমি আমার গবেষণার জন্য প্রাসঙ্গিক কিছু ঘটনার উল্লেখ করবো, যা আমায় মূল আলোচনায় প্রবেশ করতে সাহায্য করবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই অংশে আমি কোনো ব্যাখ্যা নয়, বরং সহজলিভ্য (আধুনিক ইতিহাস সম্পর্কীত যেকোনো প্রামাণ্য গ্রন্থে প্রাপ্য) কয়েকটি ঘটনা-পরম্পরা তুলে ধরতে চাই। আমি শুরু করবো আমার গবেষনায় নির্দেশিত সময়সীমার কিছু বছর আগে থেকে, বলাবাহুল্য যার রেশ ছড়িয়ে থাকবে ১৯২০ পরবর্তী কালপর্বে। বিনয় সরকার 'বঙ্গ বিপ্লব' বলে একটি শব্দবন্ধ ব্যবহার করছেন। যার সময়সীমা তিনি নির্ধারণ করেছিলেন ১৯০৫-১৯১১। কিন্তু বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ধারাবাহিকতার কথা মাথায় রেখে তাকে ১৯৪২ অবধি টানছেন। ১৯০৫ থেকে ১৯০৬ এর মধ্যে 'বাঙালি জাতি' চারটি পারিভাষিক শব্দের প্রচলন করেছিল যার স্থানিক ও কালিক প্রভাব বহুদূর বিস্তৃত বলে ডঃ সরকার মনে করেন – বয়কট, স্বদেশী, স্বরাজ, জাতীয় শিক্ষা। 'সমস্ত পৃথিবীর সংস্কৃতি এই নয়া নয়া শব্দের সম্পদে নবীনীকৃত হচ্ছিল'।[20] তাঁর বিশিষ্ট বাচন ভঙ্গিমায় তিনি একথাও জানিয়েছেন যে, 'সফলতা-লাভের "ডোজ" বা মাত্রা আছে। ছোট হিসাবে ১৯১১ সনে মাত্র এক "ডোজ" সফলতা দেখছি। বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে বঙ্গ-বিপ্লবের "আসল" সফলতা যা কিছু তা ১৯২০-৪২ সনের মাল'। তবে এর পরেও

---

[19] হরিদাস মুখোপাধ্যায়, শিবচন্দ্র দত্ত, হেমেন্দ্রবিজয় সেন, ক্ষিতি মুখোপাধ্যায়, সুবোধকৃষ্ণ ঘোষাল এবং মন্মথনাথ সরকারের সঙ্গে বিনয় সরকারের কথোপকথন, *বিনয় সরকারের বৈঠকে: প্রথম ভাগ,* (কলকাতা: ছাতিম বুকস, ২০০০), পৃ. ২০১।

[20] হরিদাস মুখোপাধ্যায় এবং অন্যান্য, ২০০০, পৃ. ২০০।

মেয়াদ বাড়ানো যেতে পারে, কারণ তিনি মনে করেন, অন্যান্য জিনিসের মতন বিপ্লব, যুগান্তর ইত্যাদি 'চিজও' আপেক্ষিক।[21]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধর আগে থেকে এবং যুদ্ধকে কেন্দ্র করে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন এসেছিল। বা বলা যেতে পারে কিছু নতুন বৈশিষ্ট্য সংযোজিত হয়েছিল, যা সময়ের নিরিখে ছিল অভূতপূর্ব। বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল তুলনামূলকভাবে মুক্ত চিন্তার বিস্তার এবং আন্তর্জাতিকতার বোধ। ব্রিটেন ও ইওরোপের ভারতীয়রা খানিকটা বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী হিসাবেই কিছু প্রতিবাদ সংগঠিত করতে শুরু করেছিলেন। প্রসঙ্গত বলা যায়, ১৯১৩ সালের *গদর* আন্দোলনের কথা। ১৯১৪ নাগাদ ব্রিটিশ কলম্বিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশান্ত সাগরীয় উপকুলে প্রায় ১৫,০০০ ভারতীয়, যাদের মধ্যে অধিকাংশই শিখ, বসতি স্থাপন করেছিলেন। তাদের নানা ধরণের জাতিগত বৈষম্যের শিকার হতে হয়েছিল। যথারীতি ব্রিটিশ-ভারতীয় সরকার এর বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। এই আন্দোলনের খানিকদূর পর্যন্ত গণভিত্তি ছিল। অধ্যাপক সুমিত সরকারের মতে, এই সময়কালে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রবাসী ভারতীয়দের দুটি অবদানের প্রথমটি হল *গদর* আন্দোলন, অন্যটি দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধির *সত্যাগ্রহ*-র অভিজ্ঞতা। আরও আগে থেকেই প্রবাসীদের বিভিন্ন পত্রিকায় জাতীয়তাবাদের পাশাপাশি কিছুদূর পর্যন্ত আন্তর্জাতিকতার সুর ধ্বনিত হতে শুরু করেছিল। ১৯০৯ সালের *বন্দে মাতরম,* লন্ডন থেকে প্রকাশিত পত্রিকাটি থেকে উদ্ধৃত করেছেন অধ্যাপক সরকার, 'আয়ারল্যান্ডের ভাড়াটে কৃষক তাঁর নির্জন কুড়ে ঘরে, মিশরের কৃষক তাঁর ক্ষেতে, অন্ধকার খনির মধ্যে জুলু শ্রমিক... শুনতে পেয়েছেন

---

[21] তদেব, পৃ. ১৯৯।

ধিংড়ার পিস্তলের আওয়াজ'।[22] যুদ্ধ চলাকালীন ব্রিটিশ শাসকের কাছে প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীরা সত্যিকারের ত্রাসের কারণ হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের দেশে দেশে পরিক্রমার ফলে পূর্ববর্তী কিছু বৈশিষ্ট্য – তীব্র হিন্দু ধর্মভাব, অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ও জঙ্গি জাতীয়তাবাদের সীমাবদ্ধ মানসিকতাকে কিছুটা হলেও পরিবর্তন করেছিল। 'দেখা দিচ্ছিল আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের এক মানসচিত্র'।[23] প্রসঙ্গত উলেখ্য, লালা হরদয়াল 'দুনিয়ার শিল্প-শ্রমিক' নামে একটি নৈরাজ্যবাদী-সিন্ডিকালিস্ট সংগঠনের সানফ্রানসিসকো শাখার সম্পাদক ছিলেন। ১৯১২-র মার্চের *মর্ডান রিভিউ* (কলকাতা) পত্রিকায় তিনি মার্ক্স বিষয়ক একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সম্ভবত ভারতে মার্ক্স সম্পর্কীত এটিই আদি রচনা।[24] এই পর্বে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ঘটনার কথাও স্মরণে রাখতে হবে। ১৯১৭ সালের সোভিয়েত বিপ্লব। শিপ্রা সরকারের গবেষণার অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে সব্যসাচী ভট্টাচার্য জানাচ্ছেন যে, জাতীয়তাবাদী প্রেস ১৯২০-র দশকে মোটেই সাম্যবাদের প্রতি বিরোধী মনোভাবাপন্ন ছিল না।[25] বরং বাংলায় সমাজতান্ত্রিক চিন্তা ভাবনার নিজস্ব বিকাশ শুরু হয়েছিল। পার্টি বা দলভিত্তিক চেতনা হয়ত সংহত হয়ে ওঠেনি, কিন্তু বাংলা পত্র পত্রিকায় চর্চা হত নিয়মিত। মার্ক্সীয় তত্ত্ব বোঝার প্রতি আগ্রহ তৈরি হয়েছিল। 'সাম্যবাদী' নামক পত্রিকার উত্থানও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। ১৯২৪ সালে 'সাম্যবাদী' পত্রিকা ঘোষনা করেছিল যে ইসলামিয় চিন্তায় সমাজতান্ত্রিক সাম্যবাদের ধারণা অনেক আগে থেকেই জন্মগ্রহণ করেছিল। ১৯২৭-এ

---

22 সুমিত সরকার, আধুনিক ভারত, চতুর্থ মুদ্রণ, (কলকাতা: কে. পি. বাগচি অ্যান্ড কোম্পানি, ২০১৩), পৃ. ১২২-২৩।

23 তদেব।

24 সুমিত সরকার, আধুনিক ভারত, কে. পি. বাগচি অ্যান্ড কোম্পানি, চতুর্থ মুদ্রণ, ২০১৩, পৃ. ১২৩-২৪।
যদিও শিপ্রা সরকার *বাঙালির সাম্যবাদ চর্চা* গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন, ১৮৭৬ সালে কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টোর একটা বাংলা অনুবাদ হয়েছিল। অনুবাদকের নাম অজ্ঞাত।

25 সব্যসাচী ভট্টাচার্য, *বাংলায় সন্ধিক্ষণ: ইতিহাসের ধারা, ১৯২০-১৯৫৭*, (কলকাতা, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১৮), পৃ. ১৮৫।

নজরুল ইসলাম সর্বপ্রথম 'International' গানটির বাংলা অনুবাদ করেছিলেন। দ্বিতীয়বার ভাষান্তর করেছিলেন সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯২৮ সালে। তারপর আবার বাংলায় অনূদিত হয় ১৯৪২-এ মোহিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে।[26] ১৯৩০-এ রবীন্দ্রনাথের সোভিয়েত ইউনিয়নে যাত্রা ও *রাশিয়ার চিঠি*-র প্রকাশ সাম্যবাদী সন্দর্ভকে নতুন ভাবে সমস্যায়িত করেছিল।[27] *বাঙালির সাম্যবাদ চর্চা*-র ভূমিকায় শিপ্রা সরকার লিখছেন, 'দেখা গেল, বিশের দশক থেকেই সাহিত্যিক, সাংবাদিক, রাজনৈতিক কর্মী, সাধারণভাবে চিন্তাশীল বাঙালি সমাজের এই সব বিষয়ে সহজাত কৌতূহল জন্মেছিল।'[28] বাংলায় সাম্যবাদ চর্চার ক্ষেত্রে বিনয় সরকার, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, অবনী মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, নলিনী গুপ্ত, শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মানবেন্দ্রনাথ রায়ের নাম করা অত্যন্ত জরুরি। এঁদের অনেকেই বিপ্লব পরর্বতী রাশিয়ায় গিয়েছিলেন। মানবেন্দ্র রায় এবং অবনী মুখার্জী *ইন্ডিয়া ইন ট্রানজিশন* (*পরিবর্তনের পথে ভারত*) নামক বইটি লিখেছিলেন ১৯২২ সালে বার্লিনে থাকার সময়। মুজফফর আহমেদ, সৌমেন ঠাকুর অন্যদিকে নজরুল 'লাঙল', 'গণবাণী' এবং 'ধূমকেতু' পত্রিকা প্রকাশ করতেন। ১৯২৩-২৫-এর মধ্যে বিনয় সরকার অনুবাদ করেছিলেন 'পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র' এবং 'ধনদৌলতের রূপান্তর', এছাড়াও আছে তাঁর অসংখ্য প্রবন্ধ। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পর্কে বিনয় সরকার সেই সময় মন্তব্য করছেন, 'বৃহত্তম ভারতের জাতীয়তা ও সমাজতন্ত্র, — দুই ধারাই ভূপেন দত্ত'র নিকট বেশ-কিছু ঋণী।'[29] 'প্রাক স্বাধীনতা যুগের বাংলার কম্যুনিজম বা সমাজতন্ত্র দল হিসাবে যতটা না, তার থেকে

---

26 শিপ্রা সরকার এবং অনমিত্র দাশ (সং.), *বাঙালির সাম্যবাদ চর্চা*, (কলকাতা: আনন্দ, ২০১৯), ভূমিকা নয়।

27 ভট্টাচার্য, ২০১৮, পৃ. ১৮৬।

28 শিপ্রা সরকার এবং অনমিত্র দাশ (সং.), ২০১৯, ভূমিকা এক।

29 হরিদাস মুখোপাধ্যায় এবং অন্যান্য, ২০০০, পৃ. ২৫৫।

বেশি প্রভাবশালী ছিল একটি মতাদর্শ (ideology) হিসাবে।[30] তবে সাম্যবাদী তত্ত্ব বা বিপ্লবের তত্ত্বের প্রতি আকর্ষণ, কৌতূহল অনেকদূর পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় চেতনারই প্রকাশ ছিল বলে মনে হয়।

যুদ্ধকে কেন্দ্র করে নানা রাজনৈতিক গোষ্ঠির প্রতিক্রিয়াও ছিল বৈচিত্রময়। এই সময় ভারত থেকে ব্রিটিশ সেনাদের অপসারণের ফলে (একটা সময় সেনার সংখ্যা হ্রাস পেয়ে হয়েছিল মাত্র ১৫,০০০) এবং ব্রিটেনের শত্রুপক্ষ জার্মান ও তুর্কিদের থেকে আর্থিক ও সামরিক সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরী হওয়ায়, যেসব বিপ্লবীরা পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্যে লড়ছিলেন তাঁদের একাংশের মনে 'সফল রাষ্ট্রাঘাত' (*ক্যু দে তা*) সম্ভবপর বলে মনে হয়েছিল। রাজনৈতিক হত্যা ও ডাকাতি এই সময়ে সর্ব্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছিল।[31] কোমাগাতা মারু-র ঘটনা (২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯১৪) বাংলা তথা কলকাতায় যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। রাসবিহারী বসু ও শচীন সান্যাল প্রবাস থেকে ফিরে আসা গদরপন্থীদের সহযোগিতায় সুদূরপ্রসারি এক পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু ১৯১৪-র পর ফিরে আসা পাঞ্জাবীদের একটি বড় অংশকে কারারুদ্ধ করে ব্রিটিশ সরকার।

আধুনিক গণতান্ত্রিক স্পৃহার জন্ম ও স্বায়ত্বশাসনাধিকারের দাবিগুলি সংগঠিত হয়ে ওঠাও এই সময়কার নিশ্চিত বৈশিষ্ট্যগুলির একটি। সুমিত সরকার দেখিয়েছেন কিভাবে যুদ্ধের বছরগুলিতে বিপ্লবীদের সাহায্য পাঠানোর কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল বার্লিন। ১৯১৫-য় বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, হরদয়াল আরও কয়েকজনের নেতৃত্বে *ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স কমিটি* গড়ে উঠেছিল। *ৎসিমারমান*

---

30 ভট্টাচার্য, ২০১৮, পৃ. ১৮৫।

31 বিশদে জানার জন্য দ্রষ্টব্য সরকার, ২০১৩, পৃ. ১২৫।

পরিকল্পনা অনুযায়ী যাদের সহযোগিতা করেছিল জার্মান বৈদেশিক দপ্তর।[32] ব্রিটিশরা এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করেছিল বেশকিছু চরম নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মধ্যে দিয়ে। সুমিত সরকারের মতে এই নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা-সমবায়টি ছিল ১৮৫৭-র পর তীব্রতম। মার্চ ১৯১৫-য় 'ভারত রক্ষা আইন' পাশ করানো হয়েছিল মূলত গদর আন্দোলন ও বাংলার সন্ত্রাসবাদীদের ধ্বংস করার জন্য। আবার অন্য দিকে তথাকথিত অবিপ্লবী রাজনীতিবিদদের কেউ কেউ ১৯১৮-য় গ্রামে গ্রামে ঘুরে ব্রিটিশদের জন্য টাকা ও লোক জোগারের চেষ্টা করেছিলেন – 'এই আশা নিয়ে যে, এ জাতীয় রাজভক্তির ফলে শাসকরা আরও বড় রাজনৈতিক সংস্কার মঞ্জুর করবে'।[33] ১৯১৪ থেকেই ত্বরান্বিত হয়েছিল থিওসফিক্যল চেতনার বিকাশ, এবং অ্যানি ব্যাসান্ত উঠে এসেছিলেন বিশিষ্ট নেতা হিসাবে। তাঁর কোনো ধরণের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লক্ষ্য ছিল না। বরং ভারত-ব্রিটিশ বন্ধুত্বের জন্য তিনি পর্যাপ্ত স্বশাসনের পক্ষে ছিলেন। বলা বাহুল্য সমাজে এই চিন্তার যথেষ্ট প্রভাব ছিল, যার ফলে সূত্রপাত ঘটেছিল হোমরুল আন্দোলনের। দেখাই যাচ্ছে বাংলা তথা ভারতের রাজনৈতিক চেতনা ও কর্মপদ্ধতি একমাত্রিক ছিল না। এই একই সময় বামপন্থায় বিশ্বাসী ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত কংগ্রেসকে তার 'বর্তমান বদ্ধ অবস্থা থেকে বার করার জন্য যে কোনো উপায় মেনে নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন'।[34] বলা যেতে পারে এই প্রথম স্পষ্ট ও জমাটিভাবে স্বশাসন, প্রতিনিধিত্ব-মূলক সরকার এবং ডমিনিয়ন অধিকারের দাবিগুলি মূর্ত হয়ে উঠতে থাকল। জাতীয়তাবাদ-আধুনিকতা সম্পর্কে নাগরিক জীবনে একটি চর্চার বাতাবরণ তৈরি হচ্ছিল। ভারতের সমাজ ও রাজনীতি ছিল জটিলতা ও স্ববিরোধে ভরপুর। সেখানে কোনো একটি স্বর খুঁজতে

---

[32] সরকার, ২০১৩, পৃ. ১২৬।

[33] সরকার, ২০১৩, পৃ. ১২৭।

[34] তদেব।

চাওয়াই আধিপত্যকামিতার নামান্তর। সুমিত সরকারকে উদ্ধৃত করে বলা যায়, 'যুদ্ধ ও ঠিক তার পরের বছরগুলোতে ভারতীয় জীবনে দেখা গিয়েছিল সত্যিই কিছু নাটকীয় পরিবর্তন'। এবং তাঁর মতে এই পরিবর্তনের তিনটি সর্বস্বীকৃত নির্ণায়কগুলি হল: সাংবিধানিক সংস্কার (২০ আগস্ট ১৯১৭-য় ভারত সচিব মন্টেগুর ঘোষনা ও তার পরে ১৯১৮-য় মন্টেগু-চেমসফোর্ড প্রতিবেদন ও ১৯১৯-র ভারত সরকার আইন), গণ-জাতীয়তাবাদে গান্ধির উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে গুণগত পরিবর্তন এবং ভারতের ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ দিক পরিবর্তন।[35] প্রকৃতপক্ষে উনিশ শতকের শেষভাগে ও বিশ শতকের গোড়া থেকেই সরকারকে ধীরে ধীরে প্রতিনিধিত্বমূলক স্বশাসনের নীতি চালু করতে হয়েছিল। ভারতীয়দের মধ্যে ক্রমশ সেই দাবি তীব্রতর হতে থাকে। ১৯১৯-র সংস্কারের আরেকটি সদর্থক দিক হল ভোটাধিকারের বিস্তৃতি। কেবলমাত্র শিক্ষিত শহুরে নেতৃত্বের পাশাপাশি তথাকথিত অশিক্ষিত, পাশ্চাত্য শিক্ষার বাইরে থাকা গ্রামীণ সমাজও ভোটাধিকারের আওতাভূক্ত হয়ে পড়ে, তার ফলে 'নেতৃবর্গের মধ্যে গ্রামীণ সমাজের গুরুত্ব স্বীকৃতি পায়।[36]

এর মাঝেই যুদ্ধের অভিঘাতে মানুষ নানা দিক থেকে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। যুদ্ধের ফলে মোহভঙ্গ ঘটেছিল শিক্ষিত তরুণদের। 'যারা এতদিন পাশ্চাত্যের চাকচিক্যে মোহাবিষ্ট হয়েছিল, হঠাৎই তারা পাশ্চাত্য সভ্যতার কুৎসিত রূপটা আবিষ্কার করে। ভারতবর্ষে তখন নৈতিক ও বাহ্যিক নৈরাশ্যের বাতাবরণ'। ফলত সমাজে প্রশস্ত হতে থাকে গণঅভ্যুত্থানের পথ।[37] যুদ্ধের পরের বছরগুলিতে ব্রিটিশ নিপীড়নের মূল লক্ষ্য

---

35 সরকার, ২০১৩, পৃ. ১৮০।

36 ভট্টাচার্য, ২০১৮, পৃ. ৮।

37 শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, *পলাশি থেকে পার্টিশান: আধুনিক ভারতের ইতিহাস*, অনুবাদ: কৃষ্ণেন্দু রায়। কলকাতা: ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, ২০১০, পৃ. ৩৪৩-৪৪।

ছিল কলকাতা ও পাঞ্জাব। যে কারণে এই অঞ্চলে জঙ্গী আন্দোলন সংগঠিত করাও দুরূহ হয়ে পড়েছিল। ফলত নতুন পথের সন্ধান করতে শুরু করেছিলেন সকলেই। বলাবাহুল্য বাংলাও এই পরিস্থিতির বাইরে ছিল না।

তৎকালীন সাহিত্যে বারংবার উঠে এসেছে এই হতাশার নানাবিধ ছবি। ১৯২৪/২৫ সাল নাগাদ প্রেমেন্দ্র মিত্র ঢাকা থেকে অচিন্ত্য সেনগুপ্তকে চিঠিতে লিখেছিলেন, 'মানুষের দিকে তাকিয়ে আজকাল কি দেখতে পাই জানিস? সেই আদিম পাশব ক্ষুধা—হিংসা, বিষ আর স্বার্থপরতা। চোখের বাতায়ন দিয়ে শুধু দেখতে পাই সুসভ্য মানুষের অন্তরে আদিম পশু ওৎ পেতে আছে।'[38] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য তেরোশ একত্রিশ সালে অচিন্ত্য, প্রেমেন সহ আরও দুই তরুণ 'আভ্যুদায়িক' নামে একটি সংঘ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সংঘের নামটি তরুণ সাহিত্যিক মননের একটি প্রতিচ্ছবি। এই হতাশাবোধের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল অর্থনৈতিক মন্দা ও বেকারত্ব। জাতীয় ঋণের পরিমাণ বিরাট আকার ধারণ করে। যাবতীয় করের বোঝা শেষ পর্যন্ত চাপিয়ে দেওয়া হয় সাধারণ মানুষের ঘাড়ে। ১৯১১ থেকে ১৯২১-র মধ্যে শ্রমিক শ্রেণির বিপুল বিস্তার ঘটেছিল। কিন্তু 'অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কোপ' গিয়ে পড়ে তাদের ওপরে। প্রাপ্য প্রকৃত মজুরিও কমতে থাকে।[39]

১৯১৯ থেকে গান্ধির নেতৃত্বে সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদ কিছুদূর পর্যন্ত সমাজের গভীরে অর্থাৎ নিচু তলাতেও কম-বেশি সফলতা পেয়েছিল। তবে স্থানভেদে তার চরিত্রও ছিল বহুবিধ। তবে রবীন্দ্র কুমারের গবেষণার নিরিখে এইটুকু বলাই যায় সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এই প্রথম রাজনৈতিক বৃত্ত অভিজাত মহল থেকে জনসাধারণের

---

38 অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, *কল্লোল যুগ*, (কলকাতা: এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা: লি:, আশ্বিন, ১৪২১), পৃ. ১৩।

39 বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০১০, পৃ. ৩৪৩।

মধ্যে প্রসারিত হয়েছিল। এই প্রজ্জ্বলনের পিছনে বেশ কিছু কারণের সম্মিলন ঘটেছিল নিঃসন্দেহে। গান্ধির আবেদন অনেক ক্ষেত্রেই মানুষের বিবেককে স্পর্শ করেছিল। সেই আবেদন কতদূর স্থায়ী বা গভীর হয়েছিল সেটি সম্পূর্ণ আলাদা বিতর্ক। আপাতত গুরুত্বপূর্ণ এটাই যে রাজনীতির পন্থা ও দিশায় নতুনত্ব এসেছিল। শেখর বন্দোপাধ্যায়ের মতে, গান্ধি ছিলেন নবাগত তাই পূর্ববর্তীদের রাজনৈতিক হতাশার শিকার তিনি হননি। তাছাড়া ভারতের বহুত্ববাদী প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল স্পষ্ট। 'নৈতিক দৈন্যতার ও বাহ্যিক নৈরাশ্যের যুগে গান্ধি আত্মশক্তিতে ভরপুর অভিনব এক রাজনৈতিক কর্মসূচীর প্রতিশ্রুতি দেন'।[40] আশিস নন্দী তাঁর, *দি ইললেজিটিমেসি অফ ন্যাশ্যেনালিজম: রবীন্দ্রনাথ টেগর অ্যান্ড দ্য পলিটিক্স অফ সেলফ* প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে, গান্ধি তাঁর পূর্বসূরী রবীন্দ্রনাথের মতোই ছিলেন 'পাশ্চাত্য আধুনিকতার বিরোধী সমালোচক'।[41] পার্থ চ্যাটার্জী আবার গান্ধিকে দেখেছেন সমগ্র বুর্জোয়া সমাজের মৌলিক সমালোচক হিসাবে।[42] অন্যদিকে জুডিথ ব্রাউন মনে করেন গান্ধি "জনগণের কাছে আধুনিক রাজনীতির উদ্বোধনের প্রতীক ছিলেন না"; বরং তাঁর উত্থানের তাৎপর্য হল এদেশের পিছিয়ে পড়া অঞ্চলের পাশ্চাত্য ও দেশীয় শিক্ষিত উচ্চকোটির লোকেদের উত্থান, প্রেসিডেন্সি শহরের পাশ্চাত্য শিক্ষিত নেতাদের জায়গায়'।[43] সুতরাং এ কথা বলাই যায় যে, হতাশাচ্ছন্ন বাঙালি তথা ভারতবাসীর কাছে তাঁর আবেদন তৈরির একটি বাস্তবতা ছিল।

---

40 বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০১০, পৃ. ৩৪১-৪২।

41 Ashis Nandy, "The Illegitimacy of Nationalism: Rabindranath Tagore and the Politics of Self", in *The Bonfire of Creeds: The Essential Ashis Nandy*, (New Delhi: OUP, 2012, 2-4.

42 Partha Chatterjee, Bengal 1929-47: The land Question, (Kolkata: K. P. Bagchi), 162.

43 জুডিথ ব্রাউন, *গান্ধি'স রাইজ টু পাওয়ার: ইন্ডিয়ান পলিটিক্স, ১৯১৫-১৯২২*, উদ্ধৃত শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০১০, পৃ. ৩৪৮।

বাংলার জনমানসে গান্ধির উত্থানের প্রভাব সম্পর্কে কিছু কথার উল্লেখ করে আমি প্রসঙ্গান্তরে যাব। অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়গুলি রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। স্বভাবতই অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলিও আলোচনার দাবি রাখে কারণ তার সঙ্গে কলকাতা শহরটির পরিসর: সাংস্কৃতিক, বৌদ্ধিক, দৈনন্দিনতা, পরিবর্তিত হয়েছিল। শহর কোনো একটি স্থিরীকৃত ভৌগোলিক পরিসর মাত্র নয়, কায়িক উপস্থিতির সঙ্গে থাকে তার অন্য এক সত্তা। ফলত গান্ধির প্রসঙ্গ ছাড়া কলকাতার মনোজগতকেও পুরোপুরি অনুধাবন করা যাবে না।

১৯১৯-র ৬ই ফেব্রুয়ারি থেকে ১৮ই মার্চের মধ্যে তথাকথিত 'রাওলাট' আইনটিকে, সমস্ত অ-সরকারি ভারতীয় সদস্যদের তুমুল বিরোধিতা সত্ত্বেও, অনুমোদন করিয়ে নেওয়া হয়েছিল। অধ্যাপক সরকার দেখিয়েছেন, ভারতের রাজনীতিবিদদের বড় অংশই রাওলাটের বিরোধিতা করলেও গান্ধিই প্রথম একটি বাস্তবসম্মত সর্বভারতীয় গণ-প্রতিবাদের পরামর্শ দিয়েছিলেন। এবং সত্যাগ্রহকে সংগঠিত করার জন্য তিন ধরণের রাজনৈতিক যোগসূত্রকে প্রাথমিক ভাবে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন – বিভিন্ন হোমরুল লীগ, কিছু ইসলামপন্থী গোষ্ঠী, সেই সঙ্গে তিনি নিজে ১৯১৯-র ২৪শে ফেব্রুয়ারী যে সত্যাগ্রহ সভাটি চালু করেছিলেন।[44] বেসান্ত থেকে তিলকের অনুগামীদের অনেকেই এই উদ্যোগে সাড়া দিয়েছিলেন নিজেদের নানা রাজনৈতিক জটিলতার কারণে। সীমাবদ্ধ ও দুর্বল সাংগঠনিক প্রস্তুতি সত্ত্বেও আন্দোলন চরম পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পর পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠে। ভারতের অন্যান্য অংশের প্রতিক্রিয়া নিয়ে এখানে আলোচনা অপ্রয়োজনীয়। বাংলার ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া ছিল আকর্ষনীয়। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা মাথায় রাখা দরকার,

---

[44] সরকার, ২০১৩, পৃ. ১৫৯-১৬০।

১৯১২-য় কলকাতা থেকে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়েছিল দিল্লিতে। এরপরে এখানে একধরণের রাজনৈতিক জাগরণ এবং প্রাদেশিক চেতনার উন্মেষ ঘটতে শুরু করেছিল এবং ক্রমশ তা সংহত আকার ধারণ করেছিল। গান্ধির সমর্থনে ও হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে কলকাতায় প্রথম হরতাল হয় ৬ই আর ১১ই এপ্রিল। ১১ই এপ্রিল নাখোদা মসজিদে হিন্দু-মুসলমানের যৌথ উদ্যোগে সমাবেশ আয়োজিত হয়েছিল। আর ১২ তারিখ পাঁচমেশালি জনগণের সঙ্গে হ্যারিসন রোডে ও চিৎপুর-বড়বাজার অঞ্চলে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সংঘর্ষ বাঁধে। ব্রিটিশরা মেশিনগান চালিয়ে চার জনকে হত্যা করেছিল।[45] সুমিত সরকার দেখিয়েছেন, 'কলকাতার বিক্ষোভের একটি তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল অ-বাঙালি হিন্দু মারোয়াড়ি ও মুসলমানদের মুখ্য ভূমিকা আর বাঙালি ছাত্রদের তুলনায় গুরুত্বহীনতা – স্বদেশী দিনগুলোর ঠিক উল্টো'।[46] এই ঘটনার কিছুদিন পরেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সেই বিখ্যাত চিঠির মাধ্যমে নাইট উপাধি ত্যাগ করেছিলেন। এই ঘটনার প্রত্যক্ষ ও জোরালো প্রভাব পড়েছিল বাংলার বৌদ্ধিক সমাজে। ১৯১৯ থেকে ১৯২৯-র গোড়া অবধি সারা ভারতেই ধর্মঘটের তরঙ্গ এসেছিল। কলকাতাও তাঁর বাইরে ছিল না। এমনকি ১৯২০-র দ্বিতীয়ার্ধে বাংলায় ধর্মঘটের সংখ্যা ছিল ১১০। সুমিত সরকার পরিসংখ্যান দিয়েছেন, বাংলা সরকারের একটি গোপন প্রতিবেদন থেকে: স্থায়ী 'শ্রমিক ইউনিয়ন ও অ্যাসোসিয়েশন'-র সংখ্যা ১৯২০-তে ছিল ৪০, ১৯২১-এ ৫৫ এবং ১৯২২-এ ৭৫। নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ইউনিয়নের সংখ্যা শ্রমিক সংগঠনের ক্ষেত্রে একটি নতুন যুগের সূচনা করেছিল।[47] পরবর্তী খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউও বাংলাকে স্পর্শ করেছিল। বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী ও

---

45 বিশদ তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য সরকার, ২০১৩, এবং বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০১০।

46 সরকার, ২০১৩, পৃ. ১৬৫।

47 তদেব, পৃ. ১৬৯।

শ্রেণিগুলি নানাভাবে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল। বাংলায় শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক বেশি কার্যকরী হয়েছিল বয়কট। ১৯২১-র এপ্রিল অবধি প্রতিমাসে প্রায় ২০ জন করে প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষক পদত্যাগ করেছিলেন, আর সরকারি বা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল ১১,১৫৭ জন। গোয়েন্দা কর্মচারী ব্যামফোর্ড-এর গোপনীয় *হিস্ট্রি অফ দ্য নন-কোঅপারেশন অ্যান্ড খিলাফৎ মুভমেন্ট* (১৯২৫)-এ সংগৃহীত সর্বভারতীয় পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, কলেজগুলিতে গরহাজিরের সংখ্যা ছিল যথেষ্ট।[48] শ্রমিকদের মধ্যেও স্বতস্ফূর্ত জাগরণ দেখা গিয়েছিল। বাংলার চটকলগুলি ধর্মঘটে সামিল হয়েছিল বিপুল পরিমাণে। কৃষিক্ষেত্রে প্রায় সর্বত্রই ছিল প্রভাব। তাছাড়া গান্ধির অগ্রাধিকারও ছিল কৃষি। তিনি কৃষক, কৃষি এবং গ্রামীণ স্বনির্ভরতার উপর জোর দিয়েছিলেন। কেবলমাত্র বাংলাতেই ৮৬৬টি সালিশি সভা গঠিত হয়েছিল। আমি বিস্তারিত তথ্য বা বিশ্লেষণে যাচ্ছি না। কিন্তু কিছু তথ্যের উল্লেখ প্রয়োজনীয় কারণ নাগরিক মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের কাছেও ক্রমশ তাঁদের থেকে দূরবর্তী সমাজের নিম্নতলার বা অপর অংশের মানুষজন প্রতীয়মান হয়ে উঠতে শুরু করেছিল; এবং বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও বাস্তবতা নতুন প্রভাব সংযোজন করেছিল।

যদিও সুমিত সরকার দেখিয়েছেন, 'গান্ধিপন্থার কয়েকটি দিক সম্পর্কে কলকাতার পরিশীলিত বুদ্ধিজীবীরা কখনওই বিশেষ উৎসাহ দেখাননি'। একটি বিখ্যাত বিতর্ক শুরু করেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কল অফ ট্রুথ' প্রবন্ধে (মডার্ন রিভিউ, অক্টোবর ১৯২১)। হতভাগ্য লক্ষ লক্ষ মানুষকে উজ্জীবিত করার জন্য তিনি গান্ধিকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন বটে, কিন্তু গান্ধির সংকীর্ণতা এবং চরকাভজনার চরম বিরোধিতাও

---

[48] তদেব, পৃ. ১৭৬।

করেছিলেন।[49] গান্ধিকে সে অর্থে অতিক্রম করে গিয়েছিলেন চিত্তরঞ্জন দাস এবং তাঁর তিন তরুণ সহযোগী – বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও সুভাষ বোস। তাঁরা একটি সুযোগ্য রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কৃষিনির্ভর পূর্ববঙ্গে আলোড়ন তৈরি হয়েছিল। কিন্তু কংগ্রেসের জমিদার, জোতদার, ধনী ও মধ্যকৃষক নির্ভর পার্টির ভিত্তি টালমাটাল হওয়ার আশঙ্কায় অনেক ক্ষেত্রেই অঞ্চলিক নেতারা কোনো সাহায্য পাননি। বলাবাহুল্য পূর্ববঙ্গের জমিদারদের প্রধান অংশই ছিল হিন্দু। যতীন্দ্রমোহনের নেতৃত্বে ব্যাপক হরতাল এবং রেলপথ ও স্টিমার পরিবহনকে বিপর্যস্ত করে দেওয়ার মতো দুটি ধর্মঘট গভীর সাড়া ফেলেছিল। কিন্তু কলকাতার মারোয়াড়ি ব্যবসাদার গোষ্ঠী এবং স্বয়ং গান্ধি এর বিরোধিতা করেছিলেন। অর্থাৎ বাংলায় বারবার গান্ধিপন্থী গণ্ডী ভেঙে বেরিয়ে আসার প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছিল। এই সবকিছুই ছিল শহরের আত্মীক ও বৌদ্ধিক পরিসর নির্মাণের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সুতরাং শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুসরণে বলা যায়, গান্ধিবাদী গণআন্দোলনের অন্তস্থলে ছিল স্বাধীনতা সম্পর্কে বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন স্তরের চেতনা। কংগ্রেস যদি এই আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে জাতীয়তাবাদী কোনো একটি বিশেষ কর্মসূচীকে তুলে ধরার চেষ্টাও করে থাকে, তার পাশাপাশি এ কথাও সত্য যে, আন্দোলনের মধ্যে থেকেই বারবার তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হয়েছে।[50] এবং সব্যসাচী ভট্টাচার্য মনে করেন ‘ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বাংলার বৈশিষ্ট্য ছিল অনবরত গান্ধিবাদী রাজনীতির বিকল্প পথের সন্ধান করা’। তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে, ‘গান্ধিবাদী কংগ্রেসি রাজনীতির সমান্তরালে বহমান বিকল্প

---

[49] সরকার, ২০১৩, পৃ. ১৮৬।

[50] বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০১০, পৃ. ৩৬৯।

রাজনীতি ছিল তিনটি – "স্বরাজ্যবাদী", বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী, এবং সমাজতন্ত্রী এবং বামপন্থী রাজনীতি'।[51]

আলোচ্যপর্বে চূড়ান্ত তাৎপর্যপূর্ণ দিক ছিল ভাষাগত দিক থেকে আঞ্চলিক ভাবাবেগের প্রকাশ। সব্যসাচী ভট্টাচার্য যাকে ভাষাগত প্রাদেশিকতার উত্থান বলে চিহ্নিত করেছেন। অন্যদিকে সুমিত সরকার দেখিয়েছেন যে, 'শিক্ষিত যুবকদের তুলনায় সুবিধা বঞ্চিত গোষ্ঠীগুলির শিকড় আরও অনেক গভীরে চারিয়েছিল, যেহেতু তার যোগ ছিল বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় শক্তিশালী সাহিত্য-সংস্কৃতিগত নানা ধারার উদ্ভবের সঙ্গে'।[52] বক্তব্যটি বহুমাত্রিক এবং ব্যাঞ্জনাময়। গবেষণার মূল অংশে আবার আমাদের এই সংক্রান্ত আলোচনায় ফিরে আসতে হবে। যদিও আমাদের বিষয় নির্দিষ্ট করা হয়েছে কলকাতা শহর কেন্দ্রিক নাগরিক-বৌদ্ধিক ভাষার পরিমন্ডলে। তবুও বিগত ও প্রান্তিক ভাষা ও ভাষাকাঠামো এবং সংস্কৃতির সঙ্গে অন্তরঙ্গ আদানপ্রদান ব্যতীত শহুরে আধুনিক ভাষাকে বোঝা বা তার রূপক অলংকারের সন্ধান করা অসম্ভব বলে আমার মনে হয়। সব্যসাচী ভট্টাচার্যের ভাষায়, 'এই সময়ে দুটি সমান্তরাল প্রতর্ক একই সঙ্গে বেশ দূরত্ব বজায় রেখে বিদ্যমান ছিল। উচ্চবর্গীয় সাংস্কৃতিক জগতের থেকে বহুদূরে নিম্নতর বর্গের ও ভিন্নতর প্রবণতা বিশিষ্ট সাহিত্য-সংস্কৃতির সহাবস্থান দেখা যায়'।[53] ১৯০৫-এ বাংলাই প্রথম আঞ্চলিক ভাবাবেগের স্পষ্টত প্রকাশ ঘটিয়েছিল। ১৯১৭ সালে ভবানিপুর বক্তৃতায় চিত্তরঞ্জন দাস একই অনুভূতি তুলে ধরতে চেয়েছিলেন, 'বাঙালি হিন্দু বা মুসলমান বা খ্রিস্টান হতে পারেন, কিন্তু তিনি বাঙালিই থেকে যান'।[54] এই বিষয়ে বিস্তারিত

---

51 ভট্টাচার্য, ২০১৮, পৃ. ভূমিকা xi।

52 সরকার, ২০১৩, পৃ. ১৩৮।

53 ভট্টাচার্য, ২০১৮, পৃ. ৩।

54 সরকার, ২০১৩, পৃ. ১৩৯।

আলোচনা পেশ করেছেন সব্যসাচী ভট্টাচার্য তাঁর *বাংলায় সন্ধিক্ষণ* গ্রন্থে। তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে, ১৯২০-র বাংলার ইতিহাস হল 'বাংলার সত্তা বা আত্মপরিচয়ের নবতম নির্মাণ প্রকল্প'-র কাহিনি'। ভারতীয় রাজনীতিতে বাঙালিদের ক্রমবর্ধমান প্রান্তিকতার আশঙ্কা বাংলার চিন্তকদের প্ররোচিত করেছিল আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক সত্তা নির্মাণের জন্য (১৯১২ সালের রাজধানীর স্থানান্তর এই ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক)। এছাড়াও রাজনীতির আঙিনাতেও বাঙালিয়ানা (যাকে শ্রী ভট্টাচার্য "vernacularization of politics" বলেছেন) ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল।[55]

সব্যসাচী ভট্টাচার্য তাঁর বিশিষ্ট বাগশৈলীতে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ শব্দবন্ধের ব্যবহার করেছেন – 'বাঙালি প্রতর্কের উদ্ভব'। 'প্রতর্ক' অর্থাৎ ডিসকোর্স – বাঙালি শিল্প-সাহিত্য, ব্যবহারিক ক্ষেত্র এমনকি রাজনৈতিক বক্তব্য ও বাচনের ক্ষেত্রেও বাংলা ভাষা লক্ষ্যনীয় বিশিষ্টতা অর্জন করতে শুরু করেছিল, যা অঙ্গাঙ্গী ভাবে যুক্ত ছিল বাঙালির নবতম আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মানুসন্ধানের সঙ্গে। বাঙালি ভাষাসত্তার উত্থানে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব উল্লেখ করা বাহুল্য। ১৯১৩-য় নোবেল পুরস্কার পাওয়ার ঘটনাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক। ১৯১৫ পরবর্তী সময়ে *সবুজপত্র* গোষ্ঠী সাহিত্য ক্ষেত্রে নতুন জোয়ার এনেছিল। উচ্চবর্গীয় সাহিত্যে কথ্যভাষার ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা। প্রমথ চৌধুরি ছিলেন অগ্রণী। এই প্রসঙ্গে অবশ্য স্বামী বিবেকানন্দের নাম উল্লেখ না করাটা অন্যায় হবে। বিবেকানন্দের অধিকাংশ রচনা শ্রুতিলিখন ও ভাষা ইংরাজি। কিন্তু উনিশ শতকের একেবারে শেষে (১৮৯৯) রচিত *পরিব্রাজক* এবং *প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য* গ্রন্থে তিনি কথ্যভাষা ব্যবহার করেছিলেন। সাহিত্য বিজ্ঞান সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলায় লেখালিখি শুরু হয়েছিল। ভাষাবিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, অর্থনীতি, জ্যোতির্বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান

---

[55] ভট্টাচার্য, ২০১৮, পৃ.২।

সকল দিকেই বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বাংলায় চর্চা শুরু করেছিলেন। নিজেকে জানার তাগিদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল নিজের চারপাশের একান্ত নিজস্ব এবং অপরাপর প্রকৃতি, জনজাতি, ভাষা ও সংস্কৃতিকে জানার তাগিদ। দেশপ্রেমের পাশাপাশি জাতীয়তার ধারণাও নতুন করে সংহত হতে শুরু করেছিল।

এই সময়ই বাংলার রাজনৈতিক মঞ্চে আবির্ভাব ঘটেছিল একজন নতুন নেতার – চিত্তরঞ্জন দাশ। কংগ্রেসি রাজনীতির নিয়ন্ত্রণ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর থেকে চিত্তরঞ্জন দাশের কাছে হস্তান্তরের ঘটনাটি বাংলার রাজনীতিতে বহু ব্যাঞ্জনাময়। প্রাচীনপন্থী সুরেন ব্যানার্জীর কঠোর সমালোচক ছিলেন উত্তরসূরি দাশ। পূর্বসূরিদের বহু পদক্ষেপ বাতিল করে তিনি যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ভিক্টোরীয় রীতি অনুসারে ইংরাজ অনুকরণ ('mimic Anglicism') বর্জন করে তিনি বাংলা ভাষায় রাজনৈতিক বক্তব্য রাখতে শুরু করেছিলেন। ১৯১৭ সালে সর্বপ্রথম কংগ্রেসের কোনো সভায় বাংলা ভাষায় বক্তব্য রাখা হয়। চিত্তরঞ্জনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল তিনি নগর-কেন্দ্রিক সক্রিয় রাজনৈতিক কার্যকলাপ এবং শহুরে এলিটদের বাইরে গ্রামীণ জনতাকে সম্বোধন করেছিলেন, গান্ধিপূর্ব রাজনীতিতে যা নিঃসন্দেহে ছিল অভূতপূর্ব।[56]

উপরোক্ত আলোচনায় আমি ১৯২০ পূর্ববর্তী সময়ের চালচিত্র উপস্থাপিত করলাম মূল গবেষণার প্রাককথন হিসাবে। আমাদের সন্দর্ভের বিষয় কলকাতা শহরের বৌদ্ধিক সমাজের মধ্যে থেকে উঠে আসা কথাসাহিত্য। হয়ত সরাসরি তার সঙ্গে সমাজের অন্যান্য অংশের সম্পর্ক নেই। কিন্তু আগেই উল্লেখ করেছি যে শহরের চেতনা ও মনন এবং তার সৃষ্টিশীলতাকে বোঝার জন্য কেবলমাত্র মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্তের নির্দিষ্ট গণ্ডির সীমায়িত পরিসরে ঘোরাফেরা করাই যথেষ্ট নয় বলে আমি মনে করি। সাহিত্যিকদের

[56] ভট্টাচার্য, ২০১৮, পৃ. ৪-১৯।

সঙ্গে এই সমস্ত সামাজিক বর্গের এবং ঘটনাবলীর মিথোষ্ক্রিয়া তাদের রচনায় প্রভাব ফেলে। আগেই উল্লেখ করেছি বাংলা সাহিত্যে তথাকথিত নিম্নবর্গের অনুপ্রবেশ বিশের দশক থেকেই শুরু হয়।

বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বিক্ষোভ ও কৃষক অসন্তোষও গতিবেগ অর্জন করেছিল এই পর্বে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে বহুমাত্রিকতার কৃষক সমাজের উন্মেষ ঘটেছিল। বহুমাত্রিক বলার কারণ, নানান ঔপনিবেশিক নীতির ফলস্রুতিতে আদিবাসী-কৃষক সমাজের মধ্যের চ্যুতি-রেখা (ফল্ট লাইন) গুলি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। খেতমজুর, কৃষি-শ্রমিক, মধ্য-কৃষক, ঠিকাদার ও ধনীকৃষকদের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত প্রকট হয়ে উঠতে থাকে। ভারতীয় জাতীয় রাজনীতিতে তার প্রভাব এবং সুদূরপ্রসারি পরিণাম আছে। বিদ্রোহ বা ক্ষোভের কারণ বা চরিত্র বিশ্লেষণ করা আমার এই মুহূর্তের উদ্দেশ্য নয়। যেহেতু আমার গবেষণার কালিক (টেম্পোর্যল) ও স্থানিক অবস্থান ১৯২০-৩০-এর কলকাতা ও তার বৌদ্ধিক সমাজ, তাই এই ভৌগোলিক স্থানিকতার ভেতরে-বাইরে কি কি ঘটনা ঘটছে তা প্রণিধানযোগ্য। এই প্রসঙ্গে সুমিত সরকারকে উদ্ধৃত করে আমি একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। মেবার ছিল সেসময় কৃষক আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। রাণাদের আধুনিক বংশধরেরা ছিল ব্রিটিশদের প্রতি চরম দাস-মনোভাবাপন্ন এবং স্বভাবতই তারা কৃষক সমাজের উপর চাপিয়ে দিত সামন্ততান্ত্রিক শোষণ। এই অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল কৃষক আন্দোলন, পরে গান্ধিপন্থীদের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে ১৯২০-র দশক পর্যন্ত তা অব্যাহত ছিল। প্রায় একই সময়ে চিতোরের মধ্যযুগীয় রাণাদের ক্ষাত্রধর্ম ও দেশপ্রেমমথিত বীরগাথার গুণমুগ্ধ কাহিনি উপন্যাস, গল্প, নাটক, কবিতায় তুলে ধরতে থাকেন বাংলার বুদ্ধিজীবীরা – রমেশচন্দ্র মজুমদার, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এমনকি রবীন্দ্রনাথ

ঠাকুরও। অধ্যাপক সরকারের ভাষায়, 'এ এক বিচিত্র সমাপতন'।[57] আমরা সকলেই জানি যে, গান্ধিপন্থী জাতীয়তাবাদের জন্ম দেওয়ার ক্ষেত্রে দুটি এলাকার কৃষক আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ও তীব্র অবদান ছিল – উত্তর পশ্চিম বিহারের চম্পারণ ও গুজরাতের খেড়া। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক সরকার দেখিয়েছেন, 'গ্রামীণ জনতার নিজেদের তরফ থেকে উর্দ্ধমুখী চাপ' ছিল।[58] আরও বলা যায়, কিছু বছর আগে ১৯১৪ নাগাদ ময়মনসিংহে হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে রায়তদের পক্ষ থেকে একটি দাবিপত্র পেশ করা হয়েছিল। যদিও এখানে ভাগচাষীদের দাবিদাওয়া উত্থাপিত হয়নি। তবুও এই সূত্রেই শুরু হয়েছিল প্রজা আন্দোলন, যা ১৯২০ ও ১৯৩০-এর বাংলার রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এখানে সক্রিয় ছিলেন বাংলার কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা – ফজলুল হক, আক্রাম খাঁ, আবুল কাসেম প্রমুখ।[59] এর মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছিল কৃষি ক্ষেত্রের অসন্তোষগুলি। সেই সঙ্গে পুষ্ট করেছিল মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদকেও।

মনে রাখতে হবে যে, এই পর্বেই নতুন মাত্রা পেয়ে উপরিতলে উঠে আসছে গোরক্ষা আন্দোলন এবং হিন্দি ভাষা প্রচারের উৎসাহ, যদিও বাংলায় তার প্রভাব প্রকট নয় উত্তরভারতীয় রাজ্যের মতো। উনিশ শতকের 'হিন্দু পুনরুত্থানের' প্রকটতা চেহারা পরিবর্তন করেছিল বটে কিন্তু বেশ কিছু বিষয়ে ধারাবাহিকতা থেকেই গিয়েছিল। উনবিংশ শতকের শেষের দিকে গোমাতা হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রতীক হয়ে ওঠে। হিন্দু ধর্ম তখনও সংগঠিত না থাকলেও, বিশ্বাস, প্রথা এবং দার্শনিক বিচারে বহু পার্থক্য থাকলেও, 'সমগ্র ভারতে হিন্দুদের সংগঠিত করার জন্য এর প্রতীকী মূল্য ছিল

---

57 সরকার, ২০১৩, পৃ. ১৩২।

58 সরকার, ২০১৩, পৃ. ১৩২।

59 তদেব, পৃ. ১৩৩।

অসীম'।[60] স্বভাবতই ক্রমশ মুসলমানবিরোধী ভাব প্রকট হয়ে উঠতে থাকে। ১৮৯৩-র উত্তর ভারতে দাঙ্গা একটি অন্যতম প্রভাবশালী ঘটনা। অবশ্য শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়েছেন যে, এই দাঙ্গার ফলে পাকাপাকি ভাবে সাম্প্রদায়িক বিভাজন ঘটেনি, হিন্দু-মুসলমান আবারও একসঙ্গে জমিদারদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। কিন্তু এই ফাটল আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল বিশ শতকের গোড়ার হিন্দি-উর্দু ভাষা বিবাদকে কেন্দ্র করে।[61] এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। অধ্যাপক সরকার জে এইচ ব্রুমফিল্ডের গবেষণার কথা তুলে ধরেছেন, যিনি অনুপুঙ্খ গবেষণা করেছিলেন ১৯১৮-র কলকাতা দাঙ্গা নিয়ে। বড়বাজারের মারোয়াড়ি ব্যবসাদারদের আক্রমণ করেছিলেন তাঁদের প্রতিবেশি দরিদ্র মুসলমানরা। আংশিকভাবে কিছু অবাঙালি মুসলমান ও পশ্চিমের উলেমাদের সর্ব-ইসলামি প্রচারেই তারা খেপে উঠেছিলেন। সুমিত সরকারের মতে, 'হিন্দু পুনরুত্থানবাদ ও সর্ব-ইসলামবাদ – এই দুই-ই নিচু শ্রেণির অসন্তোষের প্রকাশ, সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততা, ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী রাজনীতির মধ্যে দোলাচল করতে পারত'।[62] ১৯১৬-র লক্ষ্ণৌ চুক্তির মাধ্যমে হিন্দু-মুসলমানের সমস্যা সমাধানের একটি প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল। সাম্প্রদায়িকতা ও বিদজ্জনের সম্পর্ক নিয়ে একটি মনোজ্ঞ আলোচনার মধ্যে দিয়ে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন সব্যসাচী ভট্টাচার্য। হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক বিচারের মূল কেন্দ্রবিন্দুটা সব সময় থেকে গেছে রাজনীতি ও জনপরিসরের বিষয় হিসাবে। ফলত কখনই দুটি সম্প্রদায়ের মানুষের 'দৈনন্দিন জীবনের সামাজিক সম্বন্ধ, অথবা সম্বন্ধের অভাব' নিয়ে চিন্তিত হয়নি। ফলত শৈশবের স্মৃতি, পরবর্তী অভিজ্ঞতা, যেকোনো অচেতন প্রকাশে (ভাষা বা অপভাষা বা বক্রোক্তি-

---

60 পরিমল ঘোষ (সম্পা.), *আমাদের আধুনিকতার কয়েকটি দিক*, (কলকাতা, সেতু, ২০১২), পৃ. ৮।

61 ঘোষ (সম্পা.), ২০১২, পৃ. ৯।

62 সরকার, ২০১৩, পৃ. ১৩৪।

তে) প্রায়শই অপর ধর্ম সম্পর্কে হীনমনোভাব বা তাচ্ছিল্যের পরিচয় পাওয়া যেত। যেমন – মুসলমানদের সম্পর্কে নেড়ে, নমঃশূদ্র হল চাঁড়াল, নিচু জাতের বা আতরাফ মুসলমানদের সম্বোধনে 'তুই' ইত্যাদি। ছোঁয়াছুঁয়ি সংক্রান্ত বিষয়গুলি তো ছিলই। তাছাড়াও একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আকারে ভট্টাচার্য সামনে এনেছেন একটি রূপককে। বড়ো ভাইয়ের অধীনস্ত সুখী সংসার ভেঙ্গে যাচ্ছে উদ্দাম ছোটো ভাইয়ের দৌড়াত্মে। অনেক ঐতিহাসিক বর্ণনায় যেন হিন্দু কংগ্রেসী হল বড়ো ভাই আর মুসলিম লীগ করা ব্যক্তি ছোটো। এর পাশাপাশি সাম্প্রদায়িকতার কাহিনিতে সব সময়ই 'মুসলিম মন' বা মানসিকতাকে একমাত্রিক ভাবে সরলীকরণ করার প্রবণতা দেখা দেয়।[63] আর একথা অনস্বীকার্য যে, ভারতীয় রাষ্ট্রের চরিত্র প্রধানত হিন্দু। পরিবর্তনকালীন (transitional) সময়ে যখন রাষ্ট্রের নতুন রূপ কল্পনা করা শুরু হচ্ছে, তখন তার নাগরিক এবং 'নারী'-র রূপকল্পেরও নির্মাণ প্রক্রিয়াও জারি থাকছে। স্বভাবতই সেই প্রক্রিয়া চালিত হয়েছিল প্রধানত আধিপত্যকামী, হিন্দু-পিতৃতান্ত্রিক আদর্শেরই ছায়ায়। হিন্দুত্ব বিষয়টি এখন থেকে 'বাদ' (ism) বা মতাদর্শ হিসাবে উত্থানের মধ্যেই থেকে যাচ্ছে এক ধরণের নির্বাচন। যেকোন নির্বাচন প্রক্রিয়াই বর্জনের উপরে দাঁড়িয়েই নির্মিত হয়। ভাষা-জাতি-ধর্ম-রাষ্ট্রের নতুন সমীকরণ তৈরি হতে শুরু করেছিল এই সময়ই। আর এই বর্জনের মধ্যেই নিহিত আছে আধিপত্যকামীতার নানা রূপ, যা একাধারে লিঙ্গায়িতও বটে।

[63] ভট্টাচার্য, ২০১৮, পৃ. ৯৯-১০২।

সাহিত্যে নবত্বের বিভিন্নতা

বীরবলীয় শ্লেষাত্মক কৌতুকে বঙ্গ সাহিত্যের নবযুগের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেছেন প্রমথ চৌধুরী। প্রথম বৈশিষ্ট্য 'এই নবসাহিত্য রাজধর্ম ত্যাগ করে গণধর্ম অবলম্বন করেছে। অতীতে অন্য দেশের ন্যায় এ দেশের সাহিত্যজগৎ যখন দু-চারজন লোকের দখলে ছিল, যখন লেখা দূরে থাক পড়বার অধিকারও সকলের ছিল না, তখন সাহিত্যরাজ্যে রাজা সামন্ত প্রভৃতি বিরাজ করতেন'।[64] ছত্রাকের মতো অসংখ্য পত্রপত্রিকার উদ্ভবকে ঈষৎ কটাক্ষ করে প্রমথ চৌধুরী কথাগুলি বলেছেন। তিনিও নতুনের অনুগামী। কিন্তু তার নবত্বের ধারণার মধ্যে তিনি রাখতে চান না 'স্ত্রীপাঠ্য শিশুপাঠ্য স্কুলপাঠ্য এবং অপাঠ্য'-কে। অর্থাৎ তাঁর নিজস্ব নতুনের সংজ্ঞা আছে। অপ্রাপ্তবয়স্ক ও মনস্কদের জন্য 'সবুজপত্র নয়'। এই তালিকায় তিনি 'স্ত্রীলোক'-কেও অন্তর্ভূক্ত করেছেন। তিনি মনে করেন 'নবযুগের ধর্ম হচ্ছে, মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন করা, সমগ্র সমাজকে ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ করা; কাউকেও ছাড়া নয়, কাউকেও ছাড়তে দেওয়া নয়'।[65] কিন্তু এই মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনে বাদ পড়ে যাচ্ছে 'মেয়েমানুষ'। সৌভ্রাতৃত্ব বন্ধনে সে যোগ দিতে অপারগ। সুতরাং এখানে নতুনের উদযাপনে সে নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এযাবৎকাল পর্যন্ত মেয়েদের মাসিক পত্রিকাগুলির বিষয়বস্তু ছিল মূলত নব্য ভদ্রমহিলার আদবকায়দা শেখানো, মা ও সন্তানের সুস্থ্যতা-সুরক্ষা সংক্রান্ত বা সন্তানের প্রতিপালন এবং গৃহকর্ম বিষয়ক। বলাবাহুল্য, সময়ের নিরিখে এই জাতীয় লেখার গুরুত্ব অপরিসীম। তাছাড়া মনে রাখতে হবে, নব্য-আধুনিকবাদী নির্মাণ প্রকল্পের অংশ হিসাবেই ভদ্রমহিলা বর্গের জন্ম। উচ্চ, উচ্চ-মধ্যবিত্ত

---

[64] প্রমথ চৌধুরী, *প্রবন্ধসংগ্রহ,* (কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ২০১০), পৃ. ৩৪।

[65] তদেব, পৃ. ৩৪-৩৫।

বাড়ির সামাজিক মর্যাদা অনেকাংশেই নির্ভর করত নারীর শিক্ষা ও আদব-কায়দার রপ্ত করার উপরে। বিভিন্ন সাহিত্যে আমরা এই ভদ্রমহিলাদের দেখা পাই, যারা পিতা, স্বামী বা হবু স্বামীর যোগ্য হয়ে ওঠার জন্য প্রাণপাত করতেও রাজি। তাকে মানতে হয় অসংখ্য নিয়ম। সময়নির্দিষ্ট অনুশাসনে বাঁধা তার জীবন। সেই মেয়ের পক্ষে উচ্চারণ করা কঠিন: 'আমি অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল, আমি দ'লে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল!'[66] এই নারী শেখানো গান গাইতে পারে, পিয়ানো বাজাতে পারে, চাইলে রান্না করা বা পার্টিতে গিয়ে যাথাযথ শালীন ইংরাজিতে কথোপকথনেও তাকে টেক্কা দেওয়া মুশকিল। কিন্তু তার নিজস্ব মনন আছে এবং সেই জনীত সংকট আছে – একথা ভাবতে পারা সে যুগের একজন পুরুষের পক্ষে মুশকিল, স্বীকৃতি দেওয়া ত আরও পরের কথা। প্রমথ চৌধুরীকে আমি দোষারোপ করছি না, সময়ের বৈশিষ্ট্য হিসাবে আমি এই দিকটাকে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করতে চাইছি। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল সেই সময়ের বিখ্যাত লেখিকা আশালতা সিংহ সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্য, 'আমার বিশ্বাস উনি হচ্ছেন বাংলাদেশের একমাত্র মেয়ে— অন্ততঃ লেখায় যাঁদের পরিচয় পাই—যিনি বুদ্ধিতে পুরুষের সমকক্ষ। ওঁর লেখা পড়ে কখনো মনে হয়না মেয়ের লেখা পড়ছি।[67] ভারতী রায় এই উক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন, 'মেয়েদের লিখতে দেননি এতদিন তাই তারা বুদ্ধিতে পুরুষের সমকক্ষ অথবা পুরুষ-বুদ্ধি অতিক্রান্ত, এ বিচার কেমন করে করবেন?'[68] বলাবাহুল্য এই অভিযোগ কোনও বিশেষ পুরুষকে উদ্দিষ্ট করে নয়।

---

[66] নজরুল ইসলাম, *সঞ্চিতা,* (কলকাতা: ডি. এম. লাইব্রেরী, মাঘ, ১৩৭৯), পৃ. ২।

[67] "ভূমিকা", ভারতী রায়, আশালতা সিংহ, *সমী ও দীপ্তি*। (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং ও মানবী বিদ্যাচর্চা কেন্দ্র, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৩), পৃ. সংখ্যা নেই।

[68] তদেব।

পিতৃতান্ত্রিকতার এই আবহ আজ অবধি বিদ্যমান, সেখানে সহজেই অনুমেয় যে, নারীকে পড়া এবং লেখার জন্য কতদূর এবং কতগুলি স্তরে লড়াই দিতে হয়েছে।

বিপ্লব কি? এই প্রশ্নের উত্তরে সেই সময়ের বিখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক বিনয় সরকার বিপ্লবের কয়েকটি প্রধান লক্ষণ জানিয়েছেন, পরিবর্তনগুলো হওয়া দরকার একেবারে নতুন ঢঙের, পূর্ববর্তী অবস্থার সঙ্গে যথেষ্ট ফারাক থাকা চাই, পরিবর্তগুলো আকারে, পরিমাণে বেশ ভারী বা পুরু হওয়া প্রয়োজন। পরিবর্তনগুলো বহু সংখ্যক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাজের ফলে ঘটা চাই। এবং পরিবর্তনগুলো সোজা দৃষ্টিতে খানিকটা যেন আকস্মিক এইরকম ধারণাও হওয়া চাই।[69] আমি বিনয় সরকারের এই বক্তব্যের উল্লেখ করলাম এই কারণে যে, ১৯০৫ থেকে ১৯২০/৩০-এর কালপর্বে সমসময় সম্পর্কে এই জাতীয় ধারণা শিল্প ও রাজনীতির জগতে অনেকেই পোষণ করতেন। তবে পরিবর্তন নামক ধারণাটি বহুসংখ্যক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বা মধ্য দিয়ে সাধিত হয়েছিল কিনা সে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। আগেই উল্লেখ করেছি আমার বর্তমান গবেষণা সীমায়িত কলকাতা শহরের বৌদ্ধিক সমাজের মধ্যে। তাই সার্বিক কোনো পরিবর্তন সাধিত হোক বা না হোক, আমার বিবেচ্য কেবলমাত্র লেখক শিল্পীদের উপর তার প্রভাব এবং সেই প্রভাবের সাহিত্যে বহিঃপ্রকাশ। সাহিত্যের প্রাঙ্গনে কল্লোলগোষ্ঠী অনেকাংশেই ভাঙচুর চালাতে সক্ষম হয়েছিল। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্বযুদ্ধ পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সময়ের সাহিত্যের মধ্যে বেশ স্পষ্ট সীমারেখা টেনেছেন। রবীন্দ্র-শরৎ ছাড়াও নজরুল, যতীন্দ্রনাথ সেন ও মোহিতলাল মজুমদার সম্পর্কে তাঁর মত, ‘তাঁহারা নূতন ডোরে

---

[69] হরিদাস মুখোপাধ্যায়, শিবচন্দ্র দত্ত, হেমেন্দ্রবিজয় সেন, ক্ষিতি মুখোপাধ্যায়, সুবোধকৃষ্ণ ঘোষাল এবং মন্মথনাথ সরকারের সঙ্গে বিনয় সরকারের কথোপকথন, *বিনয় সরকারের বৈঠকে: প্রথম ভাগ,* (কলকাতা: ছাতিম বুকস, ২০০০), পৃ. ২০০।

পুরাতনকেই বাঁধিয়াছেন'[70]। এই পর্যন্ত সাহিত্যকে তিনি আধুনিক সাহিত্য হিসাবে আখ্যায়িত করে তার পরের বিশ্বযুদ্ধকালীন সাহিত্যকে 'অতি আধুনিক বাংলা সাহিত্য' বলে চিহ্নিত করেছেন এবং আধুনিক ও অতি-আধুনিক সাহিত্যে জীবনবোধের তারতম্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। আলোচনার শুরুতেই জানিয়েছেন অতি-আধুনিক যুগে বাংলার সাহিত্য সমাজ অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল।[71] স্মর্তব্য যে প্রমথ চৌধুরীও এই সময়ের সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেছেন অসংখ্য স্বল্পশক্তিধর সাহিত্যিকের জন্ম হবে। তবে দুজনের অবস্থানের মধ্যে পার্থক্য আছে অবশ্যই। মূলত অতিআধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে সমালোচনাত্মক মনোভাব পোষন করলেও, শ্রীকুমার স্বীকার করে নিয়েছেন যে, উক্ত সময়কালে কাব্য সাহিত্যের প্রেরণা ও পাঠকগোষ্ঠীর সঙ্গে তার মানস সম্পর্ক এমন একটি জটিল অনিশ্চয়তার আবৃত হয়ে ছিল যার ফলে কাব্যসাহিত্যের মূল প্রকৃতি এবং তার সামাজিক তাৎপর্য পুনর্বিবেচনারও হয়ে উঠেছিল জরুরি। অতিআধুনিক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য হিসাবে তিনি বলছেন, 'প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রায় সম্পূর্ণ উন্মূলন' এবং 'গল্প-উপন্যাসে জীবনের সাধারণ আদর্শ-প্রধান রূপের পরিবর্তে অতি সূক্ষ্ম, ভাবাবেশবর্জিত ও মনস্তত্ত্বপ্রধান বাস্তব পর্যবেক্ষণের প্রবর্তন' ঘটেছে। সর্বগ্রাসী সমাজচেতনা, জীবনের এক কটু-কষায় স্বাদ, ভেঙে পড়া আদর্শবাদের টুকরো টুকরো খণ্ড, চারিদিকের শূন্যতাবোধের মধ্যে অতি-আত্মসচেতন মনের আত্মরতি, বিশ্লেষণ কুশলতা ইত্যাদিকে তিনি অতি-আধুনিক বা নব-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। মহাযুদ্ধের ভয়াবহ বিপর্যয়, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক বিশৃঙ্খলতা, অনিশ্চয়তা যে শুধুমাত্র বাইরের ব্যাপার নয়, তা 'অন্তর অনুভূতির

---

[70] শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'আধুনিক ও অতি-আধুনিক সাহিত্যে জীবনবোধের তারতম্য', *সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে,* (কলকাতা: মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, বৈশাখ, ১৩৬৭), পৃ. ৩০৬।

[71] শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বৈশাখ, ১৩৬৭, পৃ. ২৯৬।

গভীরতায় পর্যন্ত অনুপ্রবেশ' করেছে এবং 'এই অভাবনীয় রূপান্তর আমাদের সাহিত্য জিজ্ঞাসা ও সাহিত্য-প্রত্যাশার মূল' ধরে নাড়িয়ে দিয়েছে বলেই তিনি মনে করেন।[72] তবুও তিনি শেষমেশ 'ঐতিহ্যের শিল্পশালা'-র উপরেই আস্থা রেখেছেন, 'ঐতিহ্য গৌরবে প্রবুদ্ধ' হওয়ার কথা বলেছেন।[73] অর্থাৎ সাহিত্যে নবত্বের ধারণাকে সমালোচনার মধ্য দিয়েই তিনি ধারনাটিকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। অন্যদিকে, করেকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখের মধ্য দিয়ে প্রমথ চৌধুরী নবযুগের সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের যথেষ্ট সমালোচনা করেছেন। নব্য লেখকদের প্রতি আবেদন করেছেন তারা যেন দেশি বা বিলাতি 'কোনোরূপ বুলির বশবর্তী না হয়ে' নিজেদের অন্তর্নিহিত শক্তির পরিচয় পাওয়ার চেষ্টা করেন।[74] আগেই উল্লেখ করা হয়েছে বিশের দশকের সাহিত্যিকদের বিরুদ্ধে বিদেশী সাহিত্য ও তত্ত্বের প্রতি অতিরিক্ত আকর্ষন ও তার দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। বিশেষত অবচেতন ও কামনা বাসনাকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য তরুণ সাহিত্যিকরা অত্যন্ত সমালোচিত হয়েছিলেন। শ্লীল-অশ্লীলতার প্রশ্নে সাহিত্য মহল ছিল দ্বিধা বিভক্ত। মণীশ ঘটক ওরফে যুবনাশ্বের জবানীতে সেই তর্যা সম্পর্কে ধারণা করা যাক:

যতীন্দমোহন সিংহ (ধ্রুবতারা, উড়িষ্যার চিত্র), দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচি (রবীন্দ্র অনুকারক কবি), শনিবারের চিঠির ধুরন্ধরেরা এই সময়ে গেল, বাংলা সাহিত্যের শুচিতা পবিত্রতা, সব গেল, রব তুলে বিষম প্রমাদ গুণলেন সাহিত্য স্বাস্থ্যরক্ষার প্রবন্ধ ফেঁদে এবং পাল্টা জবাব দিতে লাগলেন নরেশ সেনগুপ্ত প্রমুখ সাহিত্যিকরা। শ্লীল অশ্লীলের হাফ-আখড়াই তর্জা ও খেউড়ে কলকাতা রমরম করতে লাগল। কল্লোলী কালাপাহাড়ে

---

[72] তদেব, পৃ. ৩০৭।

[73] শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বৈশাখ, ১৩৬৭, পৃ. ৩১০।

[74] প্রমথ চৌধুরী, ২০১০, পৃ. ৪০।

বীণাপাণি বাগদেবীর পূত শুভ্র মূর্তি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে এবং তার জায়গায় স্থাপিত করেছে আফ্রোদিতের কামকলা সম্বৃদ্ধ নগ্নমূর্তি।... এর পরিসমাপ্তি এল জোড়াসাঁকো 'বিচিত্রা' ভবনে রবীন্দ্রনাথের মধ্যস্থতায় শ্লীল অশ্লীল বৈঠকে। অশ্লীলদের পক্ষ নিয়ে সেদিন প্রমথ চৌধুরী, অপূর্বচন্দ্র চন্দ, দীনেশ দাস এঁরা দু'চার কথা বলেছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ যে ফতোয়া দিয়ে পরিসমাপ্তি টানলেন তা কোনোরকমেই স্বাস্থ্যরক্ষার অনুকূল বলা চলে না। ...[75]

'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন ১৯২৭ সালে। 'সাহিত্যে নবত্ব' প্রবন্ধটি তার পরের রচনা। এই তর্জা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ দিলিপকুমার রায়কে চিঠিতে লিখছেন (অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪) '... এতে করে যে একটা আলোড়ন জাগিয়েছে তাতে ক্ষতি নাই। কেননা, পূর্বেই বলেছি, সাহিত্যলোকে চাঞ্চল্যটার খুব প্রয়োজন আছে। সিদ্ধান্তে পৌঁছানোটা খুব বেশি দরকারি নয়—দেখতেই পাচ্ছি, এক যুগের সিদ্ধান্ত আর-এক উলট-পালট হয়ে যায়, ...।'[76] অর্থাৎ বিনয় সরকারের প্রসঙ্গ আর একবার এনে বলা যায় সাহিত্যের ক্ষেত্রে কল্লোলের কোলাহল বেশ মোটা দাগের পরিবর্তন আনার ঘোষনা অন্তত করতে পেরেছিল।

প্রসঙ্গত স্মর্তব্য উনিশ বিশের দশক থেকেই বাংলায় মনোবিজ্ঞান, মনঃসমীক্ষণের চর্চার সূত্রপাত। নবত্বের আর একটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে তাকে অবশ্যই রাখতে হবে। এই কাজে পথিকৃত ছিলেন গিরীন্দ্রশেখর বসু। এছাড়াও ছিলেন মনোবিদ সুহৃদচন্দ্র মিত্র, মন্মথনাথ ব্যানার্জী, হরিদাস ভট্টাচার্য, যদিও এঁদের বাংলা লেখার সন্ধান

---

75 মণীশ ঘটক, যুবনাশ্ব ছদ্মনামে লিখিত, *মান্ধাতার বাবার আমল*, (কলকাতা: প্রকাশক অনুল্লিখিত, রচনাকাল ১৯৭৮, প্রকাশ সাল নেই), পৃ. ৩৩-৩৪।

76 রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'গ্রন্থপরিচয়', *রবীন্দ্র রচনাবলী: খণ্ড দ্বাদশ*, সুলভ সং., (কলকাতা: বিশ্বভারতী, পৌষ, ১৪০২), পৃ. ৭১৯।

পাওয়া যায়নি। ১৯২৪ সালে সরসীলাল সরকার সাইকোঅ্যানালিসিসকে সাধারণ মানুষের কাছে পরিচিত করানোর জন্য লেখেন *মনের কথা* নামক একটি বই, যার ভূমিকা লিখেছিলেন তাঁরই শিক্ষক গিরীন্দ্রশেখর। ১৯২৮ সালে সরসীলাল রবীন্দ্রনাথের মনঃসমীক্ষণ করে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এরপর অনিলকুমার বসু, সরসীলাল এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই বিষয়ে একটি আলোচনার আয়োজন করেন এবং সেটিরও লিখিত রূপ প্রকাশিত হয়েছিল।[77] গিরীন্দ্রশেখরের বেশ কিছু বাংলা লেখা আছে। দক্ষিণ এশিয়ার মনস্তত্ত্ব চর্চায় গিরীন্দ্রশেখরের ভূমিকা অগ্রগণ্য। নিজ উৎসাহ ও পড়াশনার তাগিদে তিনি ফ্রয়েডকে সেই সময় আবিষ্কার করেন যখন পাশ্চাত্যেও ফ্রয়েড সেভাবে বিস্তার লাভ করেননি। ২০২১ সালে ফ্রয়েডের সঙ্গে তার পত্রালাপ শুরু হয়। তাঁর *কনসেপ্ট অফ রিপ্রেশন* বইটি হাতে পেয়ে ফ্রয়েড রীতিমত উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন চিঠিতে, '... I am glad to testify the correctness of its principal views and the good sense appearing in it. My surprise was great that psychoanalysis should have met so much recognition in your far-off country।'[78] বাংলায় মনস্তত্ত্ব সংক্রান্ত আলোচনার বাতাবরণ নিঃসন্দেহে জারি হয়েছিল। তরুণ সাহিত্যিকদের যা প্রভাবিত করেছিল যথেষ্টই। নরেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত থেকে শুরু করে তরুণ প্রজন্মের অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের লেখালিখি সাহিত্যে নতুনত্ব নিয়ে এসেছিল।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এতুটুকু পরিষ্কার যে সমাজজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এমন অনেক উপাদান সংযুক্ত হয়েছিল, যা আগের থেকে আলাদা। আমরা ভূমিকাতেই

---

[77] অমিতরঞ্জন বসু, 'দ্বিতীয় সংস্করণ প্রসঙ্গে', *গিরীন্দ্রশেখর বসু: অগ্রন্থিত বাংলা রচনা*, সংকলন, সম্পাদনা এবং অবতরণিকা অমিতরঞ্জন বসু, (কলকাতা: অনুষ্টুপ, ২০১৭), পৃ. ৭-৮।

[78] বসু, 'অবতরণিকা', ২০১৭, পৃ. ১৯।

আলোচনা করেছি যে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক কারণবশত পুরানো পারিবারিক প্রথাগুলিও বিপর্যস্ত হয়ে শুরু করে করেছিল। মেয়েদের শিক্ষা এবং সীমিত অংশে হলেও উপার্জনের জন্য ঘরের বাইরে বেরনোর ফলেই পরিবর্তন সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। নবত্বের প্রতর্কের মধ্যেও সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হিসাবে উঠে এসেছে কিন্তু নারী পুরুষের সম্পর্কের প্রশ্নটি। কারণ 'নারী' আধুনিকতা ও আধুনিকতাবাদের কেন্দ্রে থাকা একটি বর্গ। যাকে ঘিরে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক-মনস্তাত্ত্বিক স্তরে অনেকগুলি প্রশ্ন আবর্তিত হয়। বিদেশি সাহিত্য ও তত্ত্ব পাঠের মধ্য দিয়ে বাঙালি পুরুষের যে নতুন বৌদ্ধিক ও জৈবিক চাহিদা তৈরি হয়েছিল জীবনসঙ্গীকে কেন্দ্র করে। কিন্তু প্রত্যাশা পূরণের বাস্তব পরিসর তখনও প্রস্তুত হয়নি। তাই সাহিত্যই হয়ে উঠেছিল প্রধান পরিক্ষাগার ও রণক্ষেত্র। উনিশ বিশের বাঙালি আধুনিকতার পুরোটাই পরজ (derivative) কিনা সেই প্রশ্ন না তুলেই বলা যায়, পাশ্চাত্য সাহিত্যই তাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল অথাকথিত আধুনিকতার বোধের সঙ্গে। আর আধুনিকতার ধারণার সঙ্গেই জুড়ে থাকে নতুনত্বের ধারণা। আধুনিকতা নবত্বের দাবিকে শক্তিশালী করে তোলে। আধুনিকতার সঙ্গে কালিকতার যোগ নিবিড়। কারণ আধুনিকতার মধ্য দিয়ে একটি ঐতিহাসিক সময়সিমা নির্ধারণের প্রক্রিয়া চলে। সেই আধুনিক যা তার আগের যুগের থেকে উন্নততর। নবত্বের ধারণার সঙ্গেও সেই ভাবেই জুড়ে থাকে আগের থেকে ভালো হয়ে ওঠার চেষ্টা। সুতরাং এখানে আবার প্রশ্ন আসবে ভালোত্ব কি? তা-কি সবার জন্য এক? বলাবাহুল্য নয়। উনিশ শতকের জাতীয়তা ও ঔপনিবেশিকতা নারীকেই সংস্কারের প্রধান বিষয়ে পরিণত করেছিল। বিশ শতকে তার প্রকাশভঙ্গী বদলালেও চরিত্রে বিশেষ বদল ঘটেনি। আবার পারিবারিক প্রথায় বদলের জন্য বাস্তবে কিছু পরিবর্তন ঘটেছিল। এই টানাপোড়েনের সাক্ষ্য বহন করছে সাহিত্য।

পাশ্চাত্যে প্রথম তরঙ্গের নারীবাদ প্রসার ভারত তথা বাংলার বৌদ্ধিক পরিমণ্ডলে কিঞ্চিৎ প্রভাব ফেলেছিল বলে আমার মনে হয়। হয়ত সরাসরি মেয়েদের উপরে নয়, কারণ সেই বাস্তবতাও ছিল না। বিংশ শতকের শুরুতেই কেবলমাত্র কলকাতা শহরের কথা ধরলেই দেখা যাবে মেয়েদের শিক্ষা খুবই সীমিত অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এক অর্থে বলা যায় যে, কয়েকটি আলোকপ্রাপ্ত পরিবারের মধ্যেই থেকেছে। বলাবাহুল্য ব্রাহ্মসমাজ সংগঠিত উদ্যোগ এবং ব্রাহ্ম পরিবারগুলির মুক্তমনা পরিবেশ নারী শিক্ষার বিষয়ে যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছিল। এতদসত্ত্বেও সমসাময়িক বিদেশী গ্রন্থ বা পাশ্চাত্যের নবউদ্ভূত ধারণা, তত্ত্ব, ঘটনা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতে স্বাভাবিক ভাবেই পুরুষদের থেকে বেশি সময় লেগেছে মেয়েদের, কারণ তাঁদের অক্ষরজ্ঞানের সুযোগ পেতেই অনেকটা সময় অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে। তার পর সেই শিক্ষার সম্প্রসারণ হতে (আনুভূমিক বা উল্লম্ব দুই দিকেই) আরও সময় লেগেছে বা এখনও চলেছে সেই প্রক্রিয়া। তবে শিক্ষিত নারীদের একাংশ বিদেশী সাহিত্য এবং তত্ত্ব পাঠে অভ্যস্ত ছিলেন তার প্রমাণ তাঁদের লেখাতেই পাওয়া যায়। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং অধিকাংশ মেয়ের অবদমিত জীবনের বাস্তবতা তাঁদের পারিবারিক ও রাজনৈতিক অধিকার পাওয়াকেই অগ্রাধিকার দিতে বাধ্য করেছিল। তাই অনেক ক্ষেত্রেই যখন তরুণ পুরুষ লেখক মন-যৌনতা-বুদ্ধিবৃত্তি-সমাজকে উপজীব্য করে কলম চালাচ্ছেন, তখন মেয়েদের লেখা তাদের ব্যক্তিগত যন্ত্রণার আলেখ্য তুলে ধরেছে; কারণ মেয়েদের লেখালিখিটাই বেশি দিনের পুরানো নয়। এই কারণেই নবত্ব নামক বর্গটিকেই নারীর প্রেক্ষিত থেকে সমস্যায়িত করা সম্ভব।

প্রথম তরঙ্গের নারীবাদ পাশ্চাত্যে বহু সংখ্যক নারীকে অনুপ্রাণিত করেছে নিজেদের ঐতিহাসিক বিষয়ী হিসাবে চিহ্নিত করা এবং নবত্বের মুক্তিদায়ী প্রতিনিধি

হিসাবে নিজেকে উপস্থাপিত করার ক্ষেত্রে। 'নারী'-র ধারণার সঙ্গে কালিকতার (temporality) সংযোগ যে থাকতে পারে সেই ভাবনাই নতুনত্বের দাবীদার। কালগত বা কালিকতার চেতনা বা উপলব্ধিই রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন নারী-সংস্কৃতির আবির্ভাবকে সংহত করেছিল। তাই এই কালিকতার ধারণা নারীবাদী বীক্ষণে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ভারতের ক্ষেত্রে বলা যায়— ভোটাধিকারের জন্য লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে নয়, বরং পারিবারিক প্রথা এবং ঔপনিবেশিকতার বিরোধিতার মধ্যে এদেশের নারী তার ঐতিহাসিক স্থান, গুরুত্ব ও বিষয়ীসত্ত্বা খুঁজে পেয়েছিল। বিশেষ করে বঙ্গভঙ্গের পরে গান্ধিযুগের আগমন ও তার পরপরই বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত নারীকে রাজনৈতিকতার অংশ ও রাজনৈতিক বিষয়ী করে তুলেছিল। নারী একটি বর্গ হিসাবে কিভাবে একটি ঐতিহাসিক সময়ের আকার, অবয়ব কল্পনা করে ও নির্ধারন করে, এবং তার নিরিখে নিজের/দের অবস্থান ঠিক করে, সেটা অনুধাবন করা জরুরি। তবে এই পরিসরটিও কোনো সমসত্ত্ব বা একমাত্রিক পরিসর যে নয়, সেই বিষয়ে সচেতন থেকেই অনুসন্ধান চালাতে হবে। আর একটি প্রশ্নও এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত, একটি বিশেষ ঐতিহাসিক-সময় নিজেই নারীকে ও নারীত্বের ধারণাকে (তার অজ্ঞাতেই) নির্মাণ করে চলে। এবং যুগের প্রয়োজনে নারীর বিশেষ বিশেষ প্রতিমূর্তি, রূপকল্প তৈরি হয়ে থাকে। এই জন্যেই নারীর এজেন্সি (কর্তৃত্ব/ প্রতিনিধিত্ব?) খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। নারীবাদী বীক্ষায় ঐতিহাসিক সময়ের আকার এবং সীমান্যাস (contours) কি হতে পারে, বৃহৎ সামাজিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে তাদের (নারী হিসাবে) সম্পর্ক কি হতে পারে বলে তারা মনে করেন, এবং বিবর্তনবাদী ও বিপ্লবী পরিবর্তনে তাদের দাবী-অবস্থান-সম্পর্ক কি – ইত্যাদি প্রশ্নগুলিও একটি বিশেষ ঐতিহাসিক সময়ের/যুগের সাহিত্য বিচারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। বিশেষত যখন আমি উত্তাল এবং

পরিবর্তনকামী সময়ের সাহিত্যে লিঙ্গ-সম্পর্কের-বিন্যাস পর্যালোচনা করতে চাইছি, তখন। এই প্রসঙ্গে রিটা ফেলস্কি 'সময়-আখ্যান/পাঠ' বা 'time-text' শব্দবন্ধের ব্যবহার করেছেন; বা সঠিক ভাবে বলতে গেলে পুনর্ব্যবহার করেছেন। অ্যান্থনি কেম্প উক্ত শববন্ধ ব্যবহার করেছিলেন গোষ্ঠী/কৌম-আখ্যানগুলি সম্পর্কে, ব্যক্তিগত ইতিহাসের প্রকাশ ঘটে যেখানে।[79] ব্যক্তিগত সময় এবং ব্যক্তিগত আখ্যান কিভাবে ইতিহাসের বিষয় হয়ে উঠতে পারে, বা আদৌ পারে কিনা সেই আলোচনা আমাদের গবেষণার স্বার্থে অতিপ্রয়োজনীয়। কারণ ব্যক্তি মানুষের মনে বা তার প্রতিদিনের ঘরের ভিতরে উঁকি দিতে পারে সাহিত্য। সাহিত্যকে ইতিহাসের উপাদান হিসাবে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যই হল ব্যক্তির ইতিহাসকে বোঝার চেষ্টা। তবে ব্যক্তির সম্পূর্ণ সমাজ বিচ্ছিন্ন একার চলা বা অনুভূতির জগৎ একান্তভাবেই সাহিত্যের আঙিনা। আমাদের চেষ্টা থাকবে ব্যক্তি মানুষের ইতিহাস বোঝার। অর্থাৎ কিনা ব্যক্তি যখন সামাজিক জীবনের সঙ্গে যেকোনো ধরণের বোঝাপড়ায় যায়: অংশ হয়ে ওঠে, বা উঠতে চায় বা বিচ্ছিন্ন হতে চায়, কিম্বা চেয়েও পারে না; তার সেই চাওয়া/ না-চাওয়া, পারা/ না-পারার যে আলোআঁধারির জগৎ, তার নৈঃশব্দ, বিবিক্তি, টানাপোড়েন, স্ববিরোধিতার পরিসরকে বোঝার চেষ্টা করা ইতিহাসচর্চার স্বার্থেই প্রয়োজন।

আধুনিকতার চিহ্নগুলির মধ্যে অন্যতম হল নতুনত্ব বা নবত্বের ধারণা, উদ্ভাবন এবং ভবিষ্যতের ধারনা। 'পুরাতনের শেষ' এই ধারণার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে নতুন সূচনার বোধ। প্রায়শই অবক্ষয় এবং অধঃপতনের ধারণা সহাবস্থান করে ভবিষ্যৎ ও উজ্জ্বল নবপ্রভাতের উদিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে। একটি যুগের অবসানের মধ্য

---

[79] See footnotes, Rita Felski, *The Gender of Modernity*, (Cambridge, Massachusetts, London and England: Harvard University Press, 1995), 232.

দিয়ে ঘটে নতুন যুগের সূত্রপাত। ইংল্যান্ড তথা পাশ্চাত্যে উনবিংশ শতক জারিত হয়েছিল আধুনিকতার নতুনত্বে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিবিধ আন্দোলনের ক্ষেত্রেও দেখা যায় নবত্বের উদযাপন – নিউ থিয়েটার, নিউ আর্ট, নিউ সাইকোলজি, নিউ পলিটিস্ক, নিউ ফিকশন ইত্যাদির পাশাপাশি নব্য নারী এবং নব্য উদ্যম। ঔপনিবেশিক ভারতেও উনবিংশ শতকেই পরিবর্তন এবং নবত্বের ধারণার সূচনা হয়েছিল। তা বিকশিত হতে থেকেছে বিশ শতকে। বিশেষত বিংশ শতকের বিশের দশকে নতুনত্ব এবং পরিবর্তনের দাবি নতুন মাত্রা পেয়েছিল। এই কল্পিত ভবিষ্যতে নারীত্বের নব নির্মাণ কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছিল। অর্থনৈতিক, সামাজিক, আইনি, সাংস্কৃতিক পরিসরে নারীর পরিবর্তিত অবস্থান অনেক মহিলাকেই অনুপ্রাণিত করেছিল এই ধারণা তৈরি করতে যে, সবকিছুর পরে নারীই আধুনিক জীবনের পরিবর্তনশীলতা এবং নবত্বের মেজাজ ও উদ্দীপনাকে সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত করতে পারে। আধুনিকতা এমন একটি যুগ যেখানে আধুনিক হয়ে ওঠা হল একটি মান (value)। বলা ভালো, আধুনিকতা হয়ে ওঠে এমন একটি মৌলিক মান, যার নিরিখে অন্যান্য মানগুলির মূল্যায়ণ করা হয়। অর্থাৎ আধুনিকতা যতটা না একটি বস্তুগত আকার, তার থেকে অনেক বেশি স্থান-কাল-পাত্র নির্ভর অবস্থা যেখানে সর্বোচ্চ মূল্য দেওয়া হয় নবত্বের প্রবর্তনকে; এবং 'পুরানোপন্থী', 'সেকেলে' ইত্যাদি শব্দের সঙ্গে জুড়ে যায় অবজ্ঞাসূচক মনোভাব।[80] যে শব্দগুলি প্রায়শই নারীর সঙ্গে সম্পর্কীত বলে ভাবার প্রবণতা চলে আসছে আজও। আধুনিক হয়ে ওঠার অর্থ যেন একটি দ্বিরুক্তি। বিভিন্নভাবে বিভিন্ন শব্দের মাধ্যমে বারবার নিজেকে বিশ্লেষণ করা, নতুনের অত্যাবশ্যকীয় মূল্যকে স্বীকার করে নিয়ে বিশেষ মূহুর্ত বা কালপর্বকে

[80] Felski, 1995, 170.

প্রকাশিত, মঞ্চস্থ করার বাসনা। বর্তমানের খিন্ন ক্লিষ্ট দীনতা থেকে যেনবা মুক্তি দিতে পারে একমাত্র সামনের না দেখা ভবিষ্যৎ। 'বর্তমান' এখানে যেন অতীতে পরিণত, ইতিমধ্যেই যাকে ত্যাগ করে, পিছনে ফেলে আসা হয়েছে। এবং ভবিষ্যতের অভিমুখে যাত্রার এই গতি একরৈখিক, সর্বদা সামনের দিকে। তাই আধুনিকতার মধ্যেই নিহিত থাকে যুগান্তরের ধারণা। একটি যুগের অবসানের মধ্য দিয়ে নতুন যুগের সুত্রপাত। এই কারণেই 'সময়-পাঠ' গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে - পুরুষালী সময়কে একরৈখিক (linear) এবং মেয়েলি সময়কে ছন্দময়, চক্রাকার, পুনরাবৃত্তিমূলক বলে দাগিয়ে দিয়ে কালিকতা ধারণার মধ্যে যে অতিরঞ্জিত বিভাজন তৈরি করা, সেই বিষয়ে যথেষ্ট সংশয়দীর্ণ রিটা ফেলস্কির মত নারীবাদীরা। পাশ্চাত্যে অজস্র উদাহরণ পাওয়া যায় যেখানে ভিক্টরিয় বিবাহের আদর্শের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে মেয়েরা লেখালিখি করছেন। পরিবার-প্রতিরোধ ভাঙা, নারীর মুক্তি, যৌন জীবন ও তার সমস্যা নিয়ে আত্ম-সচেতন আলোচনা, সমাজ ও পরিবারের সমালোচনা – এই সবই বিষয় আকারে উঠে আসতে পারে। হেনরিক ইবসেনের *আ ডল'স হাউজ*-এর নোরা সারা ইউরোপের নারীবাদের পরাকাষ্ঠায় পরিণত হয়েছিল। রিটার কথায়, '*A Doll's House* reverberated across national borders, exciting feverish speculation about the specter of feminism that was haunting Europe.'[81] নারীমুক্তি সংক্রান্ত রচনার বিস্তার ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিল নারী আন্দোলনের রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক উপস্থিতির সঙ্গে। বলাবাহুল্য ভারতবর্ষের পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। এখানে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নারীবাদী আন্দোলনের বিকাশ ঘটেনি। কিন্তু সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংস্কার আন্দোলন

---

[81] Felski, 1995, 146.

থেকে শুরু জাতীয়তাবাদী উপনিবেশ-বিরোধী সংগ্রাম – সর্বত্রই নারীপ্রশ্ন হয়ে উঠেছিল গুরুত্বপূর্ণ। আমরা আগেই আলোচনা করেছি সমাজের সমস্ত ক্ষেত্রেই নানান পরিবর্তনের জন্য মেয়েদের যাপনেও এসেছিল বহুবিধ পরিবর্তন। তার প্রকাশ অবশ্যই সাহিত্যেও ঘটেছিল। তবে তা পাশ্চাত্যের ঢং-এ নয়, এবং তা বাঞ্ছনীয়ও নয়। যদিও পাশ্চাত্যের প্রভাব অবশ্যই ছিল। বাংলা সাহিত্যে নারী-যৌনতা বা পরিবারের কাঠামোকে সরাসরি অস্বীকারের কথা নারীর কলমে আলোচ্য সময়ে তেমন দেখা যায়নি। বরং পুরুষদের লেখনীতে বেশ কিছু পরীক্ষানিরীক্ষার দেখা যায়। সে কারণে পুরুষরচিত সাহিত্যকে অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল এবং নারীর রচনা মূলত ধারাবাহিকতা বলে ব্যাখ্যা দেওয়ার এক ধরণের প্রবণতা দেখা যায়। এছাড়াও মনে করা হয়, পাশ্চাত্যের নারীশক্তি অন্যান্য ক্ষেত্রের মতই লিঙ্গ-সচেতনতা দিক থেকে অগ্রসর এবং তারাই রাজনৈতিক বিষয়িতার অংশ হয়ে উঠেছিল। পেরেছিল প্রকৃত অর্থে আধুনিক ও নবত্বের আলোকবাহী হয়ে উঠতে; উপনিবেশের নারীরা নয়। এই জাতীয় ব্যাখ্যা, বলা বাহুল্য, অত্যন্ত সহজীকরণ এবং একমাত্রিক। এই দৃষ্টিকোণ অনড় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাই অনেক ক্ষেত্রেই এই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে সূক্ষ্ম তারতম্য বিচার করা সম্ভব নয়। ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে নারীর অবস্থানকে সবসময়ই তার পরিস্থিতির নিরিখে দেখা দরকার। প্রাচ্যকে অনাধুনিক এবং প্রাচ্যের নারী ততোধিক অনগ্রসর, অপরিবর্তনীয় হিসাবে দেগে দেওয়ার একটি নির্দিষ্ট রাজনীতি আছে। সেই বিষয়ে আমরা আগের অধ্যায়ে কিছুদূর অলোচনা করেছি। পুনরুক্তি দোষাবহ হবে না আশা করি, আমরা দেখেছি ক্ষমতা কাঠামোর থাকবন্দী বিন্যাসে যে যত নিচে তাকে তার উপর শোষনের পরিমান এবং পরিণাম ততটাই। নারী যেহেতু ক্ষমতাতন্ত্রে পুরুষের নিচে তাই শ্রেণি, বর্ণ, ধর্ম, জাতিগত নিষ্পেষণের সঙ্গে যুক্ত হয় লিঙ্গ-নিষ্পেষণ। ঠিক সেভাবেই

ঔপনিবেশিকতার পেষণও নারীর উপর বহুস্তরীয়। ঔপনিবেশিকতার সামগ্রিক পীড়নের সঙ্গে যুক্ত হয় ঔপনিবেশিক প্রভূ (নিশ্চিতভাবে পুরুষ, সাদা চামড়া) এবং তার দেশের পিতৃতন্ত্রের শোষণ। আবার উপনিবেশ স্থাপনকারী, তথাকথিতভাবে এগিয়ে থাকা, দেশগুলির 'প্রগতিশীল', 'নারীবাদী', 'অগ্রসর' নারীর প্রাধান্যকারী মনোভাব উপনিবেশের আধিপত্যকামী যুক্তিকেই জলসিঞ্চন করে। ঔপনিবেশিত নারী একটি বিশেষ বর্গ। যারা সাদাচামড়ার নারীদের কাছেও সেই অধঃপতিত অপর, যাদের উপস্থিতি সবসময়ই প্রভূর উপর নির্ভরশীল, যাদের নিজেদের যাপনের কোনো মূল্য নেই, যারা তত্ত্বায়িত করতে অক্ষম। কিন্তু অনন্ত ব্যাখ্যা ও তত্ত্বায়নের বিষয়বস্তু, নিজেরা কোনোভাবেই ব্যাখ্যাকারী নয়। তাই বাংলা সাহিত্য বিচারের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র পাশ্চাত্য নারীবাদের মাপকাঠিতে না দেখে সামগ্রিকভাবে ঐতিহাসিক সময়ের প্রক্ষিত থেকে দেখতে হবে। তাছাড়া নারীবাদেরও কোনো সমন্বিত, সংযোজক, একমাত্রিক চেহারা সম্ভব নয়। গঠনগতভাবেই তা বিভিন্ন গোষ্ঠি ও তরঙ্গের ভগ্ন-সমষ্টি, যেখানে মতৈক্যের থেকে মতানৈক্যই বেশি।[82] এই অবস্থান থেকেই ঐতিহাসিক ভাবনায় লিঙ্গ-রাজনীতিকে এবং প্রতিটি বর্গকে পুনর্মূল্যায়ণ করা জরুরি।

[82] Felski, 1995, 147.

দ্বিতীয় অধ্যায়

আধুনিকতা, আধুনিকতাবাদ: সাহিত্যে লিঙ্গায়ণের স্বরূপ

Out of the chalice of this realm of spirits
Foams forth to him his infinity.

The Phenomenology of Spirit, Hegel.

আমাদের আলোচ্য সময়ের ধাত্র আধুনিকতা। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে ঔপনিবেশিক আধুনিকতা। ঔপনিবেশিক, উপনিবেশ বা ঔপনিবেশিকতা ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণের মধ্যেই নিহিত আছে এক স্বীকারোক্তি; পরাজয়ের, পরাভূত হওয়ার, বিজিত হওয়ার স্বীকারোক্তি। পরাজয়ের ঘটনার অভিঘাত হতে পারে বহু। এমনকি জয়ী শক্তির সঙ্গে সম্পর্কের বিন্যাসও হতে পারে এবং হয়ে থাকে নানাবিধ। তাতে পরাজিত হওয়ার বিষয়টি বদলায় না। একই ভাবে পরাজিত হওয়ার ধারণা স্বীকৃতি পায় বিজয়ী শক্তির ঢক্কানিনাদ এবং অধিগৃহীত ও পরাভূত হওয়ার ধারণা দ্বারা। উপনিবেশ বিস্তারকারী এই বিজয়ী শক্তি হল রাজা বা রাষ্ট্রনায়ক বা তারই বৈভাষিক অথবা বৈকল্পিক প্রতিমূর্তি; এবং প্রায় নিশ্চিত ভাবেই পুরুষ। বিজয়ীর পৌরুষেই ভোগ্যা হন বসুন্ধরা (এক্ষেত্রে অধিকৃত অঞ্চল এবং তার বাসিন্দা উভয়ই)। ঔপনিবেশিকতার এই পুরুষচরিত্র বা পৌরুষময়তা প্রমাণের জন্য কোনও তত্ত্বের অবতারণা করার দরকার পড়ে না, ঐতিহাসিক উদাহরণগুলিই যথেষ্ট। বিজয়ী এবং বিজিতের সম্পর্ক যেমন একমাত্রিক নয়, তেমনই আধিপত্যের বিস্তার প্রক্রিয়ার মধ্যেও থাকতে পারে বিভিন্নতা। ভারতে আধুনিকতা এবং আধুনিকতাবাদের আগমন, উন্মেষ ও বিস্তার ঘটেছিল সেই পরাজিত থাকার সময়ের মধ্যেই। অর্থাৎ ভারতে ঔপনিবেশিকতা এবং আধুনিকতা একই

কালিকতার অংশ (temporality)। ঔপনিবেশিকতার সঙ্গে উপনিবেশের (এক্ষেত্রে ভারতের) আধুনিকতার সম্পর্ক অত্যন্ত জটিল— প্রভাব, অস্বীকার, বিরোধিতা, আত্তীকরণ, উপেক্ষা, অধীনতা, বশ্যতা, বাধ্যতা, সাংস্কৃতিক অভিযোজন (acculturation), বিরোধিতার মধ্যে দিয়ে গ্রহণ বা বর্জনের বহুস্তরীয় পথে তার যাত্রা। ভারতের মতো বহু বৈচিত্রময় দেশে যেখানে ঔপনিবেশিকতার বিস্তারই বহুমুখী, সেখানে এই গতিপথ বহুমাত্রিক হতে বাধ্য। নব শর্ত, নব ধারণা, নব জ্ঞান, এবং নব নব আকৃতি-প্রকৃতির সঙ্গে সতত অবস্থান করে তার অতীত। নতুন জ্ঞানের সঙ্গে অতীতের ধারণারও পুনর্নির্মাণের খেলা চলে, তার সঙ্গে চলে নিজেকে পুনরাবিষ্কার ও পুনর্প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া। তাই প্রভাব ও অস্বীকারের সমীকরণের মধ্যে দিয়েই ভারতের আধুনিকতা ও আধুনিকতাবাদের ইতিহাসকে দেখব আমরা। দীপেশ চক্রবর্তী তাঁর *প্রভিনশিয়ালাইজিং ইওরোপ: পোষ্টকোলোনিয়াল থট অ্যান্ড হিস্টরিক্যল ডিফারেন্স* গ্রন্থের শুরুতেই কতকগুলি ধারণার উল্লেখ করেছেন, যথা – নাগরিকত্ব, রাষ্ট্র, নাগরিক সমাজ, জনপরিসর, মানবিক অধিকার সমূহ, আইনের সমানাধিকার, অন্দর-বাহিরের পার্থক্য, প্রজা/বিষয়ীর ধারণা, গনতন্ত্র, জনপ্রিয় সর্বভৌমত্ব, সামাজিক ন্যায়, বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ ইত্যাদি। তাঁর মতে এই সবকটি ধারণার উপরেই পড়েছিল ইওরোপিয় ধ্যান ধারণা ও ইতিহাসের গভীর চাপ। উপরোক্ত এবং তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত আরও কয়েকটি ধারণা চরম পরিণতি পেয়েছিল ইওরোপিয় আলোকায়ন এবং উনবিংশ শতকের যাত্রাপথে, তাই এই সবকিছুর সঙ্গে বিচ্ছিন্ন ভাবে কারোর পক্ষে রাজনৈতিক আধুনিকতার কথা ভাবাও সম্ভব নয়। আর ইওরোপিয় ঔপনিবেশিক প্রভূরা উনবিংশ শতক ধরে তাদের উপনিবেশগুলিতে একাধারে আলোকায়িত মানবতাবাদ প্রচার করেছে আর প্রয়োগের

ক্ষেত্রে অস্বীকার করেছে তাকে।[1] আধুনিক শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি হল, প্রথম এশিয় সামাজিক গোষ্ঠী যাদের মানসিক জগত রূপান্তরিত হয়েছিল পাশ্চাত্যের সঙ্গে তাদের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে।[2] রজতকান্ত রায় বৌদ্ধিক ও আবেগ, এই পরিসরে পাশ্চাত্যের প্রভাব কতদূর তা বিচারের করতে উদ্যোগী হয়েছেন। বাংলার আধুনিকতায় বিশেষত আধুনিক সাহিত্যে কতটা পাশ্চাত্যের প্রভাব আর কতদূর দেশীয় ধারাবাহিকতা বজায় থেকেছে, তা নিয়ে বিতর্ক করা বা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো আমার বর্তমান সন্দর্ভের উদ্দেশ্য নয়। দেশীয় ও বহিরাগত ধ্যানধারণা দীর্ঘ সময় পাশাপাশি অবস্থান করেছিল, যদিও অবস্থান সমান ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না; একদিকে ছিল ঔপনিবেশিক শাসক ও অন্যদিকে শাসিত। স্বভাবতই তাদের আন্তঃসম্পর্কের একটি বিশেষ ধরণ থাকতে বাধ্য। লিঙ্গ-সম্পর্কের ক্ষেত্রে ছোট-বড় যেকোনো সম্পর্কই অন্যমাত্রায় উপস্থিত হয়। তাই বিভিন্ন বর্গ ও ধারণাকে সমস্যায়িত প্রয়োজন। পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী-গণতন্ত্র বহির্ভূত পৃথিবীর বাদবাকি দেশগুলিতে জনগণের রাজনীতিকরণ (politicization) বা রাজনৈতিক আধুনিকতার (political modernity) সূচনার ফলে ইতিহাসে একটি গভীর বিদ্রূপাত্মক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। ইতিহাস যেন সামনে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিল। উনবিংশ শতকের ইউরোপের দুটি ধারণাগত উপহার, যা আধুনিকতার ধারণার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত, সম্পর্কে নতুন করে ভাবার দরকার হয়ে পড়ল। ধারণা দুটি হল – ইতিহাসবাদ (historicism) এবং রাজনৈতিক (political)। এই ধারণাদুটির কেন্দ্রে রয়েছে প্রতীচ্য, তার বাইরে একে একে সজ্জিত নানা দেশ। প্রতীচ্য বা পাশ্চাত্যের কেন্দ্র থেকে যাবতীয় ধারণা ছড়িয়ে পড়ে বাইরের দিকে। ঐতিহাসিক

---

1 Dipesh Chakrabarty, *Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference*, (New Jersey: Princeton University Press, 2000), 4.

2 Tapan Roychoudhuri, *Perceptions, Emotions, Sensibilities: Essays on India's Colonial and Post-Colonial Experiences*, (New Delhi: OUP, 1997), ix.

সময়কাল নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে ইতিহাসবাদ দ্বারা। ইতিহাসবাদ ঐতিহাসিক সময়কালকে ব্যবহার করে পাশ্চাত্য ও অ-পাশ্চাত্যের মধ্যে সাংস্কৃতিক পার্থক্যের মাপকাঠি হিসাবে। অর্থাৎ অনেক আগে থেকে এবং বেশি এগিয়ে থাকা দেশগুলির (অবশ্যই পাশ্চাত্যের) মধ্যে পিছিয়ে থাকা বা পরে 'অগ্রগতি'-র সূচনা হওয়া দেশগুলি খুঁজে পাবে নিজেদের ভবিষ্যত।[3] বিভিন্ন চিন্তাবিদের রচনা আলোচনা করে দীপেশ চক্রবর্তী দেখিয়েছেন যে, উনিশ শতকের এই ইতিহাসবাদ পাশ্চাত্য-বহির্ভূত দেশগুলির নানা দাবী প্রতিহত করতে করতে তাদের বুঝিয়েছিল যে, তারা এখনও প্রস্তুত নয়, পর্যাপ্তভাবে উন্নত নয়, তাই এখনও অপেক্ষা করতে হবে। দীপেশের কথায়, '...consigned Indians, Africans, and other "rude" nations to an imaginary waiting room of history. In doing so, it converted history itself into a version of this waiting room'.[4] উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন যে এই ধারণা তৈরির মধ্যে প্রকাশিত হয় বিজয়ীর আধিপত্যকামী-পৌরুষময়-নিয়ন্ত্রণপ্রচেষ্টা। আধুনিকতার ধারণার সঙ্গেই সম্পৃক্ত 'নতুন'-এর ধারণা এবং নতুনের দাবিকে বলপূর্বক প্রতিষ্ঠা দান। আধুনিক সবসময়ই আগের যুগ অর্থাৎ মধ্যযুগের থেকে উন্নত এবং আলোকিত। সেই কারণেই মধ্যযুগ অন্ধকারাচ্ছন্ন। সুতরাং আধুনিকতা এবং ভালোত্বও অঙ্গাঙ্গী জড়িত। আধুনিকতা হল সেই 'সাহসী নতুন বিশ্ব' যেখানে মানুষ অজানা, আদিম প্রকৃতির উপর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করবে পৌরুষের জোরে।[5] বৈজ্ঞানিক ভবিষ্যতবাদ যার উদ্দিষ্ট। ঔপনিবেশিক আধুনিকতার বৈশিষ্ট্যই হল অ-পাশ্চাত্য (উপনিবেশ)-এর উপর কর্তৃত্ব স্থাপনের মাধ্যমে তার ভবিষ্যত নির্ধারণের বাসনা। সাম্রাজ্যবাদের সাহিত্য হিসাবে সাধারণত অ্যাডভেঞ্চার

---

3 Chakrabarty, 2000, 4-7.

4 Chakrabarty, 2000, 8.

5 অ্যাল্ডাস হাক্সলি, *দ্য ব্রেভ নিউ অয়ার্ল্ড*, ১৯৩১ সালে রচিত ইংরাজ ঔপন্যাসিকের বিশ্ববিখ্যাত বি-কাল্পনিক বা ডিস্টোপিয়ান উপন্যাস।

আখ্যানের উল্লেখ করা হয়, যেখানে তুলে ধরা হয় কোনো সুদূরবর্তী উদ্ভট কাল্পনিক স্থানে সাদা মানুষের বিপজ্জনক ভ্রমণের (আসলে বিজয়ের) বর্ণনা। শ্বেত পৌরুষের বিজয়গাথা রচিত হয় বিশেষভাবে মেয়েলি, অন্ধকারময় সেই অপর-মহাদেশের উপর আধিপত্য স্থাপনের মাধ্যমে। জাতি এবং লিঙ্গের মতাদর্শ এখানে সংযুক্ত হয় নারী এবং আদিমকে পূর্বপুরুষ এবং অযৌক্তিক শক্তির যুগ্ম-প্রতীক হিসাবে তুলে ধরার জন্য। অ-পাশ্চাত্য যেকোনো অঞ্চলই ছিল পৌরুষের অপরিহার্য যৌন তথা ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের পরিসর। বিশ্বযুদ্ধের হিংসা-হত্যা-বুবুক্ষা-ক্লান্তির সর্বময় বিপর্যয়ের পর, সেই আদিম প্রাচ্য (অ-পাশ্চাত্য) হয়ে উঠতে থাকল আধ্যাত্মিক প্রাচুর্য এবং কামদ রূপান্তরের (erotic transfiguration) ক্ষেত্র। রিটা ফেলস্কির ভাষায়, 'আফ্রিকা, ভারত, এবং পৃথিবীর অন্যান্য 'অন্ধকার' অংশগুলি হয়ে উঠেছিল এমন এক পরিসর যেখানে সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক অসচেতন তার নিজস্ব কামনার মানচিত্র এঁকে দেয়, দাগিয়ে দেয় তার কল্পনার অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ'।[6] তবে এই জাতীয় চিন্তার পূর্ব ঐতিহ্য ছিলই, যুদ্ধকালীন ও পরবর্তী বাস্তবতায় তা প্রকট হয়ে ওঠে।

আধুনিকতাবাদ হল একটি সচেতন প্রকল্প। যা একটি বিশেষ যুগের ধারণাকে সামনে নিয়ে আসে; এবং সেই যুগকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার জন্য বা প্রকল্পটিকে বাস্তবায়িত করার জন্য প্রয়োজনে বলপ্রয়োগও করা হতে পারে। রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক পুনর্নির্মাণের প্রক্রিয়া এই আধিপত্যকামীতায় অবশ্যম্ভাবী। আমাদের আলোচ্য কালপর্বে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের উপর জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে এই সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী ও পাশ্চাত্য প্রকল্পের প্রভাব (দ্বিমুখী) থাকবেই। তার সঙ্গে থাকবে পাশ্চাত্যকে আত্তীকরণ-প্রত্যাখান-প্রতিদ্বন্দ্বিতার জটিল বিন্যাস। নিজেদের প্রয়োজনে গণ্ডির মধ্যেই চলতে পারে অপর-কে

---

[6] Felski, 1995, 137.

নির্মাণের খেলা। শিক্ষিত উচ্চবর্ন হিন্দু বাঙালির কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্যের ঐতিহাসিক তত্ত্বানুসন্ধান করেছেন দীপেশ "একাত্মতার ইতিহাস" ("history of belonging") নামকরণের মধ্যে দিয়ে। যে বিষয়গুলিকে তারা নিজেরাই রাজনৈতিক আধুনিকতার কাঠামোর ক্ষেত্রে "সর্বজনীন" বলে মনে করত। এগুলি হল – নাগরিক-প্রজার ধারণা, "কল্পনা"-কে একটি বিশ্লেষণের বর্গ হিসাবে দেখা, পিতৃতান্ত্রিক সৌভ্রাতৃত্ববোধ, নাগরিক সমাজ সম্পর্কীত ধারণা, অন্দর/বাহির বিভেদ, ধর্মনিরপেক্ষ যুক্তি, ঐতিহাসিক সময় ইত্যাদি।[7] কখনও অতীত কখনও বা গ্রাম, কখনও নারী আধুনিক নাগরিক সৃষ্টিশীল মানুষের কাছে হয়ে উঠতে থাকে সেই অনপনেয় (ineffaceable) পরিসর যার ছায়া কখনওই মুছে যায় না তার জীবন ও সৃষ্টি থেকে। তাই সে বারবার বদলাতে চায়, সংস্কার করত চায় সেই সব বর্গগুলিকে, নিজেকে আধুনিক প্রমাণের জন্য। উনিশ শতকের সংস্কার আন্দোলনের ঢেউ স্তিমিত হয়ে এলেও তা একেবারে সরে যায়নি, প্রকাশ ভঙ্গিমা বদলেছিল মাত্র। যুগের প্রাধান্যকারী বৌদ্ধিকচর্চার অংশ হিসাবে বিবর্তনবাদী তত্ত্বগুলি, গার্হস্থ্যের ভেতরেই যে নারীর উপস্থিতির প্রযোজনীয়তা বেশি, তা প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা চালাত নিয়মিত। যদিও পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নের জন্য নারীর সীমিত অগ্রগতির প্রয়োজনীয়তার কথাও বিভিন্ন লেখাপত্রে উঠে আসতে থাকে। আধুনিক, রাজনৈতিক দিক থেকে সচেতন, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত-নাগরিক-ভারতীয়-পুরুষ নারীকে কেবলমাত্র অন্দরমহলে বন্দী রাখতে চায়নি, যদিও অন্দরমহলে তার উপস্থিতির উপযোগিতা বিষয়ে ছিল সচেতন। চেয়েছিল বহির্জগতে নারী যেন তার যোগ্য সহধর্মিনী রূপে উপস্থাপিত হয়। অর্থাৎ তার নাগরিক তকমার মানদণ্ড এবং সজ্জা হয়ে ওঠে যেন নারী। এই ভাবনা থেকে বাঙালি ভদ্রমহিলা শ্রেণির উত্থান। কিন্ত নারীর

7 Chakrabarty, 2000, 19.

উন্নতির ফলে যে ক্ষমতা বা শক্তি উৎপন্ন হবে তাকে সুরক্ষিত রাখার কথাও বারবার বলা হতে থাকে, যাতে তারা জাতির উপযুক্ত সন্তানের মা হিসাবে তাদের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। স্ত্রী শিক্ষিত নাহলে গৃহের পরিমণ্ডল ও সন্তানের সুশিক্ষা সম্ভব নয় বলে ধরে নেওয়া হয়। নারীর একান্ত ক্ষমতাকে সংরক্ষণের মনোভাব যে প্রজনন এবং সন্তান উৎপাদনের উদ্দেশ্যবাদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িয়ে তা আর নতুন করে ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। এই ধারণাই বাঙালি *ভদ্রমহিলা* বর্গের উদ্ভবের অন্যতম চালিকা শক্তি। আমরা *ভদ্রমহিলা* সংক্রান্ত আলোচনায় পরে আসব। এখানে আধুনিকতা-উন্নতি-বিবর্তন ধারণা কিভাবে আধুনিক নারী গড়ে তোলার প্রয়াস নিয়েছিল এবং তার মধ্যে কতদূর নির্ধারণবাদ (determinism) কাজ করেছিল সেটাই তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। নারীবাদী চিন্তন এবং সক্রিয়তা উপরোক্ত উদ্দেশ্যবাদ এবং নারীর প্রাকৃতিক পরিণতি (বলা ভালো নিয়তি)-র ধারণাকে চ্যালেঞ্জ জানায় এবং নির্ধারণবাদী যেকোনো ধারণা বা চিন্তন প্রক্রিয়ার মধ্যে ফাটল ধরাতে সক্ষম হয়। প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ-বিভাজনের ধারণাকে অস্বীকার করার মধ্যে দিয়ে আসলে জাতি-বর্ণ-বংশ-এর অবশ্যম্ভাবী পতন ডেকে আনে। রিটা ফেলস্কি সহ বিভিন্ন নারীবাদীরা মনে করেন, সমাজের (পুরুষচালিত ও পুরুষকেন্দ্রিক) সার্বিক কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য প্রকৃতপক্ষে নারীকে তার পূর্বের অবস্থানেই থেকে যেতে হয়, কারণ নারীর স্থানু, অপরিবর্তনীয় অবস্থান প্রয়োজন পুরুষের এগিয়ে যাওয়ার জন্যে। আধুনিকতার ধারণার মধ্যেই আছে নারীকে আদিম-অপরিণত-অপরিবর্তনীয় হিসাবে দেখার প্রবণতা। রিটা মনে করেন যে, আধুনিক কালপর্বে নারীর নিজেকে বিবর্তনবাদী তত্ত্বের কেন্দ্রে স্থাপনের চেষ্টা এবং নিজেকেই মাপকাঠি হিসাবে ব্যবহার করে জাতির উন্নতি ও অগ্রগতির পরিমাপ করার প্রবণতা একটি প্ররোচনামূলক কার্য। কারণ তা ঐতিহ্যবাদী পুরুষালী পরমকারণবাদী

(teleological) ইতিহাসচর্চার ধারার মধ্যে ভাঙ্গন ধরায়।[৪] পরিবর্তিত লিঙ্গ-সম্পর্কের বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও তাই নারী অবস্থান নির্ণয়ের উপরেই জোর পড়ে। সুতরাং বিষয়টি ভিত্তিগতভাবেই স্ববিরোধী হয়ে ওঠে। অর্থাৎ কিনা, ধরেই নেওয়া হয় পুরুষই পরিবর্তনের অগ্রগামী পথিক, নারী তার সাপেক্ষে কতদূর এবং কিভাবে অনুগামী ও অনুসারী হয়ে উঠতে পারে বা তাকে গড়ে তোলা যায়, মূল প্রশ্ন সেটাই। অথচ আমরা আগেই আলোচনা করেছি একাধারে নারীকে ভাবা হয় অপরিবর্তনীয়-স্থানু, আবার নারীকে বিবর্তনবাদী অগ্রগতির মানদণ্ডে পরিণত করারও আধুনিক মননেরই ফসল। এই জাতীয় স্ববিরোধ আরও কিছু ক্ষেত্রে দৃশ্যমান হয়। নারীর সক্রিয়তা, কর্মশীলতা এবং শ্রমের আধুনিক বিচারগুলির প্রতি নজর দিলে দেখা যাবে বৈপরীত্য ও অসঙ্গতি রয়েছে। মানবেতিহাসে নারী প্রশ্ন সম্পর্কীত আলোচনায় শ্রম নামক বর্গটি বিশেষ গুরুত্ববাহী। কার্ল মার্ক্স ও ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস থেকে শুরু করে বহু মার্ক্সবাদী সমাজতাত্ত্বিক, মার্ক্সিয়-নারীবাদী বিশ্লেষক নারী ও তার শ্রমের বিষয়টি নিয়ে প্রভূত আলোচনা করেছেন। উৎপাদিকা শক্তি, উৎপাদন সম্পর্ক, উৎপাদনের উপকরণ, মুনাফা ইত্যাদি ধারণার প্রতি গভীরভাবে নজর দেওয়া হয়েছে। নারীর উপর শ্রেণি ও লিঙ্গের দ্বিবিধ অত্যাচারের প্রসঙ্গও এসেছে। গৃহশ্রমকে ভালোবাসার-কাজ তকমা দিয়ে পারিশ্রমিক এবং স্বীকৃতি কোনোটাই না দেওয়ার কথাও আলোচিত হয়েছে। এই মূহুর্তে আমি তথাকথিত শ্রমজীবী বর্গ সম্পর্কে আলোচনায় যাব না। আমাদের প্রতিপাদ্য শহুরে, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, তথাকথিত আলোকপ্রাপ্ত, উচ্চ-মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়: কিন্তু নারী ও তার শ্রমের বিষয়টি এই পরিসরেও একই ভাবে গুরুত্ববাহী। উনিশ শতকে বা বিশ শতকের গোড়াতেও কলকাতার (মফস্বল-গ্রাম এখানে সরাসরি আলোচ্য নয়)

[৪] Felski, 1995, 156.

পরিবারগুলিতে মেয়েরা যে ধরণের কাজে ব্যাপৃত থাকত অর্থাৎ তাদের শ্রম নিয়োজিত হত, সেই সব কাজগুলিই আধুনিকতার আগমনে প্রশ্নের সামনে পড়ে। অর্থাৎ কেবলমাত্র সন্তান উৎপাদন, প্রতিপালন, গৃহকর্ম, সেলাই ইত্যাদি সুগৃহিণীসুলভ কাজগুলি আর শহুরে ভদ্রমহিলার মর্যাদা রক্ষা ও স্থানাঙ্ক নির্ধারণের জন্য যথেষ্ট ছিল না। তাদের সামাজিক মেলামেশার উপযুক্ত শিক্ষা এবং গুণাবলী আয়ত্ত করতে হত। শহুরে বিত্তশালী পাশ্চাত্যায়িত কিছু কিছু পরিবারে কোনো মেয়ের লেখাপড়ায় শ্রম দেওয়াকে তার বিশেষ সমাজে যথেষ্ট সম্মানজনক দৃষ্টিতেই দেখা শুরু হয়েছিল। যদিও সাধারণ পরিবারগুলিতে তখনও মেয়েদের ব্যক্তিগত পরিসর বা লেখাপড়ার বিষয়টি স্বীকৃত হয়নি। উচ্চবিত্ত এবং আর্থিকভাবে সম্পন্ন পরিবারগুলি সন্তানের জন্ম দেওয়া ছাড়া বাকি কাজকর্মের জন্য সহজেই সস্তা শ্রম ক্রয় করার ক্ষমতা রাখত। যদিও বিশ শতকের প্রথম দিকের বহু সাময়িক পত্রে আমরা শিক্ষিত সুগৃহিণী হওয়ার পরামর্শ দেখতে পাই। তা সত্ত্বেও বলা যায় গৃহকাজের অবমূল্যায়ণ ঘটেছিল। কেবলমাত্র গৃহকর্মে নিমজ্জিত থাকা মহিলাদের সম্পর্কে অবজ্ঞামিশ্রিত তাচ্ছিল্যের প্রকাশ প্রায়শই সাহিত্যে (প্রধানত পুরুষ রচিত) পেয়ে থাকি। আধুনিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এই ক্ষেত্রে নারী বৈষম্য এবং ক্ষমতাহীনতাকে এক অর্থে প্রশ্রয় দিয়েছে। নারীর গৃহকর্ম এবং প্রজননের শ্রমের সামাজিক-অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বীকৃতি তো দেয়ইনি, বরং ক্রমশ গুরুত্বহীন করে তুলেছে এবং তার লঘুকরণ (trivialization) ঘটিয়েছে। বলাবাহুল্য এর ফলে শ্রেণিগত বিভাজনও স্পষ্ট হয়েছে। শিশুর স্তন্যপানের জন্যও শ্রম ভাড়া করার অভ্যাস তো আগে থেকেই চালু ছিল। তাই বৌদ্ধিকচর্চা ছাড়া অন্য কাজগুলি যে চাকরশ্রেণি এবং পিছিয়ে থাকা নারীর দায়িত্ব – এই বোধ আরও বেশি মান্যতা পেতে থাকল।

পাশাপাশি জাতীয়তাবাদী উত্থানের ফলে নারীর অন্য একটি রূপও সামনে এল। দেশকে মাতা হিসাবে প্রতিষ্ঠা দিয়ে সন্তানের নিষ্ঠার মধ্য দিয়ে প্রকাশ ঘটল দেশপ্রেমের এবং পৌরুষের। যে বলবীর্যশালী পৌরুষ পরাধীনতা ঘোচাতে পারবে। উত্থান হল ভারতমাতা রূপকল্পের। এটিও ঔপনিবেশিক-আধুনিকতার একটি দিক। পুরুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্রতার সঙ্গে জুড়ে থাকল মায়ের অনুষঙ্গ। 'It is only with respect to his mother that he is his whole self and reorganize as an individual।'[9] সেই কারণে আলোচ্য সময়ে নারী পুরুষের ধারণাটিকে বুঝতে হলে ভারতমাতার রূপকল্পের উত্থানের বিষয়টির সম্পর্কে প্রাথমিক বোঝাপড়া থাকা দরকার। ভারতমাতার ধারণায় প্রবেশের আগে জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গে আলোচনা প্রাসঙ্গিক ও জরুরি। কারণ জাতীয়তাবাদের বিকাশের সঙ্গে 'নারীত্বের' নির্মাণ প্রক্রিয়া অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত। জাতির প্রতিনিধিস্বরূপ নানা প্রতীকের মাধ্যমে সংস্কারবাদ যত পিছনে সরে গিয়ে ঐতিহ্যের শৌর্য ও পবিত্রতাকে সামনের সারিতে স্থান করে দেয়, ততই হিন্দু নারী নৈতিক শৃঙ্খলা ও আদর্শের প্রতীক হয়ে ওঠে। নারী হয়ে ওঠে ভারতবর্ষের সেই প্রাণসত্ত্বা যা পাশ্চাত্যের দূষিত প্রভাবে কলুষিত হয়নি। বাংলায় চরমপন্থী মতাদর্শ যত শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে, ততই জাতীয়তাবাদীরা দেশীয় সাংস্কৃতিক বিশিষ্টতার সঠিক ও শক্তিশালী প্রতীক হিসেবে 'মাতৃত্বের' সাংস্কৃতিক ধারণাকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে।

ইয়োরোপীয় পরম্পরার বিপ্রতীপে দেশকে 'মাতৃভূমি' বা 'দেশমাতৃকা' বলে গণ্য করা হতে থাকে। ১৮৭৫ সালে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বন্দেমাতরম' গানটি রচনা করেন, যা পরে তিনি তাঁর উপন্যাস 'আনন্দমঠে' অন্তর্ভূক্ত করে প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে

---

9 Ashis Nandy, "Woman Versus Womanliness in India", in *The Edge of Psychology* in *Exiled At Home,* (New Delhi: Oxford University Press, 2008), 36.

ব্যবহার করেছিলেন। উপন্যাসটিতে মাতৃদেবীর তিনটি রূপকল্পের বর্ণনা পাওয়া যায়: "মা -- যা **ছিলেন**। মা যা **হইয়াছেন**। মা যা **হইবেন**"।[10] মায়ের জাতীয়তাবাদী ভক্তদের আত্মোৎসর্গ ও কল্পনায় মায়ের এই নির্মাণ স্থায়ী ভাবে জায়গা করে নেয়। ১৮৯৬ সালে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বন্দেমাতরম' গানটি প্রথম গেয়েছিলেন। কয়েক বছর পরে চরমপন্থী নেতা অরবিন্দ ঘোষ এই রূপকের সম্ভাবনার শক্তিকে আরও জোরদার করেন। এর পর জাতীয়তাবাদী নেতা বিপিন চন্দ্র পাল[11] থেকে শুরু করে জওহরলাল নেহরু পর্যন্ত সকলেই দেশ ও জাতিকে মাতৃত্বের উপমা দিয়ে বোঝাতেন। এই জাতীয়তাবাদ ও দেশমাতৃকার ধারণা নিঃসন্দেহে তথাকথিত 'হিন্দু' রূপকল্পের উপর নির্মিত। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল এই রূপকল্পটি কি একরৈখিক বা সমসত্ত্ব নাকি বহুমাত্রিক? মনে রাখতে হবে এই (হিন্দু) জাতীয়তার ধারণাটি কোনও প্রাক-আধুনিক ধর্মীয় বা সনাতন (perennial) আদর্শের ভগ্নাবশেষ নয়। ধারণাটি সম্পূর্ণ আধুনিক।[12] ঔপনিবেশিক ছত্রছায়ায় পাশ্চাত্য-শিক্ষায়-শিক্ষিত 'এলিটশ্রেণী'-র উপর শাসকের চিন্তাকাঠামো আধিপত্য বিস্তারের ফলে তাদের চিন্তনপ্রক্রিয়াও হয়ে পড়ে প্রাকরুদ্ধ (foreclosed)। স্বভাবতই আধুনিক ভারতীয় জাতীয়তাবাদের কেন্দ্রে স্থাপিত হয় রাষ্ট্র, যা কিনা পাশ্চাত্যের 'নেশন-স্টেট' মডেলের অবিকল অনুসারী।[13] এই জাতীয়তা, রাষ্ট্রের অখণ্ডতা ও সার্ব্বভৌমত্বের ব্যাপারে কট্টরপন্থী এবং সমাজনীতি নির্ণয় ও সংস্কারের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপে বিশ্বাসী, এখানে 'হিন্দুত্ব' ধারণাটির কোন ধর্মীয় বা বৃহত্তর সামাজিক অনুষঙ্গ নেই।[14] এই মতবাদ মূলত একটি রাজনৈতিক-ভৌগোলিক

---

10 বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'আনন্দমঠ', *বঙ্কিম রচনাবলী: উপন্যাস সমগ্র,* (কলকাতা: তুলি-কলম, ১৯৮৬), পৃ. ৬৮৩।

11 বিপিনচন্দ্র পাল, 'স্বাধীনতার সাধকদল গঠন', *সত্তর বৎসর,* (কলকাতা: পত্রলেখা, ২০১৩), পৃ. ১৫৪।

12 অশীন দাশগুপ্ত, 'স্বাধীন ভারতের সাম্প্রদায়িকতা', *প্রবন্ধ সংগ্রহ,* (কলকাতা: আনন্দ, ২০০১), পৃ. ২৭৮-২৮০।

13 পার্থ চট্টোপাধ্যায়, 'রাবীন্দ্রিক নেশন কি?', *প্রজা ও তন্ত্র,* কলকাতা: অনুষ্টুপ, ২০০৮, পৃ. ৮৪।

14 অমলেশ ত্রিপাঠী, 'হিন্দু জাগরণ', *স্বাধীনতার মুখ,* (কলকাতা: আনন্দ, ২০১০), পৃ. ১৮৪-১৮৫।

পরিচয় নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত। হিন্দুদের মধ্যে অসংখ্য সাম্প্রদায়িক পার্থক্য এখানে অপ্রাসঙ্গিক। বৌদ্ধ, জৈনর মত বেদবিরোধী বা বর্ণসমাজের বাইরের জনজাতিগুলোর যাবতীয় বৈচিত্র ও বিভেদ মুছে দিয়ে তাদের হিন্দুজাতির অংশ দাবি করা চলে, কিন্তু মুসলিম বা খ্রিষ্টানরা নিশ্চিত ভাবেই এই জাতীয়তাবাদের বাইরে, তারা বিপজ্জনক-অপর। কারণ তাদের উদ্ভব ভারতের ভৌগোলিক সীমানার বাইরে। জাতীয়তাবাদীদের কাছে প্রাচীন ভারত হয়ে উঠল ক্লাসিকাল আদর্শ। প্রাচীন ও বর্তমানের মধ্যবর্তী সময়কাল (মুসলিম শাসন) হল অন্ধকারাচ্ছন্ন মধ্যযুগ ঠিক যে ছকে, প্রাচীন গ্রিসের ধ্রুপদী ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার মাথায় নিয়ে এগিয়েছে ইউরোপীয় ইতিহাসের আখ্যান। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'আত্মপরিচয়' প্রবন্ধে হিন্দুত্বকে হিন্দুসমাজের 'আইডিয়া' বা 'মানসরূপ' হিসাবে দেখেছেন, আচার বা ধর্মমতের লক্ষণ দিয়ে যার ব্যাপ্তি বিচার করা চলে না। কারণ হিন্দু কে তার যে উত্তরই দেওয়া হোক না কেন বিশাল হিন্দুসমাজের কোথাও না কোথাও তার প্রতিবাদ আছে।[15] সতেরো শতক অবধি ভারতবর্ষের ইতিহাসে এর প্রমাণ রয়েছে। পরেও বহু অরণ্য জাতি হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। রোমিলা থাপার তাঁর 'Ancient Indian Social History: Some Interpretations'-এ নানা প্রমাণ দিয়ে দেখিয়েছেন বিভিন্ন পন্থায় হিন্দুরা অপরকে আত্মীকৃত/ আত্মস্যাৎ করে নিত। শক, হূন, যবন প্রভৃতি বহিরাগতদেরও ব্রাহ্মণ্য জাতিপ্রথার অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয়।[16] বহুধাবিভক্ত ভারতীয় কাঠামোয় সামাজিক চলিষ্ণুতা বজায় রাখার এটাই ছিল সম্ভবত ফলপ্রসূ উপায়। পরমত সহিষ্ণুতা ও অপরকে আত্মজ্ঞানে স্বীকার করে নেওয়া এই সমাজব্যবস্থার অন্যতম চরিত্র লক্ষণ। এই

---

15 রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আত্মপরিচয়', *রবীন্দ্ররচনাবলী, শতবার্ষিক সংস্করণ,* ১৩ম খন্ড, (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৬১), পৃ. ১৭৬।

16 Romila Thapar, 'Ancient India social History Some Interpretation', উদ্ধৃত করা হয়েছে *স্বাধীনতার মুখ* গ্রন্থে, অমলেশ ত্রিপাঠী, (কলকাতা: আনন্দ, ২০১০), পৃ. ১৭৯।

ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এখানকার 'নেশন'-র ধারণা, যা মূলগত ভাবেই বহুস্বর, সমসত্ত্ব (homogeneous) নয়। বেনেডিক্ট অ্যান্ডারসন আধুনিক 'নেশন'-কে ব্যাখ্যা করেছেন 'an imagined political community' বলে, যার বসত একটি 'একমাত্রিক শূণ্য সময়ে' ('homogenous empty time')। এই ধারণা নির্মীত হয় বিভিন্ন রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক যন্ত্রাবলীর মাধ্যমে, যেমন মুদ্রণ-পুঁজিবাদ, মানচিত্র, মিউজিয়ম বা সেনসাস ইত্যাদি।[17] আধুনিক ভারতীয় নেশনের নির্মাণেও এই ব্যাখ্যা যথেষ্ট ফলপ্রসূ সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রাক-ঔপনিবেশিক ভারতীয় সভ্যতার গ্রহিষ্ণু-সহিষ্ণু-চলিষ্ণু চরিত্র এবং তার বহুমাত্রিক রাষ্ট্র-ভাবনাকে এই কাঠামোর মধ্যে এঁটে দেওয়া মুশকিল। গান্ধী রবীন্দ্রনাথের স্টেট-বিরোধিতায় পার্থক্য থাকলেও এটুকু জোরের সঙ্গে বলা যায় ইউরোপের অনুকরণে রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা আর ন্যাশানালিজমের বিকল্প মডেলের কথা তাঁরা বলেছিলেন। তাঁরা ছিলেন ব্রিটিশ-বাহিত আধুনিকতার কড়া সমালোচক। তৎকালীন জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের মধ্যেও ন্যাশনালিজম এর অনেকান্তিক ধারণা পাওয়া যায় (যদিও প্রায় সকলেই কোন না কোন সময়ে কংগ্রেস নামক প্লাটফর্মটি ব্যবহার করেছেন)। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী থেকে ভূদেব মুখোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন দাশ, শরৎচন্দ্র বসু সকলের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও তাঁরা কেউই centralization of power এর পক্ষপাতী ছিলেন না। বরং 'নেশন'-র ধারণা ছিল অন্তত যুক্তরাষ্ট্রীয় (federal)। উগ্রহিন্দুত্ববাদী জাতীয়তা বা ঘৃণার রাজনীতি তাঁদের নেশনের ধারণাকে আচ্ছন্ন করেনি। এমনকি বাল গঙ্গাধর তিলকও সাভারকর বা গোলওয়ালকরের মতো হিন্দু রাষ্ট্র চাননি। বিপিন পাল composite nationalism-র উল্লেখ করেছেন।

---

[17] Anderson, B. *Imagined communities: Reflections on the origin and Spread of Nationalism.* (London: Verso, 1983).

ভারতীয় (হিন্দু) জাতীয়তাবাদের বহুস্বর-বহুমাত্রিক পরিসরে 'ভারতমাতা'-র ধারণাটি আলোচনা করা প্রয়োজন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কিরণ চন্দ্র ব্যানার্জ্জী এবং শিশির কুমার ঘোষ পরিচালিত একটি নাটিকায় ১৮৭৩ সালে প্রথম ভারতমাতার কনসেপ্ট জনসাধারণের সামনে আসে। এরপর বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ' উপন্যাস ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জল রং এ আঁকা বিখ্যাত ছবিটাকে কেন্দ্র করে ভারতমাতার ধারণা পূর্ণতা পায়। বলা বাহুল্য বঙ্কিম ও অবনীন্দ্রনাথের ভারতমাতার ধারণায় যথেষ্ট পার্থক্য আছে। বঙ্কিমের ভারতমাতার কল্পনায় ছেয়ে আছে হিন্দু-পৌরাণিক দেবীর আবেশ – কালি ও দূর্গা। অবনীন্দ্রনাথের ছবিতেই প্রথম যেন একটি ভৌগোলিক পরিচিতির সঙ্গে মাতৃ-সাধনা সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। ভারতমাতা হয়ে ওঠে বঙ্গমাতার সমার্থক। এরপর থেকে নানা রূপে ভারতমাতা উপস্থাপিত হয়েছে, এমন কি ভারত-মানচিত্রের মধ্যমণি হিসেবেও। চরমপন্থী হিন্দুজাতীয়তার অন্যতম অনুপ্রেরণা হয়ে ওঠে এই কল্পিত দেশমাতৃকা। কিন্তু এই কল্পনাতেও বৈচিত্রের উপাদান ছিল। অরবিন্দ ঘোষের মতো চরমপন্থী নেতা (পরবর্তী কালে হিন্দুধর্ম ও বৈদিক দর্শনের অন্যতম উদ্গাতা ও ব্যাখ্যাতা) ১৩২৭ বঙ্গাব্দে ভারতমাতা প্রসঙ্গে লিখছেন, 'ভারতমাতার অখণ্ডমূর্তী এখনও প্রকাশ হয়নি... আমাদের রাজনীতিবিদগণ মায়ের সম্পূর্ণ স্বরূপ দর্শন দিতে অসমর্থ ছিলেন। রণজিৎ সিংহ বা গুরুগোবিন্দ ভারতমাতা না দেখিয়া পঞ্চনদমাতা দেখিয়াছিলেন। শিবাজি ও বাজিরাও ভারতমাতা না দেখিয়া হিন্দুমাতা দেখিয়াছিলেন'।[18]

ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক চিন্তায় একেবারে প্রথম থেকেই লিঙ্গভেদের বিষয়টি ছিল। ভারতীয় সমাজকে মনে করা হত অযৌক্তিক-শিশুসুলভ-মেয়েলিপনায় ভরা, যা ঔপনিবেশিক পৌরুষের বিরোধী। ভারতীয়দের এই পৌরুষহীন স্বভাবকেই পরাধীনতার

[18] শ্রী অরবিন্দ, *ধর্ম্ম ও জাতীয়তা,* (পন্ডিচেরী: শ্রী অরবিন্দ আশ্রম, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৮২।

জন্য দায়ী করা হত। জেমস মিলের মত পাশ্চাত্য পর্যবেক্ষকরা ভারতীয় সভ্যতার সমালোচনায় নারীদের বিষয়টিকে ব্যবহার করেন। ভারতের নারীদের অধঃপতিত অবস্থাকে তুলে ধরে প্রমাণের চেষ্টা করা হয় যে অন্যান্য সভ্যতার তুলনায় ভারতের স্থান কতটা নিচুতে। ফলত উনিশ শতকের সমাজসংস্কারক বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের কর্মসূচীতে নারীর মর্যাদা রক্ষা করাই প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে। ১৮৮০-র পরবর্তী পর্যায়ে 'দেশপ্রেম' বিষয়টি বাংলা সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে। স্বভাবতই এক্ষেত্রেও নারীদের বিষয়ে পুর্বনির্ধারিত ধারণাটি কার্যকর ছিল— সাহিত্যের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে 'নারী' যার মধ্যে দেশমাতৃকার ধারণা একাত্ম হয়ে যায়। দেশের জন্য দায়িত্ব, কর্তব্যের পাশাপাশি স্বয়ং দেশমাতা হিসেবেও নারীর কল্পনা পুনর্নির্মিত হয়। নারী সংক্রান্ত আলোচনায় এই নতুন ভাবনার জন্ম হয়েছিল এক 'পবিত্র' জাতীয়তাবাদী চেতনার আধারে।

অধ্যাপক তনিকা সরকার ভারতমাতার প্রজেক্টটিকে 'Nationalist cultural artefact' হিসেবে দেখেছেন।[19] অধ্যাপক সরকার দেখিয়েছেন 'দেশ' এখানে কোনও ভৌগোলিক অবস্থান বা ভূখণ্ড নয়, যেখানে মানুষ বসবাস করে, বরং মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন করে 'দেশ' নামক বিমূর্তকে দেবীমাতৃকা (Mother Goddess)–র সঙ্গে একাত্ম করা হয়েছে। 'মা' এখানে মৃন্ময়ী (personified), যিনি হলেন সবথেকে নতুন অথচ সর্বাপেক্ষা পবিত্র ও শক্তিশালী দেবী, তিনিই 'দেশমাতৃকা'। দেশের উপর দেবীত্ব আরোপের প্রক্রিয়ার সঙ্গে অতি অবশ্যই 'সন্তানদের' (এখানে দেশবাসী) প্রস্তুত হওয়ার প্রক্রিয়াটাও যুক্ত। 'পুরুষসিংহ সুলভ' শৌর্য-বীর্যের বিরুদ্ধে 'মেয়েলি' বাঙালিবাবুর

[19] Tanika Sarkar, Nationalist Iconography: Image of women in nineteenth century Bengali Literature. (*Economic and Political Weekly*, 21 Nov, 1987, 22 (47):) p. 2011-15.

জাতীয়তাবাদের প্রতীক হয়ে উঠল 'ভারতমাতা'। অধ্যাপক সরকার মনে করেন এভাবেই সাম্রাজ্যবাদ ভারতবাসীকে নতুন দেবীর কল্পনা উপহার দিল।[20]

বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি-ধর্মে বহু ধরনের বৈচিত্রময় মাতৃদেবীর কল্পনার ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। ফলত জাতীয়তাবাদের প্রতীক হিসাবে মাতৃশক্তির আরাধনার বিষয়টি সহজ হয়েছিল। বলা যেতে পারে বেনেডিক্ট অ্যান্ডারসনের 'একমাত্রিক শূণ্য সময়ে' জাতীয়তাবাদ তার 'বিষয়ী'-কে নির্মাণ করছে দুটি শব্দের মধ্যে দিয়ে – আত্মীয়তা (kinship) এবং ঘর বা বাসভূমি (homeland)। দুটো ইডিয়মের অভিমুখই এক দিকে যেখানে রাষ্ট্রের সঙ্গে বিষয়ীর (দেশবাসীর) স্বাভাবিক বন্ধন আছে। কারণ সকলেই মায়ের সন্তান আর ঘরের ভেতর তো মায়েরই সর্বময় অস্তিত্ব।[21] তাই সন্তানদের একান্ত কর্তব্য মাকে রক্ষা করা। কিন্তু বলাবাহুল্য এখানে সন্তান বলতে আবশ্যিক ভাবেই পুরুষ সন্তানকে বোঝানো হচ্ছে, সেখানে মায়ের সঙ্গে মেয়ের সম্পর্কের কোন স্থান নেই (চারণকবি মুকুন্দ দাসের গানে বা বঙ্গভঙ্গের সময়কার অন্যান্য কিছু রচনায় মেয়েদের দেশমাতার জন্য জীবন উৎসর্গের কথা বলা হলেও সামগ্রিক বিচারে মেয়েরা এই পরিসরের বাইরেই ছিল)। কারণ মেয়ে অর্থাৎ নারী তো নিজেই স্বয়ং দেশমাতৃকা। তনিকা সরকার দেখিয়েছেন পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের জন্য একদিকে যেমন কালি করালবদনীর কল্পনা করা হছে, যিনি অশুভ শক্তির বিনাশ করেন, অন্যদিকে দুষ্টের দমনের পর সেই মাতাই আবার হয়ে উঠবেন দেবী দূর্গা, যিনি অসুরদলনী হলেও দয়াময়ী জগজ্জননী, সব কিছুর উর্দ্ধে তিনি আবার শান্ত ঘরোয়া সর্বংসহা টিপিক্যাল বাঙালী মা।[22] অবনীন্দ্রনাথের 'ভারতমাতা' ছবিটিতেও এই ভাবই ফুটে উঠেছে বলে

[20] তদেব।

[21] তদেব।

[22] তদেব।

তিনি মনে করেন, মা এখানে মলিন, ক্রন্দনরত পরাধীন। যশোধরা বাগচিও মনে করেন মাতৃত্বের এই ভাবাদর্শ "নারীদের শক্তি ও ক্ষমতা সম্পর্কে কল্পকাহিনি সৃষ্টি করে" তাদের প্রকৃত শক্তিকে হ্রাস করে দেয়, তাদের বিশেষভাবে প্রজননের ভূমিকায় সীমাবদ্ধ রাখে এবং এই ভাবেই তাদের শিক্ষা ও পেশাগত অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয় অথবা ভিন্নভাবে বলা চলে তাদের প্রকৃত শক্তিশালী হবার পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়।[23] সুগত বসু এই বক্তব্যের বিরোধিতা করে বলেছেন ভারতমাতা কোন 'রেসিয়াল কনস্ট্রাকশন' নয়, তা সুপ্রাচীন চলিষ্ণু হিন্দু ঐতিহ্যের স্বাভাবিক প্রকাশ যেখানে পৃথ্বীকে মা হিসেবে কল্পনা করা হত। এই কল্পনা বিমূর্ত নয় বরং তা প্রতিদিনের যাপনের সঙ্গে গভীর ভাবে সম্পৃক্ত। দেশকে মা হিসেবে কল্পনা করার পরিসরটিও স্থানু নয়, তা চলিষ্ণু ও বিবর্তনশীল।[24] বৈদিক দর্শনে প্রকৃতি-পুরুষের সম্পর্ককে দ্বন্দ্বমূলক (বিরোধ ও মিলন উভয়ার্থে) এবং পরিবর্ত-সম্পর্কে (inter-exchangeable) জড়িত বলে মনে করা হয়। যেকোন সৃষ্টির মূলেই শক্তির প্রয়োজন। প্রকৃতির অর্থ সেখানে প্রকাশ, সে কোন জড়বস্তু নয়। যদিও নারীকে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম করে ভাবার প্রক্রিয়াটিও পিতৃতান্ত্রিক নির্মাণ এবং জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক পরিসরে পুরুষতান্ত্রিকতা এই বহুমাত্রিক দার্শনিক ভিত্তি থেকে সরে এসে ধারণাটিকে নিজের মত ব্যবহার করেছিল, যা নিঃসন্দেহে লিঙ্গায়িত।

---

[23] Bagchi, Yashodhara. Representing nationalism: Ideology of motherhood in colonial Bengal. (*Economic and Political weekly*, Oct 20-27, 1990), WS- 65-71.

[24] Bose, Sugata. Nation as mother: Representations and contestations of 'India' in Bengaliliterature and culture. *In Nationalism, Democracy and Development: State and Politics in India*, ed. S. Bose and A. Jalal, (Delhi: OUP, 1997), p. 50-75.

এই বিতর্কে সহজ মীমাংসায় আসা সম্ভব বা কাঙ্ক্ষিত নয়, বরং পরিসরটির বহুমাত্রিক উপাদান সম্পর্কে সচেতন থাকা প্রয়োজন। কেননা একাধারে ইউরোপিয় রাষ্ট্রকেন্দ্রিক চিন্তা ও ব্রিটিশ-বিরোধী জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের বাইরে থেকে গেছে ভারতীয় উপমহাদেশের জাতীয়তার অসংখ্য অশ্রুত কণ্ঠস্বর। ভারতমাতা কল্পনার পরিসরটিও একমাত্রিক বা সমসত্ত্ব নয়। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী ঔপনিবেশিক ভারতীয় নেশনকে বর্ণনা করেছিলেন 'A nation in making' বলে। স্বভাবতই ভারতবর্ষের বৈচিত্রময়তার মধ্যে নেশনের নির্মীয়মান প্রক্রিয়ার পাশাপাশি ভারতমাতার ধারণাও একমাত্রিক হতে পারে না। ভারতীয় সনাতন সমাজ বা ঔপনিবেশিক জাতীয়তাবাদের বহুমুখীনতা নিয়ে এত কথা বলার পর এ বিষয়ে অবশ্যই সচেতন থাকা প্রয়োজন যে এই বহুত্ব অনেকাংশে দর্শনগত ও বিশাল জনগোষ্ঠীর আচার আচরণের মধ্যে নিহিত। মূলধারার রাজনৈতিক পরিসরে সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজ সম্পূর্ণ উদাসীনভাবে যে সংস্কৃতি রচনা করে চলেছে সেই সমসত্ত্ব (homogenized) সংস্কৃতিই প্রান্তিক ও অহিন্দু সংস্কৃতিগুলিকে গ্রাস করে চলেছে। উপনিবেশ বিরোধী সংগ্রামে কংগ্রেসি মডেলের আধিপত্যে চাপা পড়ে গেছে অপরাপর সম্ভাবনা (জাতীয়তা বা ব্রিটিশ-বিরোধিতা থেকে স্বেচ্ছায় দূরে সরে থাকা বা থাকতে বাধ্য হওয়া কণ্ঠস্বরগুলোকে না হয় এই আলোচনায় বাদই রাখলাম)। রাজনৈতিক হিন্দুত্ববাদীদের কাছে হিন্দু কোন বিশেষ ধর্ম নয়, এটি একটি সাংস্কৃতিক আদর্শ যা ভূভারতে ব্যাপ্ত। আর এই সাংস্কৃতিক আদর্শই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি, যাকে প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব ভারত-রাষ্ট্রের। আর এই দায়িত্ব পালনের জন্য রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের নিয়ন্তারা নির্মাণ করে নিয়েছে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উপযোগী এক সমস্বর ও সমসত্ত্ব অতীতের ধারণা।[25] যেখানে প্রয়োজন মত কেটেছেঁটে

[25] পার্থ চট্টোপাধ্যায়, 'রাবীন্দ্রিক নেশন কি?', *প্রজা ও তন্ত্র*, (কলকাতা: অনুষ্টুপ, ২০০৮), পৃ. ৭৮-৭৯।

এঁটে দেওয়া যায় বেদ থেকে রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, আম্বেদকর এমনকি ভগৎ সিং-কেও। তারা দেশপ্রেমের পরাকাষ্ঠা হিসেবে নিজেদের প্রকাশ করছে আর তার অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে 'ভারতমাতার' ধারণাটি। বলা বাহুল্য তাদের ধারণার পরিসরটির মোটেও বহুমাত্রিক নয় বরং ক্রমশ 'ভারতমাতার' ধরনাটি হয়ে উঠেছে আগ্রাসী পিতৃ/পুরুষতন্ত্রের নির্মাণ যেখানে বিকল্পের কোন স্থান নেই। যে পরিসরে ভারতমাতা থেকে শুরু করে বাহির-অন্দরের যে কোনও নারীকেই নিয়ন্ত্রিত এবং প্রয়োজনে বশীভূত থাকতে হবে রাষ্ট্রের স্বার্থে। নারীর শরীর ও যৌনতার নিয়ন্ত্রণ ও নির্মাণ জাতীয়তাবাদী প্রকল্পের অংশ হয়ে উঠেছিল। সাহিত্য ছিল এই প্রকল্পের অন্যতম প্রয়োগস্থল— 'In the 1920's and 1930's certain patterns of propaganda and identity formation were established by Hindu publicists… ।'[26]

উপরোক্ত ধারণা, রূপকল্প ও বর্গগুলির নিরিখে সাহিত্যক্ষেত্রে আধুনিকতা ও আধুনিকতাবাদের বিকাশের পর্যায়গুলি বিচার করা দরকার। সাহিত্যের পরিসরটিও কালিক এবং ঐতিহাসিক, রূপান্তরের চেহারা সেখানেও পরিস্ফূট। রজতকান্ত রায় মনে করেন ঐতিহ্যবাদী এবং সংস্কারপন্থীদের লড়াইয়ের পরিসরের বাইরে থেকে গিয়েছে নারী-পুরুষের আবেগের বৃত্তটি। যার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে একমাত্র সাহিত্যে, 'the flow of emotions leaves its clearest imprint in literature, confidential diaries and personal letters',[27] এবং আবেগ নিয়ে ঐতিহাসিক আলোচনা প্রায় হয়নি বললেই চলে। তিনি পাশ্চাত্যের প্রভাবের ক্ষেত্রে অন্দর-বাহির পরিসরের সমান্তরালে আবেগ-মনন (যুক্তি)— এই দুটি ভেদ করেছেন। তার মতে পাশ্চাত্যের যা

---

[26] Charu Gupta, *Sexuality, Obscenity, Community: Women, Muslims and the Hindu Public in Colonial India*, (New Delhi: Permanent Black), 2005, 4.

[27] Rajat Kanta Ray, *Exploring Emotional History: Gender, Mentality and Literature in the Indian Awakening*, (New Delhi: Oxford University Press), 2003, 37.

কিছু প্রভাব তা বহির্জগতে যুক্তি-বুদ্ধির স্তরে কাজ করলেও, আবেগের পরিসরে দেশীয় ঐতিহ্যের ধারা বহমান ছিল। অন্যদিকে চারু গুপ্তা দাবী করেছেন 'অন্দর' এবং 'বাহির' বলে দুটি পৃথক পরিসর কখনওই ছিল না – যদিও হিন্দুত্বের দৃঢ় ঘোষনার জন্য পারিবারিক পরিসরের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম, তা সত্ত্বেও প্রকাশকরা ঐতিহাসিকদের মতো সেটাকে পৃথক বর্গ হিসাবে ভাবেননি। চারুর মতে যেকোনো স্থানিক ও রাজনৈতিক চর্চার মধ্যেই বিবিধ এবং বহুসত্ত্ব পরিসর বা বর্গ থাকে আর সেই বর্গগুলি কাঠামোগতভাবেই অস্থির। ফলত বলা যায় নারীত্বের নতুন আদর্শ সমস্ত বর্গ ও স্তরে এবং সর্বক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল ছিল এবং তা বর্গগুলির মধ্যে সুস্পষ্ট সীমারেখাকে অস্বীকার করেছিল; কারণ প্রকৃতপক্ষে সীমারেখাগুলিই ছিল অস্পষ্ট। ব্যক্তিগত ও অন্দরের সমস্যা এবং প্রশ্নগুলি আলোচিত হতে থাকে প্রকাশ্যে, জনপরিসরে, '... intervening in the law, the marketplace, the railway station, the press and print, attempting as we have seen to reform both the "private" and the "public"'।[28] বলাই বাহুল্য এই চিন্তা কাঠামোর এক ধরণের প্রকাশ ঘটেছে সক্রিয় রাজনীতিতে। একটু অন্যভাবে এই মনোভাবেরই প্রকাশ ঘটেছে সাহিত্যে। প্রসঙ্গত রজত রায়ের একটি কথা উল্লেখ করা চলে, 'There were not a single major novelist in Bengle, male or female, who was not an nationalist'।[29] পাশ্চাত্যের শাসনের অধীনে ক্রমশ ব্যক্তিত্ব পক্ষপাতদুষ্ট হওয়ার বদলে চ্যালেঞ্জের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া তৈরি হল। ঔপনিবেশিক বাংলায় আত্মবিশ্বাসের জন্য লড়াই এবং ক্রমোচ্চ শ্রেণিবিভাগ (hierarchy) ও পিতৃতান্ত্রিক নিদানের বিরুদ্ধে ন্যায় ও যুক্তির জন্য লড়াইয়ের প্রকাশযুক্ত উপন্যাসগুলিতে নতুন ভাবমূর্তী তৈরি হয়েছিল নারীত্ব ও

[28] Gupta, 2005, 123-124.

[29] Ray, 2003, 73.

পুরুষুত্বের।[30] রজতকান্ত রায়ের মতে 'মার্ক্সিয় ও উত্তর-আধুনিক যাবতীয় চিন্তাবিদই, পক্ষে বা বিপক্ষে উভয়েই, এই আন্দোলনকে পাশ্চাত্যের প্রভাব (সদ্যর্থক বা নঞর্থক যাই হোক না কেন) এবং ভারতীয়দের জবাব (বিশুদ্ধ বা বিকৃত যাই হোক না কেন)-এর নিরিখেই বিচার করেছেন'। আর এই 'চ্যালেঞ্জ-রেসপন্স'-এর কাঠামো বৌদ্ধিক ইতিহাসচর্চার জন্য উপযোগী হলেও কিন্তু মনস্তত্ত্বগত বা আবেগের ইতিহাস রচনার জন্য নয়। তার জন্য আলাদা কাঠামো প্রয়োজন। আর উপন্যাস নিজেই সেই দুনিয়ায় প্রবেশের ছাড়পত্র।[31] এখানে প্রশ্ন ওঠে ব্যক্তিগত ইতিহাসে আদৌ কি ঐতিহাসিক প্রবেশ করতে পারে? আসলে তো পেতে পারে একটি সামাজিক ছবি। ব্যক্তিগত ধরা পড়ে সাহিত্যের আঙিনায়, সেই কারণেই আগের যুগের কোনো আবেগমোথিত ব্যক্তিগত-র কাছে পৌঁছানোর জন্য সাহিত্যই অন্যতম প্রবেশদ্বার। তবে আবেগও কেবলমাত্র ব্যক্তিগত বা আন্তর্ব্যক্তিক হয় না। সামাজিক আবেগও হয়। বহু-র আবেগ মিলে জন্ম হয় বড় আবেগের, আবার সেই বড় আবেগই প্রভাবিত করে ব্যক্তিকে। এটি একটি জটিল, বহুমাত্রিক এবং অন্ততপক্ষে দ্বিমুখী প্রক্রিয়া। সবসময় যা উচ্চারিত হচ্ছে তাই একমাত্র সত্য, সেটা হয় না। অনুচ্চারণ ও নিঃশব্দেরও বিশ্লেষণ প্রয়োজন। বিশ্লেষণ ও পার্থক্য নির্ধারণের জন্যই দরকার সমালোচনাত্মক মন ও মনন। সেই কারণেই বৌদ্ধিক (intellectual) এবং আবেগের (emontional) ইতিহাসচর্চা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। অন্যদিকে আবার সাহিত্যিকও সমাজবদ্ধ জীব। সামাজিক আবেগের সঙ্গেও আছে তার দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক – সেই দিকটাও ভুলে গেলে চলবে না। একই রকমভাবে ঐতিহাসিক যে সৃষ্টিশীল কাহিনিগুলির ভিতর থেকে খুঁড়ে বের করতে চাইছেন ঐতিহাসিক সত্য, তার মধ্যেও কিন্তু সমসময়ের প্রভাব থাকতে

[30] Ray, 2003, 73.

[31] Ray, 2003, 68.

বাধ্য। যুগের দেখা কিন্তু ঐতিহাসিকের দেখাকেও প্রভাবিত করে। রজত রায় মার্ক্সীয় এবং উত্তর-আধুনিক দেখা-কে সমালোচনা করেছেন, তার যাথার্থ অস্বীকার না করেই বলছি, তাঁর দৃষ্টিকোণের মধ্যেও নিহিত থাকতে পারে পক্ষপাত – তা সে ইতিহাসচর্চার কোনও একটি বিশেষ ঘরানাগত পক্ষপাত হতে পারে বা লিঙ্গ-সচেতনতা বিষয়ক। তাই উল্লেখ করা হয়েছে, যেকোনো আপাত নিরপেক্ষ ধারণাকেই সমস্যায়িত (problematize) করতে হবে, হতে হবে সদ্যর্থকভাবে সমালোচনাত্মক (আক্রমণাত্মকের বিপ্রতীপে)। কারণ শব্দের আক্ষরিক কিম্বা পরম অর্থ হয় না, শব্দের জাত্যর্থ (connotation) স্থান-কাল-পাত্র নির্ভর। শব্দের (signifier) সঙ্গে তার অর্থের (signified) সম্পর্ক আপেক্ষিক। সুতরাং সাহিত্যের আঙিনা রাজনৈতিক আধুনিকতার ধারণাগুলির বাইরে অথবা বিচ্ছিন্ন এই কথা বলা যায় না। যার মধ্যে আছে পাশ্চাত্য ধ্যান ধারণার প্রতি সচেতন আকাঙ্ক্ষা, গ্রহণ, বর্জন, সংমিশ্রণ, আত্মীকরণ – সবকিছুই।

এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিকোণ পাওয়া যায় দীপেশ চক্রবর্তীর বাঙালি বিধবা সংক্রান্ত আলোচনায়। ঔপনিবেশিক বাংলায় নারীর যাপনের উপর গুরুত্ব স্থাপন এবং সেগুলি লিপিবদ্ধ করার প্রেক্ষাপট: বিষয় কিম্বা বিষয়ী হিসাবে 'বিধবা-নারী'-র জন্ম আধুনিক সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিসর।[32] কল্যাণী দত্ত গবেষণা করেছেন বাংলার বিধবাদের জীবনযাপন নিয়ে। ১৯৫০-এর পর থেকে তিনি নিজ উদ্যোগে সংগ্রহ করেছেন বিধবা জীবনের অত্যাচারিত হওয়ার এবং প্রান্তিক হয়ে থাকার কাহিনিগুলি। বিধবাদের নিজের মুখে বলা আখ্যানের (যেগুলি তিনি সংগ্রহ করেছিলেন নানান ঘরোয়া সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে) পুনরুপস্থাপনা করেছেন তাঁর প্রবন্ধে। সম্পূর্ণভাবে আর্থিক এবং অন্য কোনো ধরণের সাহায্য ছাড়া শুধুমাত্র নিজের উদ্যোগে এই বিপুল কাজের দায়িত্ব

[32] Chakrabarty, 2000, 115-117.

তুলে নেওয়ার মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে যন্ত্রণাকে প্রত্যক্ষ ও নথিবদ্ধ করার তীব্র আকুতি। বিগত একশ বছরের বেশি সময়কাল ধরেই ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনস্থ আধুনিকতার একটি অংশ ছিল বিধবাদের দুঃখ দুর্দশার কথা জানা ও তাকে নথিবদ্ধ করতে চাওয়ার আকাঙ্ক্ষা।[33] বিধবার দুর্দিশা নথিভূক্তকরণের আকাঙ্ক্ষার ভিতরে নিহিত থাকে উচ্চবর্ণের হিন্দু পরিবারগুলির বিধবা মেয়েদের দুর্দশার একটি সাধারণ চরিত্র। এই চরিত্রটি নিজেই অপেক্ষাকৃত আধুনিক বিমূর্ত নির্মাণ। দীপেশের মতে স্মরণাতীত সময়কাল থেকেই বিধবাদের জীবন (এবং যৌনতা) নিয়ন্ত্রণের তাগিদে বিভিন্ন ক্ষতিকর প্রথা চালু ছিল এবং তাদের জীবন দুর্বিষহ অবস্থাতেই অতিবাহিত হত। কিন্তু তাদের কাহিনি গ্রন্থিবদ্ধ করার এবং তাদের বিশেষ একটি চরিত্র হিসাবে তুলে ধরার এই প্রবণতা হল নতুন, যা আধুনিকতার প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত। দীপেশ চক্রবর্তী মধ্যবিত্তের পড়ার অভ্যাস, সাহিত্য, এবং নতুন ধরণের ব্যক্তিসত্ত্বা বা ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠার মধ্যে ঘনিষ্ট যোগসূত্রের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।[34] বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পড়ার অভ্যাস, পাঠ ও পাঠকের আন্তঃসম্পর্ক নিয়ে নতুন করে ভাবার আছে। কারণ মার্গ সাহিত্য এবং তার পাঠক ও সমালোচকরা অধিকাংশ সময়ে জনপ্রিয় সাহিত্য এবং তার জনতা-পাঠককে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে এসেছে। দীপেশ মনে করেন পাশ্চাত্যের মতো এখানে প্রজা-বিষয়ী ও কৌম-বিষয়ী এই দুই সত্ত্বা অতটাও নিখুঁতভাবে পৃথক নয়। তাই আধুনিক বাঙালি বিষয়ীর ধারণা তৈরি করা যেতে পারে একটি চলমান বিন্দু হিসাবে, ক্রমাগত বদল হতে থাকা কোনো অবস্থান-নির্ভর, যেখানে বিভিন্ন বিষয়ী অবস্থান, এমনকি অ-বুর্জোয়া, অ-ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী বিষয়ীর প্রতিচ্ছেদ (intersection)

[33] Chakrabarty, 2000, 117.

[34] Chakrabarty, 2000, 115-118.

থাকতে পারে।[35] সুতরাং আধুনিক সাহিত্য হল সম্প্রসারিত জ্ঞাতিত্বের পাশাপাশি আধুনিক বিষয়ীর জন্য গণ-পরিসরের আগমনের পথ করে দেওয়া। জনজীবনে এমন একটি পরিসরের উন্মোচন করা যেখানে ব্যক্তিমানুষের অধিকার সম্বলিত ধারণা ও আইনের হস্তক্ষেপ সম্ভব হবে। তাই যন্ত্রণাকে প্রত্যক্ষ করার অর্থ এখানে সামাজিক ন্যায়ের সাপেক্ষে আরও বেশি আধুনিক, পৌর ও মানবিক হয়ে ওঠার প্রচেষ্টা।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা পাশ্চাত্য সম্পর্কে মনোভাবে নিশ্চিতভাবেই পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। ঔপনিবেশিক প্রভূর দ্বৈতসত্ত্বা সামনে এসেছিল। যান্ত্রিক অগ্রগতি ও বস্তুবাদ সম্পর্কে বিশ্লেষণী মনোভাবের পরিসর তৈরি হয়েছিল। মহাযুদ্ধের পরে শিল্পী সাহিত্যিকরা সমন্বয়ের তাগিদ অনুভব করলেন, '...reconcile borrowed and inherited elements'।[36] অ-পাশ্চাত্য দেশগুলির অভিজ্ঞতা বিচার ও বোঝার ক্ষেত্রে ইওরোপিয় ধারণাগুলি যেমন অপরিহার্য তেমনি অপর্যাপ্ত বা অনুপযুক্ত এই সচেতনতা ভ্রূণাকারে হলেও জন্ম নিয়েছিল বিংশ শতকে।[37] বারবার ধারণাগুলিকে সমস্যায়িত করার কথা উল্লেখ করার অর্থ এই নয় যে আমি সমাজ বিজ্ঞানের এই বর্গগুলিকে বাতিল করার কথা বলছি, বরং '...to release into the space occupied by particular European histories sedimented in them other normative and theoretical thought enshrined in other existing life practices and their archives'। একমাত্র এই পথেই আমরা বহুত্বময় মান্যতার দিগন্ত তৈরি করতে পারব, যা বিশেষভাবে আমাদের অস্তিত্ব-নির্দিষ্ট (existence specific) এবং

[35] Chakrabarty, 2000, 140.

[36] Chakrabarty, 2000, 46.

[37] Chakrabarty, 2000, 16.

আমাদের জীবন ও তার সম্ভবনাকে বিচার করার উপযোগী।[38] এখানে 'আমাদের' বলতে বহুত্বকে বোঝানো হচ্ছে। তাই এমন একটি পরিসর এবং দৃষ্টিকোণ তৈরি করার কথা হচ্ছে যেখানে বা যেখান থেকে বহুত্বকে বোঝা সম্ভব, বহুত্বের বিকাশ হওয়া সম্ভব। আর এই কাজে প্রতীকী অগ্রদূত হিসাবে আমি চিহ্নিত করেছি নারীকে, প্রসারিত অর্থে। আর এই দেখার ঝোঁক থেকেই আমি বিচার করবো তৎকালীন লিঙ্গ-সম্পর্ককে।

বাংলা মনন এবং সাহিত্যের পরিসরটিও বহুত্বময়, কেন্দ্রের একমাত্রিক নির্মাণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে তার মোকাবিলার প্রক্রিয়াও জটিল। সাহিত্যে জাতীয়তাবাদ বা জাতীয়তাবাদের হিন্দুয়ানা এবং এক-রাষ্ট্রের ধারণার একমাত্রিকতার বিপরীত দৃষ্টান্ত হিসাবে ১৯৩১ সালে বিনয় সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতা 'বাঙালি, ভারত ও দুনিয়া'-র কথা উল্লেখ করা যায়। *বিনয় সরকারের বৈঠকে* সংকলনের 'বাঙালির স্বাতন্ত্র' নামক সাক্ষাৎকারে উক্ত বক্তৃতার প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। সরকার দ্বিধাহীন ভাষায় তথাকথিক জাতীয়/রাষ্ট্রিক ঐক্যের বিরোধিতা করেছেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সঙ্গে ইওরোপের তুলনা করেছেন, যেখানে সার্বিক ঐক্য সম্ভব নয় বলে তিনি মনে করেন। '...তথা-কথিত ভারতীয় ঐক্য, ঐক্যবদ্ধ ভারত-রাষ্ট্র ইত্যাদিরূপে সম্বর্দ্ধনা করা ছেলেমানুষি'। 'বাংলাকে ভারতবর্ষের ভিতরকার স্বতন্ত্র জনপদ ভাবা উচিত। এইটাই আমি এখন জোরের সঙ্গে প্রচার করতে চাই'[39]। এই কথার মধ্যে কোনও প্রাদেশিক সংকীর্ণতা যে নেই সেটা তাঁর লেখা পড়লেই বোঝা যাবে। তিনি বাংলাকে কোনো রকমের শ্রেষ্ঠত্ব বা নেতৃত্বের স্থানে বসাতে চাননি, বরং চেয়েছিলেন বিভিন্ন প্রদেশের পারস্পরিক সহায়তামূলক সহাবস্থান। যারা ইওরোপের মতোই হবে ভারত নামক

---

[38] Chakrabarty, 2000, 20.

[39] হরিদাস মুখোপাধ্যায়, শিবচন্দ্র দত্ত, হেমেন্দ্রবিজয় সেন, ক্ষিতি মুখোপাধ্যায়, সুবোধকৃষ্ণ ঘোষাল এবং মন্মথনাথ সরকারের সঙ্গে বিনয় সরকারের কথোপকথন, *বিনয় সরকারের বৈঠকে: প্রথম ভাগ,* (কলকাতা: ছাতিম বুকস, ২০০০), পৃ. ৩২২।

একটি মহাদেশের অন্তর্গত। বাঙালি জাতীয়তার এবং সাহিত্যে বাঙালিয়ানার উত্থানের পর্ব হিসাবে ১৯২০-এর দশককে ঐতিহাসিক সব্যসাচী ভট্টাচার্য যে চিহ্নিত করেছেন, সেকথা আগেই আলোচিত হয়েছে। বাঙালিয়ানা প্রসঙ্গে বিনয় সরকারের কিছু লেখা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ 'বাঙালিয়ানা'-র নির্মাণের সঙ্গে সাহিত্য দৃঢ়ভাবে সংযুক্তই নয়, বলা ভালো সাহিত্যই তার প্রকাশ-মাধ্যম। 'গুরুসদয়ের নাচানাচি' প্রবন্ধে বিনয় সরকার সরকারী চাকরেদের কাজ ও চিন্তাকে বে-সরকারি স্বদেশীদের চিন্তার সঙ্গে একাকার করে ভাবছেন। বিষয়টি আকর্ষণীয়। এই প্রসঙ্গে উদাহরণ হিসাবে দ্বিজেন্দ্রলাল, বঙ্কিমচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, জগদীশ বোস প্রমুখের কথা উল্লেখ করেছেন যারা স্বদেশীয়ানার প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন নিজস্ব ক্ষেত্রে।[40] বাংলার বৌদ্ধিক মহল এসময় বহুবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সামিল হয়েছিল। সাহিত্যে আধুনিকতার স্বরূপ নিয়ে বিতর্কও চলেছিল দীর্ঘদিনব্যাপী। সম্ভবত আধুনিকতার স্ববিরোধের পরিসরগুলি সম্পর্কে খানিকটা সচেতনতাও এসেছিল সাহিত্যিক মহলে— প্রাত্যহিক ও নগর জীবন, ঔপনিবেশিক আধিপত্যবাদ, সামগ্রিকতা ও ইতিহাসবাদ, আধুনিক জীবনের খন্ডতা, আধুনিকতাবাদের নতুন স্থান-কাল ও কালিকতার ধারণা, পুরুষের উপর পুরুষত্ব প্রমাণের দায়িত্ব, নারী-পুরুষের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা, জাতি হিসাবে বাঙালির বৈশিষ্ট্য— সব কিছুই আলোচ্য ও বিতর্কের বিষয় হিসাবে জায়গা করে নিতে থাকে। বিনয় সরকার গুরুসদয় দত্তের 'ব্রতচারী' সম্পর্কে লিখেছেন, অ্যাথলেটিকস মানেই ইসথেটিক্স।[41] এক অর্থে 'বুড়ো বুড়িদের নাচানোর মধ্যে' বিপ্লবের ছায়া আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গুরুসদয়ের কর্মজীবন মূলত ১৯৩২-৪১। 'বাঙালির বাচ্চাকে রক্ত-মাংসের মানুষের বাচ্চায় পরিণত করা সম্ভব গুরুসহয়ের পাঁতিতে', 'গুরুসদয়ের মহিলা-সমিতিগুলায় নানা উপায়ে মেয়েদের "পুরুষ

---

40 তদেব।

41 হরিদাস মুখোপাধ্যায় এবং অন্যান্য, ২০০০, পৃ. ২৩৭।

সাম্য" কায়েম হচ্ছে' ইত্যাদি মন্তব্যের মধ্য দিয়ে তিনি পরিবর্তিত অবস্থাকে ধরতে চেয়েছেন। প্রবীন পুরুষদের নাচাতে পারাকে তিনি 'বিপ্লব' বলেও মনে করেছেন।[42] কারণ প্রবীণ পুরুষদের নাচ সেযাবৎ কাল অবধি প্রচলিত ছিল পাড়াগেঁয়ে তথাকথিত 'ছোট লোকদের সমাজে'। উকিল, ডাক্তার, ব্যারিস্টার, ম্যজিস্ট্রেট, ব্যাঙ্কার, অধ্যাপক শ্রেণির লোক নাচছে – তথাকথিত ছোটলোক/অপর-সমাজের নাচ। রায়বেঁশে, গম্ভীরা, গাজনের নাচ।[43] বাঙলিয়ানার সূত্র ধরেই নিজের চারপাশকে জানার আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ঘটেছিল সাময়িক পত্রের প্রচুর লেখালিখিতে। 'ফোক এলিমেন্ট ইন হিন্দু কালচার' বিনয় সরকারের (১৯১০-এ প্রকাশ, ১৯১৭ সনে লেখাটি পড়েছিলেন গুরুসদয় দত্ত) বইটি গুরুসদয়কে ব্রতচারীতে উৎসাহিত করেছিল।[44] 'হিন্দুধর্ম বাংলায় বিদেশী' নামক সাক্ষাৎকারে আরও মারাত্মক দাবি করেছেন বিনয় সরকার। তিনি নৃতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক নানা প্রমাণ সহকারে এই মত প্রতিষ্ঠা করেছেন যে, বাঙালিরা আদৌ হিন্দুই নয়। বরং আর্যরা বাঙালিদের কাক-পক্ষি (বয়াংসি) বলেই চিহ্নিত করত। এই মতের সমর্থন পাওয়া হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর *বৌদ্ধধর্ম* এবং সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের লেখায়। উত্তরভারতীয় বর্ণহিন্দুর পরিবর্তে অন্যান্য জনগোষ্ঠীর সঙ্গেই বাঙালির জাতিগত, সাংস্কৃতিক বা নৃতাত্ত্বিক সাদৃশ্য বর্তমান— '...বাঙালীর ভিতর হিমালয়ের নেপালী, তিব্বতী, ভুটিয়া, চীনা ইত্যাদি নরনারীর হাড়মাস ও সংস্কৃতি দেখিতে হইবে। তাহা ছাড়া আসামী, মগ, বর্মী ইত্যাদি জাতের দান নগণ্য নয়। অধিকন্তু, মুণ্ডা, ওঁরাও, সাঁওতাল, কোল, ভিল, উড়িয়া ইত্যাদি জাত ও অনার্য-পারিয়া বাঙালীর সঙ্গে মিশিয়া আছে'।[45] সে অর্থে বাঙালীর সংস্কৃতিকে বিনয় সরকার পুরোপুরি 'দো-আঁসলা' বলে মনে করেছেন।

---

42 তদেব।

43 হরিদাস মুখোপাধ্যায় এবং অন্যান্য, ২০০০, পৃ. ৩৩৮।

44 হরিদাস মুখোপাধ্যায় এবং অন্যান্য, ২০০০, পৃ. ৩৩৯।

45 হরিদাস মুখোপাধ্যায় এবং অন্যান্য, ২০০০, পৃ. ৩৫১।

ধর্মের ক্ষেত্রেও তারা নিজেদের স্থানীয় দেবদেবী, আচার, ব্যবহার, রীতিনীতি নিয়েই মসগুল থাকত। তারা অবাঙালি ও বিদেশী ধর্ম দুটোকেই নতুন ছাঁচে সাজিয়ে নিয়েছে। সরকার মনে করেন 'কনভার্শন'-এর প্রক্রিয়া চলা সত্ত্বেও অসংখ্য মানুষ 'অহিন্দু, অর্থাৎ বাঙালী বা অনার্য' থেকে গেছে। এই বিষয়ে আরও অনেক গবেষণা ছাড়া নিরেট তথ্য দেওয়া সম্ভব নয় জেনেও তিনি এই দাবি করেছেন।[46] সময়ের নিরিখে এই দাবিটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে আমার মনে হয়, বিশেষ করে যে সময় স্বাধীনতা আন্দোলনের তথা ব্রিটিশ বিরোধিতার মূল স্রোত হিন্দু মূল্যবোধ, চিহ্ন, উপমা, অলঙ্কার এবং চিত্রকল্পকেই হাতিয়ার করে ঐক্যবদ্ধ হতে চেয়েছিল। ১৯২০-র দশকে নৃতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব থেকে শুরু করে বিজ্ঞানের বিভিন্ন আঙ্গিক নিয়েও বাংলা ভাষায় চর্চার উৎসাহ দেখা গিয়েছিল। 'একালের বঙ্গ-সংস্কৃতি' রচনায় সরকার দাবি করেছেন অতীতের মতই আধুনিক যুগেও (মানে পাশ্চাত্য শাসনের অধীনেও) বাঙালি সংস্কৃতি দোআঁসলা। কারণ দান্তে মিল্টন থেকে শুরু করে হালের সমাজতান্ত্রিক ধারণা পর্যন্ত সব কিছুই আসলে বাঙালিয়ানায় পরিপুষ্ট[47]। রবীন্দ্রনাথের নোবেলপ্রাপ্তি বাঙালিকে ঐক্যবদ্ধ হতে অনুপ্রাণিত করেছিল। কিন্তু বিনয় সরকার মনে করেন স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবে ইওরোপ আমেরিকার বহু দেশে ভারতের স্বপক্ষে ছোট মাঝারি নানা দল, মত পুষ্ট হতে শুরু করেছিল। চারিদিকে একটা ভারতীয় আবহাওয়া তৈরি হয়েছিল। 'ইয়োরামেরিকার কতকগুলা লোক' উঠে পড়ে লেগেছিল বাঙালিকে বা ভারত সন্তানকে 'ভদ্রলোকের পাতে দেবার' জন্য। তারই ফলশ্রুতি হল রবির নোবেলপ্রাপ্তি[48]। অর্থাৎ বহির্বিশ্বের সঙ্গে বাংলার ও বাংলা সাহিত্যের একটি দ্বিমুখী চলাচল ছিল। নারী-পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে

---

46 হরিদাস মুখোপাধ্যায় এবং অন্যান্য, ২০০০, পৃ. ৩৫৯।

47 হরিদাস মুখোপাধ্যায় এবং অন্যান্য, ২০০০, পৃ. ৩৬০।

48 হরিদাস মুখোপাধ্যায় এবং অন্যান্য, ২০০০, পৃ. ৩৬৬।

ঔপনিবেশিক-জাতীয়তাবাদী ছাঁচের বাইরে থেকে উপাদান সংগ্রহ করার ক্ষেত্র বাংলায় তৈরি ছিল। সাহিত্যিকরা তার সদ্ব্যবহারও করেছিলেন। যার ফসল আলোচ্য সময়ের বাংলা সাহিত্যের বহুমুখী পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

উনিশ শতক শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ এবং প্রকৃতিবাদ ক্রমশ জায়গা করে নিতে থাকে। এবং শিল্পের ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক-নৈতিক মূল্যবোধের জায়গায় কিছু পরিবর্তন ঘটে, অন্য একটি বিশ্বাস স্থান গ্রহণ করে। যেখানে কলঙ্কময় সামাজিক বাস্তবতার যাবতীয় তথ্য নথিভূক্ত করার একটা প্রচেষ্টা দেখা যায়। বাস্তববাদ, এবং সামাজিক বাস্তববাদ ক্রমশ বাংলা সাহিত্যে জায়গা করে নিতে থাকে। সেই উদ্দেশ্যে মারমুখী আধুনিক বাস্তবতার সূচনা হয়। rhetotic of decadence তুলে ধরার প্রচেষ্টা শুরু হয় সাহিত্যে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মধ্যবিত্ত পরিসরের বাইরে বিভিন্ন জনজাতি এবং তথাকথিত নিম্নবর্গের জীবনের উল্লেখ ও প্রতিফলন ঘটতে শুরু করেছিল বাংলা উপন্যাস-গল্পে বিশের দশকে, যদিও প্রবন্ধে প্রতিফলন ঘটছিল তার আগে থেকেই। ১৯৩০-এর দশক থেকে আবার দেখা দেয় সাহিত্যে প্রগতির ধারণা। বলা যায় এই সময়কাল জুড়েই বাংলার একটি নিজস্ব পরিসরের চাহিদা তৈরি হয়েছিল, যে পরিসরটিই ছিল স্ববিরোধিতায় পূর্ণ। সেখান থেকে পূর্বের বোঝাপড়াগুলিকে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে ঝালিয়ে নেওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছিল। সাহিত্যের পাশাপাশি যাপনের ক্ষেত্রেও সূচিত হয়েছিল পরিবর্তন। বৌদ্ধিক বিতর্কের পরিসরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িয়ে ছিল আধুনিক বাঙালির আড্ডার ধারণাটি। এই পরিসরটি আলোচনায় আসা জরুরি বৌদ্ধিক সমাজে আধুনিক নারী-পুরুষের রসায়ন বোঝার তাগিদে। পাবলিক স্পেস কথাটির বাংলা প্রতিশব্দ কী হতে পারে? সম্ভবত গণ-পরিসর। কিন্তু ঠিকঠিক ভেবে দেখতে গেলে পাবলিক বা প্রাইভেট কথাগুলির লাগসই বাংলা করা কঠিন। রাজনীতির

যে আঙিনায় 'গণ' নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে তার সঙ্গে রাজনৈতিক সমাজ ও রাষ্ট্রীয় গণতন্ত্রের ধারণা যুক্ত। আর এর বাইরে আছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের একান্ত পরিসর। রাজনীতির গড়পড়তা ধারণায় এভাবেই আমাদের ভাবতে শেখানো হয়। কিন্তু এই গড়পড়তা 'প্রাইভেট' ও গড়পড়তা 'পাবলিক'-এর বাইরে আরেকটা পরিসর থাকতে পারে, সেটা আড্ডার পরিসর। যা ঠিক আমজনতার সামাজিক পরিসর নয়, আবার একান্ত পরিসরও নয়। দুই বিশ্বযুদ্ধের মাঝের কালপর্বে ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে দ্রুত পালটে যাচ্ছিল বাঙালি মধ্যবিত্তের জগত। এই বদলে যাওয়া জগতের সামাজিকতাকে বুঝতে আড্ডার ইতিহাসের শরণাপন্ন হয়েছেন দীপেশ চক্রবর্তী। 'আড্ডা' ধারণাটি একমাত্র বাঙালির সম্পদ এমন দাবি দীপেশ করছেন না। তবে বিশ শতকের শুরুতে বাঙালির আলোচনায় এবং বাঙালি-সম্বন্ধীয় আলোচনায় 'আড্ডা'-র স্থান নির্ণয়ের প্রচেষ্টা করেছেন তিনি; এবং আড্ডাকে 'বাঙালি চরিত্র' প্রদানের যে দাবি তৈরি হয়েছিল, সেই দাবিটি নির্মিত হওয়ার ইতিহাস বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন। দেখাতে চেয়েছেন পুঁজিবাদী শহরের মধ্যে কিভাবে একশ্রেণির মানুষ আড্ডার মধ্য দিয়ে 'at home' (বাংলা প্রতিশব্দ কি হতে পারে? আরাম, স্বাচ্ছন্দ?) অনুভব করছে।[49] দীপেশের ভাবনার সাযুজ্যপূর্ণভাবে তৎকালীন সময়ের অনন্য প্রতিভা বিনয় সরকার, যার চিন্তাধারাকে আবার দার্শনিক পরিভাষায় বলা হয় – 'সরকারবাদ' বা 'সরকারিজম'[50], তিনি আড্ডা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 'আড্ডায় মাথা ঠান্ডা হয়, মগজ পরিষ্কার হয়, মুখস্ত করা বিদ্যাগুলা সত্যিকার হজম হয়, ...আড্ডার ভেতরে লোকেরা স্বাধীনতা চাখতে পায়। ...তক্কাতক্কির সুযোগে যেখানে, সেখানেই নরনারী স্বরাজ ভোগ করে'।[51]

---

[49] Chakrabarty, 2000, 183.

[50] হরিদাস মুখোপাধ্যায় এবং অন্যান্য, ২০০০, পৃ. ভূমিকা ১৪।

[51] হরিদাস মুখোপাধ্যায় এবং অন্যান্য, ২০০০, পৃ. ১৮৮।

আমরা এই প্রকল্পটিকে আরও একটু খতিয়ে দেখতে পারি মূলত রম্যরচনা ও স্মৃতিকথা গোত্রীয় সাহিত্যের আশ্রয় নিয়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রম্যরচনা ধারাটিও আলোচ্য কালপর্বে যে বিশেষ সাজে দেখা দেয় তার সঙ্গে এই নতুন সামাজিকতা ও তার পরিসরগুলির একটি যোগসূত্র আছে। এই সময় গ্রাম-সমাজের চণ্ডীমণ্ডপ ও কিছুটা সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ছোঁয়াচ লাগা বৈঠকখানা থেকে আড্ডারও ঠিকানা-বদল ঘটছে। আলোচ্য সময়ের কিছুকাল আগে থেকেই নাগরিক সমাজে আড্ডার বাস্তবতা তৈরি হয়েছিল। আচার্য সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত *ডন স্যোসাইটি*-র আড্ডা স্যোশাল গ্যাদারিং-বাঙালিয়ানার নির্মাণ-জ্ঞানতত্ত্ব ও সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। তারপর বুদ্ধদেব বসু, সজনীকান্ত দাশ, সৈয়দ মুজতবা আলি, নীরদচন্দ্র চৌধুরী, কুমারপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রাধাপ্রসাদ গুপ্ত হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ভবতোষ দত্ত, মণীশ ঘটক প্রমুখ অনেকেই তাঁদের স্মৃতিকথা, জানার্ল বা আত্মজীবনীতে যৌবনের আড্ডার কথা উল্লেখ করেছেন। পাবলিক-প্রাইভেট দ্বৈততার বাইরে আড্ডার পরিসরে নাগরিক বাঙালি সমাজের পরিবর্তিত সামাজিকতার ধারণাটিকে বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে। আড্ডার পরিসরে বাংলা সাহিত্যের পরিবর্তনশীল চরিত্রটাও ধরা পড়ে। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় *আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত*-এ লিখছেন, 'মানসী', 'ভারতী', 'প্রবাসী' ইত্যাদি পত্রিকাকে ঘিরে যে সমস্ত সাহিত্যগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল তার প্রায় সকলেই ছিলেন রবীন্দ্র অনুরাগী। বিশেষত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে 'ভারতী' এবং ক্রমশ প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র' প্রাধান্য অর্জন করেছিল। 'তাঁহার বালিগঞ্জস্থিত বাসভবন নবীন সাহিত্যিক ও ঐতিহ্যকামী ব্যক্তিদের সত্যকারের "সাঁলো"তে পরিণত হয়েছিল'।[52] 'বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক হইতে তৃতীয় দশক পর্যন্ত রবীন্দ্রপ্রভাব এরূপ প্রবল হইয়াছিল যে, ইতিপূর্বে রক্ষণশীল মতাবলম্বী সাহিত্যিকগণ যে রবীন্দ্র-প্রতিরোধ রচনা করেছিলেন, তাহা অচিরে, অবলুপ্ত হইয়া গেল। অবশ্য ১৯৩০ সালের পর হইতেই রবীন্দ্রপ্রভাব হ্রাস পাইল তাহা নহে; তবে প্রায় এই সময় হইতে রবীন্দ্র-আদর্শ ত্যাগ করিয়া আরও নূতন দিকে সাহিত্যকে সম্প্রসারিত করা যায় কিনা, তাহা লইয়া নানা পরীক্ষা শুরু হইল। ১৯৩০ সালের পূর্ব হইতেই তাহার

[52] অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, *আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত,* (কলকাতা: মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ ১৩৬৭), পৃ. ২১৩।

কিঞ্চিৎ সূচনা হইয়াছিল'।[53] অর্থাৎ সাহিত্যের পালাবদলেও আড্ডা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিগ্রহণ করে আছে।

এইখানে প্রশ্ন উঠবে বিনয় সরকার যেভাবে আড্ডার পরিসরটি চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন, অর্থাৎ 'নরনারীর স্বরাজ উপভোগের স্থান' বা 'স্বাধীনতা চাখতে' পারার কথা, নারীদের ক্ষেত্রেও কি সেকথা একইভাবে প্রযোজ্য নাকি আড্ডার ধারনাটাই লিঙ্গায়িত। আধুনিকতা এবং আধুনিক সাহিত্যের পরিসর এবং তার সঙ্গে সংযুক্ত বিভিন্ন ধারণা সম্পর্কে রিটা ফেলস্কি কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছেন। যেমন: আধুনিকতার লিঙ্গ (জেন্ডার) কাকে বলে? কোনও একটি ঐতিহাসিক কালপর্বের কি লিঙ্গ থাকতে পারে? সাধারণভাবে প্রশ্নগুলি খুবই বিমূর্ত লাগে। তাই তিনি এও বলছেন যে, 'রাচনিকতার (textuality) ঐতিহাসিকতা (historicity) এবং ঐতিহাসিকতার রাচনিকতা'-র ধারণাটি প্রাথমিক পর্যায়ে যতটা দুরূহ বলে মনে হত, হয়ত ততটা নয়'। রিটার মতে, যদি আমাদের অতীত সম্পর্কে ধারণা অবশ্যম্ভাবীভাবে কাহিনি/আখ্যান (narrative)-র ব্যাখ্যমূলক যুক্তি দ্বারা রূপায়িত হয়ে থাকে, তাহলে যে গল্পগুলি আমরা নির্মাণ করি সেগুলিও লিঙ্গ প্রতীকিবাদের (symbolism) অপরিহার্য উপস্থিতি ও ক্ষমতাকেই উন্মোচিত করবে। এই আধুনিক পরিসরেই সম্ভবত সব থেকে বেশি করে সাংস্কৃতিক রচনাগুলি পুরুষত্ব ও নারীত্বের রূপক দ্বারা সম্পৃক্ত হয়ে আছে। সেই কারনেই ইতিহাসের লিঙ্গ-কেন্দ্রিকতা, এবং তার সঙ্গে ঐতিহাসিকতার লিঙ্গের প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রিটা এই বিষয়টিকেই তাঁর বইয়ের পরবর্তী আলোচনার leitmotif বলে অভিহিত করেছেন।[54]

---

[53] তদেব, পৃ. ২১৩-১৪।

[54] Felski, 1995, 1.

আমরা রিটা ফেলস্কির বিশ্লেষণী কাঠামো ব্যবহার করে সাহিত্যে আড্ডার পরিসরটিকে বোঝার চেষ্টা করব। সাহিত্যের বিভিন্ন পালাবদলের ক্ষেত্রে আড্ডার ক্ষেত্রটি বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে – 'কল্লোল', 'ধূমকেতু', 'শনিবারের চিঠি', 'লাঙল', 'গণবাণী', 'পরিচয়', 'অগ্রণী' ইত্যাদি বহু পত্রিকাকে কেন্দ্র করে বিশ-তিরিশের সাহিত্যিকচর্চা আবর্তীত হত। তাই লিঙ্গ-রাজনীতির ক্ষেত্রেও আড্ডার পরিসরটির গুরুত্ব আছে। 'আড্ডা' নামক প্রবন্ধে বুদ্ধদেব বসু লিখছেন, আড্ডার ঠিক প্রতিশব্দ পৃথিবীর কোনও ভাষাতেই আছে কিনা তাঁর জানা নেই। তাঁর মতে আড্ডার মেজাজ বা পরিবেশ আর কোথাও নেই। সাহিত্যসভার পাণ্ডিত্য বা চণ্ডীমণ্ডপের পরচর্চার আবহ এখানে নেই, আছে ঢিলেঢালা মেজাজ। আড্ডার বেশ কিছু শর্তের কথা তিনি বেশ গুছিয়ে বলেছেন— সকলের সমান মর্যাদা থাকা দরকার, মহান ব্যক্তি এবং তার ভক্তগণের মধ্যে আড্ডা সম্ভব নয়। অর্থাৎ আড্ডায় কোনো থাকবন্দী কাঠামো রাখার পক্ষপাতি তিনি নন। বিষয়বুদ্ধি, দায়িত্ববোধ বা শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জায়গাও এটি নয়। 'আড্ডার উন্মীলন স্ত্রী-পুরুষের মিশ্রণে। মেয়েরা কাছে থাকলে পুরুষের এবং পুরুষ কাছে থাকলে মেয়েদের রসনা মার্জিত হয়...'। 'আনন্দের উদ্দেশ্যহীন ব্রত' হল আড্ডা। 'পৃথিবীর রাষ্ট্রনীতি বলে কাড়ো; আমাদের আড্ডা-নীতি বলে, ছাড়ো' – এই হল বুদ্ধদেবের আড্ডার ধারণা।[55] আড্ডার এই ধারণার মধ্যে দিয়ে বুদ্ধদেব বেশ কয়েকটি মান্য ধারণাকে খণ্ডন করেছেন। একমাত্রিক আধিপত্যকামী রাষ্ট্রনীতি বা উচ্চ-নিচ থাকবন্দী যেকোনো বিন্যাসকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন তিনি। প্রতিষ্ঠা দিয়ে চেয়েছেন নারী-পুরুষের সাম্যাবস্থার। তবে উল্টোদিকের উদাহরণও আছে। ২৮শে নভেম্বর, ১৯২৯ সাল, 'রবিবাসর'-এর আড্ডায় রাধারাণী দেবীকে সদস্য করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন জলধর

[55] বুদ্ধদেব বসু, 'আড্ডা', *কলকাতার আড্ডা*, সমরেন্দ্র দাস (সম্পা.), (কলকাতা: গাঙচিল, ২০০২), পৃ. ১১-১৫।

সেন। কিন্তু 'স্নেহের বোন'-কেও এই অধিকার দিতে রাজি ছিলেন না শরৎচন্দ্র। তাঁর দাবি ছিল সাহিত্য আসরে মহিলা নিষিদ্ধ। নাহলে 'পুরুষ' সাহিত্যিকদের 'জিভে লাগাম' পরাতে হবে। কিন্তু রাধারাণীও ছাড়ার পাত্র নন। তাই ঠিক হল রবীন্দ্রনাথের ফয়সালাই মানা হবে। কিছু দিন পরে জোড়াসাঁকোর এক আসরে রবীন্দ্রনাথ জানালেন, 'না বাপু, আমিও শরতের সঙ্গে একমত। তোমরা ছেলেদের একটুও জিরোতে দেবে না, সব জায়গায় পাহারা দিয়ে হাজির হবে, এ হয় না'। তখনকার মত মেনে নিলেও রাধারাণী দেবী এই ঘটনার শোধ তুলেছিলেন। শরৎচন্দ্রের বাড়ির আড্ডায় নিমন্ত্রিত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সমস্ত আয়োজন করে দেওয়ার পরে আসর শুরু হওয়ার ঠিক আগে ফিরে গিয়েছিলেন রাধারাণী। সেই মান ভাঙাতে হয়েছিল শরৎ-রবীন্দ্রকে।[56] দুটি উদাহরণের মধ্যে দিয়ে আমরা বাংলার সাহিত্য-বৌদ্ধিক মহলের রূপান্তরের ছবি পাই। অন্যান্য পরিসরের মতো এই ক্ষেত্রটিও স্ববিরোধে ভরা। তবে একটি কথা বলা দরকার রাধারাণী দেবীর সমান দৃঢ়তা সবার থাকে না, তা দাবি করাটাও অনুচিত। কিন্তু তাঁর বা তাঁদের মতো কয়েকজন নারীর পদক্ষেপগুলি অন্যদের জন্য স্থান করে দিয়েছিল, মান্য ঐতিহ্যের দেওয়ালগুলি ঠেলে সরানোর মধ্যে দিয়ে। তা সত্ত্বেও আড্ডার 'আনন্দের উদ্দেশ্যহীন ব্রত' পালনের অধিকার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পুরুষেরই কুক্ষিগত থেকে গিয়েছিল। সংসারজ্ঞানহীন, দায়িত্বরহিত সৃষ্টিশীল পুরুষ আধুনিকতার পরিচয়বাহী। সব যুগেই তাঁদের দেখা পাওয়া গেলেও আধুনিকতার পরিসরে তাঁরা এবং তাঁদের সৃষ্টিশীলতা অন্য মাত্রা গ্রহণ করে আধুনিক হয়ে উঠেছিল।

আধুনিকতার লিঙ্গ-নির্ধারণের জন্য প্রয়োজন তার বিষয়ীকে চিহ্নিত করা। নির্দিষ্ট বিষয়ী নির্মাণের মাধ্যমে এবং সেই প্রক্রিয়ার মধ্যেই থাকে অপরকে বর্জন করার

---

[56] অর্ঘ্য বন্দ্যোপাধ্যায়, 'অপরাজিতা রাধারাণী', (কলকাতা: *আনন্দবাজার পত্রিকা*, শনিবার, ১৮ মে, ২০১৯) ।

প্রবণতা। সেই সংজ্ঞায় যাদের স্থান হয় না, তারা চিহ্নিত হয় অনাধুনিক হিসাবে। আধুনিকতার বিষয়ী সংক্রান্ত আলোচনা করতে গিয়ে রিটা ফেলস্কি শুরুতেই একটি বিখ্যাত বইয়ের উল্লেখ করেছেন। মার্শাল বারম্যানের *অল দ্যট ইজ সোলিড মেল্টস ইন্টু এয়র,* যে বইটি প্রকৃতপ্রস্তাবে সাহিত্য ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক আধুনিকীকরণ এবং আধুনিকতাবাদের সঙ্গে সাহিত্যের সংঘাতময় সম্পর্ক নির্ধারণ করতে চেয়েছে। রচনাকাল ১৯৭১ থেকে ১৯৮১। গ্যোয়েটে, বোদল্যের, পুস্কিন, দস্তয়েফস্কি, গোগোলসহ ১৯৬০ ও ৭০ এর দশকের নিউ ইয়র্ক শহরের আলোচনা দিয়ে শেষ হচ্ছে বইটি। আধুনিকতাবাদের সমালোচনা হলেও বইটি সম্পর্কে রিটার অভিযোগ হল, বইটি পড়লে ভাবতে ইচ্ছা করে যে আধুনিকতার লিঙ্গ/জেন্ডার হল পুরুষ। তাঁর রচনার আদর্শ নায়করা হলেন সবাই পুরুষ— ফাউস্ট, মার্ক্স, বোদল্যের। তাঁরা কেবলমাত্র আধুনিকতার প্রতীকই নন, বুর্জোয়া এবং শ্রমিক শ্রেণির নতুন ধাঁচের পুরুষ বিষয়িতার এবং পুরুষালিত্বের (ম্যাসক্যুলিনিটি) ঐতিহাসিক চিহ্নক তাঁরাই। অন্যদিকে মেয়েরা পর্বতসদৃশ ভারী ঐতিহ্য এবং রক্ষণশীলতার সঙ্গে সংযুক্ত। আর সেই কারণেই সক্রিয়, নব্য স্বশাসিত, আত্ম-ব্যাখ্যাকারী বিষয়ী (এক্ষেত্রে পুরুষ) রক্ষণশীল পরিসরটিকে অতিক্রম করতে চায়। ধরে নেওয়া হয় যে, আধুনিক ব্যক্তিমানুষ হয়ে উঠবে পরিবার ও সম্প্রদায়ের বন্ধনমুক্ত স্বশাসিত এক পুরুষ। রিটার মতে বারম্যানের বইটিও সেই দীর্ঘকালীন লিখন-ঐতিহ্যকেই মান্যতা দেয়।[57] বারম্যানও আধুনিকত্বের সঙ্গে পুরুষত্ব, এবং নারীত্বকে ঐতিহ্যের সঙ্গে তুলনা করার রীতিকেই আধুনিক সময় ও তার চরিত্র বোঝার জন্য বেছে নিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি ফাউস্টিয়ান মিথের উল্লেখ করেছেন। ফাউস্টিয়ান মিথ বা ফাউস্টিয় অতিকথা সম্পর্কে বলা হয় জনপ্রিয় এই

[57] Felski, 1995, 2.

অতিকথার গভীরে নিহিত আছে মূলগত মানবিক প্রবৃত্তি, যা লঙ্ঘন করে ঐতিহ্যশালী জ্ঞানের সীমানাকে; আত্মসংজ্ঞা, প্রকৃত জ্ঞান এবং ক্ষমতার জন্য।[58] রিটা মনে করেন, আধুনিক যুগের অসঙ্গতিগুলির প্রতীকী ও স্পষ্ট-উচ্চারণ উল্লেখযোগ্য ভাবে ধারিত হয়ে আছে এই অতিকথায়। আবার আধুনিকতার নানা অতিকথার প্রতিস্পর্ধী বয়ানগুলিও ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে জনপ্রিয় থেকে কেতাবি, কল্পনাশ্রয়ী থেকে তাত্ত্বিক বিভিন্ন রচনায়।[59] আত্মমগ্ন একাকী পুরুষ বিষয়ীর উত্থান এই আধুনিক যুগেই। শিল্প-সাহিত্যে সৃষ্টিশীল আধুনিক বিষয়ী হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে Flaneur-র ধারণা: ভবঘুরে সেই ব্যক্তি (অবশ্যই পুরুষ), সামাজিক-পারিবারিক কাঠামোর বাইরে একা বিচরণ করে আর নির্লিপ্ত ভঙ্গিমায় পর্যবেক্ষণ করে সমাজকে।

বাংলা আধুনিক সাহিত্যের পরতে পরতে দেখা মেলে এই পুরুষের। বেশির ভাগ উপন্যাসের প্রোটাগনিস্ট আসলে আত্মমগ্ন একাকী পুরুষ। সে কোথাও স্থিতু হতে পারে না। খুঁজে পায় না তার সঙ্গী বা প্রেমকে। দ্বিধাদীর্ণতা, স্ববিরোধ, যন্ত্রনা এই বিষয়ীর স্বভাব বৈশিষ্ট্য। তবে একটা অমিল আছে, বাঙালি পুরুষ সংসারবুদ্ধিহীন, উদাসীন হতে পারে, কিন্তু সংসারের আরাম আর নিশ্চয়তা তার দরকার হয় কাজের শেষে। বুদ্ধদেব বসুর *সাড়া, সূর্যমূখী, যেদিন ফুটল কমল* প্রভৃতি প্রথম দিকের উপন্যাস, জীবনানন্দের *মাল্যবান, নিরুপম যাত্রা, কারুবাসনা, জলপাই হাটি, সুতীর্থ,* অচিন্ত্য সেনগুপ্তের *বেদে,* ধূর্জটিপ্রসাদের *আবর্ত-অন্তঃশীলা-মোহানা* থেকে শুরু করে যুবনাশ্ব, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের জীবনের শুরুর দিকের উপন্যাসের আমরা উক্ত চরিত্রের সন্ধান পাই। একটি কথা অনস্বীকার্য যে তারা সকলেই পরিবর্তিত পরিস্থিতির নিরিখে

---

58 Seyda Sivrioglu, *The Foustus Myth in the English Novel*, (Cambridge Scholar Publishing, 30th May, 2017, Accesed 21 June, 2022), https://www.cambridgescholars.com/product/978-1-4438-8284-2.

59 Felski, 1995, 4.

একদিকে যেমন নিজেদের অবস্থান খুঁজতে চেয়েছে, তেমনই বিশ-তিরিশের সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য হিসাবে উঠে এসেছে নারী-পুরুষের সম্পর্ক নির্ধারণের আকূতি। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নারীর সম্পর্কে তাদের মনোভাব এবং ব্যবহার চালিত হয়েছে নিজেদের (পুরুষের) পরিবর্তিত চাহিদার সাপেক্ষে। নারীকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে পুরুষের চোখে, তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে। উদাহরণ স্বরূপ একটি উপন্যাসের উল্লেখ করছি। বুদ্ধদেব বসুর সূর্যমুখী। উপন্যাসের শুরুতেই দেখা যাচ্ছে গল্পের প্রোটাগনিস্ট হল একজন আর্টিস্ট, কবি। বছর পঁচিশেক বয়স। কোনো সন্ধ্যায় কবিতার একটি পংক্তির সাড়া পাওয়ার কাছে তুচ্ছ হয়ে যায় তার যাবতীয় জাগতিক চাওয়া পাওয়া। হিসাব সংসার শরীরের আরাম কিছু নিয়েই কবির ভাবা চলে না। সে এসবের উর্দ্ধে। বিমূর্ততাকে আলিঙ্গনের জন্যই দরকার মূর্ত প্রাত্যহিকতাকে ভুলে থাকা। প্রেমকে কল্পনা করতে পারে সে-ই, কবি। কবি স্রষ্ঠা, ঈশ্বর। মৃন্ময়ীতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা কেবলমাত্র তার কাজ। নারী তার বিষয়, তার কাদামাটি, সময়ে সময়ে সে হাতে দলে গড়েপিটে নেবে তাকে। নারী তার কল্পনা, যখন সে তার শিল্পের আধার। অথচ অন্য এক নারীরও প্রয়োজন আছে তার। যার প্রতি তার কোনো টান বা উৎসাহ নেই। যাকে দরকার দৈনন্দিন প্রয়োজনগুলো মিটিয়ে দিয়ে তাকে স্বপ্নের নারী বা তার শিল্পের কাছে পৌঁছাতে সাহায্য করতে। অথচ পয়সা না থাকলে জীবনই চলে না। মনের খিদে মেটানোর জন্য বই কেনার পয়সাও নয়। হৈমন্তী (অর্থাৎ তার মা) তাকে দিয়েছিলেন অবসর, একার জীবন কাটানোর অবসর, সব থেকে দুর্লভ, দুর্মূল্য উপহার। তার মার কিছু পয়সা ছিল। বেশি বয়সের একমাত্র সন্তানের সঙ্গে মার সম্পর্ক ছিল 'একে অন্যের হৃদকেন্দ্রে— অচৈতন্যে, অন্ধকারে', 'দুজনের মধ্যে নিবিড় নিষ্ঠুর ভালোবাসা'-র বন্ধনে।[60]

[60] বুদ্ধদেব বসু, *সূর্যমুখী*, (কলকাতা: শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ১৯৩৪) ।

বুদ্ধদেব বসু পরের উপন্যাসগুলি আরও পরিণত, অনেক বেশি সংবেদী নারী-পুরুষের সম্পর্কের বিচারে। কিন্তু প্রথম দিকের এই উপন্যাসের তিনি নারীর ঐতিহ্যশালী অবস্থান এবং তার পালনীয় ভূমিকাকেই মান্যতা দিয়েছেন। আর পুরুষকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন ঈশ্বর-সদৃশ স্রষ্টার ভূমিকায়।

আধুনিকতার এই পুরুষ বিষয়ী নির্মাণের সমালোচনায় বলা যায় আধুনিকতাকে বোঝার আরও অনেক পথ আছে। কোনও একটি মাত্র পথকে মান্যতা দেওয়ার অর্থ অন্য বিষয়ীর উপস্থিতিকে অগ্রাহ্য করা। রিটা ফেলস্কি তাই অন্যান্য সম্ভাবনাগুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন যেগুলি আধুনিকতা ও সাহিত্য আলোচনার প্রশ্নে অনেক বেশি লিঙ্গ-সংবেদী। মেয়েদের লেখার মধ্যেও থাকতে পারে স্ববিরোধ— সেই পরিসর এবং নৈঃশব্দকে চিহ্নিত করার দরকার আছে। লিঙ্গ-বৈষম্যমূলক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে অপর সম্ভাবনাগুলি অনেক ক্ষেত্রেই অদৃশ্য থেকে যায়। নারীর আন্তর্সম্পর্কের বিন্যাস, দৈনন্দিনতা, আবেগপ্রবণতা সব কিছুর উপরেই জোর দেওয়ার কথা বলেছেন তিনি। কারণ নারী-আলেখ্যের নীরবতা এবং নৈঃশব্দের মধ্যে নিহিত থাকে মান্যতা ও শৃঙ্খলার বিপ্রতীপে অবস্থানের প্রবণতা। তাই বারম্যানের উল্লিখিত আধুনিকতার গতিময় সক্রিয়তা, উন্নতি, এবং সীমাহীন অগ্রগতির প্রতি আকাঙ্ক্ষার দ্বারা চিহ্নিত পুরুষ বিষয়ীর পরিবর্তে অনেকটাই অ-সক্রিয় এবং আরও অনেক বেশি অনিশ্চিত বিষয়ী সত্তা হিসাবে নারীর কথা বলেছেন; রাচনিক প্রভাব, সামাজিক ভূমিকা এবং অপরিণত তাড়নার বিকেন্দ্রীভূত যোগসূত্রে গ্রোথিত যে নারী হয়ত নিজের অজান্তেই নিয়ন্ত্রণের ঘেরাটোপকে প্রশ্ন করবে।[61]

---

61 Felski, 1995, 4-6.

তৃতীয় অধ্যায়

সাহিত্যে মনস্তত্ত্ব এবং প্রগতিবাদ: একটি নারীবাদী পাঠ

Art attracts us only by what it reveals of our most secret self.

Jean Luc Godard.

পরের ক্ষেতের ধানে মই দিয়ে উঁচু করে নক্ষত্রে লাগানো
সুকঠিন নয় আজ;
যে-কোনো পথের বাঁকে ভাঙনের নদীর শিয়রে
তাদের সমাজ।
তবুও তাদের ধারা—ধর্ম অর্থ কাম কলরব কুশীলব—
কিংবা এ সব থেকে আসন্ন বিপ্লব
ঘনায়ে— ফসল ফলায়ে— তবু যুগে যুগে উড়ায়ে গিয়েছে পঙ্গপাল।

সৌরকরোজ্জ্বল, জীবনানন্দ দাশ।

আগের অধ্যায়গুলির আলোচনায় আমরা দেখেছি যে কেবলমাত্র বাংলা সাহিত্যে নয়, বাঙালি নাগরিক জীবনের অন্যতম প্রশ্ন হিসাবে উঠে এসেছিল নর-নারীর সম্পর্কের বিষয়টি। পরিবর্তিত বাস্তবতায় নারীর চেতনা ও সামাজিক অবস্থার রূপান্তর নারী পুরুষ উভয়কেই তাদের সমীকরণ নিয়ে ভাবতে বাধ্য করেছিল। বাঙালির মনস্তত্ত্ব ভাবনায় কেন্দ্রীয় বিষয় হিসাবে প্রাধান্য পায় যৌনতা। অন্যদিকে সাম্যবাদী চিন্তাভাবনার প্রসারের ফলে নতুন এক দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছিল। শ্রেণি এবং প্রগতির প্রশ্নটি প্রাধান্য পাওয়ায় লিঙ্গ-সম্পর্কের দিকটি আবার গুরুত্ব হারিয়েছিল এক অংশের কাছে। সাধারণীকৃত একটি বিভাজন করা যায়— ১৯২০-র দশকে যদি প্রাধান্য পেয়ে থাকে মনস্তত্ত্ব এবং যৌনতা, তাহলে ১৯৩০-এর দশক ছিল প্রগতিবাদের। যদিও বলা বাহুল্য এই জাতীয়

বিভাজন অনড় বা বদ্ধ নয়, বহুদূর পর্যন্ত দুটি ধারারই প্রভাব সমান্তরালভাবে বহমান ছিল। অন্যান্য অধ্যায়ের মত এখানেও আমরা মনস্তত্ত্ব-যৌনতা এবং প্রগতিবাদের ধারণাকে সমস্যায়িত করার মধ্যে দিয়ে দেখে নিতে চাইব বর্গগুলি কতদূর পর্যন্ত লিঙ্গ-সংবেদী, অথবা ধারণাগত ভাবেই তার সংস্থান আধিপত্যকামী মানদণ্ডকে মান্যতা দিয়ে থাকে কিনা।

বিশের দশক থেকে সাহিত্যে যৌনতার ধারণাটি যে আলোচনা-বিতর্কের বৃত্তে (discursive) প্রবেশ করেছিল তা নিয়ে সন্দেহ নেই। যদিও বাংলা সাময়িকপত্রে মনস্তত্ত্ব নিয়ে লেখালিখি শুরু হয়েছিল উনিশ শতকেই। কুঞ্জবিহারী ভট্টাচার্যের *মেসমেরিজম* বা *শক্তিচালন বিদ্যা* (১৮৮৭) এবং হরিশচন্দ্র শর্মার 'হৃৎতত্ত্ববিবেক' (১৮৭৫) ইত্যাদি লেখাপত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। তবে এই বিষয়ে পথিকৃৎ অবশ্যই গিরীন্দ্রশেখর বসু। ফ্রয়েড, ইয়ুং, হ্যাভলক এলিসের চর্চা বাংলার বুদ্ধিজীবীমহলকে যথেষ্টই প্রভাবিত করেছিল। সাইকো-অ্যানালাইসিস, বিশেষত মানুষের অবচেতন এবং লিবিডোর বিষয়টি তরুণ সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের কাছে খুবই আকর্ষণীয় বোধ হয়েছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত পরাধীনতার পটভূমিতে। বিশের দশকের গোড়ায় জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রভাব পড়েছিল বাংলার বিজ্ঞানচর্চাতেও। 'প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞানের সঙ্গে "পাবলিক" বা "পপুলার"-এর এই যে যোগাযোগ ঘটল বাংলা ভাষার বিজ্ঞানচর্চার মাধ্যমে, সেখানে কিন্তু প্রায়ই পাশ্চাত্যবিজ্ঞানের প্রত্যয় বা কনসেপ্টগুলি নিয়ে সমস্যা হতে লাগল।... জনপ্রিয় ঢঙে লিখতে গিয়েও প্রত্যয়গুলির কিছু পরিবর্তন ঘটল। কারণ প্রধান আগ্রহের বিষয় ছিল তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণ, এবং এখানেও গড়ে উঠল এক নতুন

আলোচনা/সমালোচনার ভাষ্য।'[1] এই নতুন ভাষ্যের প্রভাব দেখা গিয়েছিল তরুণদের সাহিত্যে ও চর্যায়। তৎকালীন সময় থেকে পরবর্তীকাল পর্যন্ত যা নিয়ে বিতর্ক-সমালোচনা-বিদ্রূপ কিছু কম হয়নি। ১৯৩০-এর দশকে শান্তি সুধা ঘোষ 'আধুনিক প্রেমের কথা' নামক প্রবন্ধে নব্য শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায় সম্পর্কে লিখছেন, 'তারা ফ্রয়েড শিখেছে, জেনেছে— ভালোবাসা অর্থ সম্ভোগপ্রবৃত্তি এবং ওই প্রবৃত্তিকে বাঁধা দেওয়া বড়ই অন্যায়, সুতরাং তরুণী মেয়ে পথে পড়লেই একটুখানি প্রেম না করা ক্লীবত্ব।'[2] এই জাতীয় মনোভাব যে যুবসমাজে কাজ করত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু সামগ্রিক অবস্থা শুধুমাত্র এই মনোভাব দ্বারা বিচার্য নয়। অন্যদিকে যুবসমাজের যৌনতা ও মনস্তত্ত্বের প্রতি আকর্ষণে রক্ষণশীল বয়ঃজ্যেষ্ঠদের অনেকেই প্রখর সমালোচনা করেছিলেন বা পরেও করেছেন। কিছু ক্ষেত্রে সমলোচনা করলেও স্বীকৃতিও দিয়েছেন। মোহিতলাল মজুমদার 'কাব্য ও জীবন' প্রবন্ধে লিখছেন, 'আধুনিক ছোকরা-কবিদের' কাব্যবিলাস বর্জন করে জীবনকে খোঁজার প্রচেষ্টা অগত্যা 'যৌন-প্রবৃত্তিকেই' জীবনের ধর্ম বলে ঘোষণা করেছে। 'এবং অতিশয় অকথা-কুকথাপূর্ণ ব্যাকরণ-অভিধান-বর্জিত ভাষার কামবিদ্রোহ প্রচার করিল—শীর্ণ শবদেহকে দানোয় পাইল। ইহারই নাম হইল সাহিত্যের জীবনধর্ম্ম!'[3] আবার ১৯৬০-এর দশকে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নবসাহিত্য বিশেষত উপন্যাস সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 'ইহার (এই জাতীয় উপন্যাসের) দুর্নীতিপরায়ণতা ও যৌন আকর্ষনের অসংকোচ, নির্লজ্জ স্তুতিগান, তীব্র বিরোধিতা ও

---

1 অমিতরঞ্জন বসু, সংকলন, সম্পাদনা এবং অবতরণিকা, *গিরীন্দ্রশেখর বসু: অগ্রন্থিত বাংলা রচনা,* (কলকাতা: অনুষ্টুপ, ২০১৭), পৃ. ২৩।

2 শ্রী শান্তিসুধা ঘোষ, *নারী,* (কলকাতা: সরস্বতী লাইব্রেরী, ১৩৪৭), পৃ. ৯০।

3 মোহিতলাল মজুমদার, *সাহিত্য বিচার,* (কলকাতা: ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং, ১৩৫১ সাল), পৃ. ৭৭।

তুমুল বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছিল'।[4] তবে শ্রীকুমার সাহিত্যের নৈতিক মানদণ্ড নিরূপণের বিষয়ে অন্য অনেকের থেকেই উদারমনস্কতার পরিচয় দিয়েছেন। সাহিত্যের উৎকর্ষ অপকর্ষ যে অনেকটাই বিষয়-নিরপেক্ষ সেটা তিনি মানেন। সামাজের কাছে নিন্দনীয় প্রেমকে উপজীব্য করে উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচনা যে শুধু সম্ভব তাই নয়, নিষিদ্ধ প্রেম এবং তার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত তীব্র বিক্ষোভ ও প্রবল আবেগ সাহিত্য রচনার জন্য অপরিহার্য বলেও তিনি মনে করেন। 'সমাজের বিধি-নিষেধে যে নৈতিক আদর্শ প্রতিফলিত হইয়াছে তাহা অনেকটাই সুবিধাবাদ বা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের নীতিজ্ঞান বা স্বার্থসংরক্ষণের উপর প্রতিষ্ঠিত' এবং সেই কারণেই সমাজের নীতিবোধ কোনও সাহিত্য লঙ্ঘন করলে তার বিরুদ্ধে সংঘর্ষ তীব্রতর হয়ে থাকে, একথা তিনি স্বীকার করেন। ইউরোপের সাহিত্য পাঠের প্রভাবের কথা উল্লেখ করে তাঁর মন্তব্য, 'এখানে দীর্ঘ দিনের সংস্কারকে ছিন্ন করিতে যে পরিমাণ দুর্দমনীয় আবেগ ও প্রবল অন্তর্বিপ্লবের প্রয়োজন হয়, ঔপন্যাসিক তাহা নিজ উপন্যাসের ফুটাইয়া তুলিতে বাধ্য'।[5] রবীন্দ্রনাথের *নষ্টনীড়*-কে আধুনিক উপন্যাসে নিষিদ্ধ প্রেমের মূল উৎস বলে নিহ্নিত করতে চেয়েছেন তিনি। অতি-আধুনিক ঔপন্যাসিকদের যৌন আকর্ষণ সম্বন্ধে খোলাখুলি আলোচনার জন্য 'আমাদের সত্যাসহিষ্ণুতা ও দুর্বল নীতিসংকোচ' অনেকটাই অপসারিত হয়েছে এবং 'আমরা নীতিভয়গ্রস্ত শৈশব' পার হয়ে স্বাধীন চিন্তার যৌবনে পা দিয়েছি বলে তিনি মনে করেন। তবে সাহিত্য বিচারের ক্ষেত্রে এক ধরনের নৈতিকতাকেই তিনি মানদণ্ড স্থির করেছেন শেষ বিচারে।[6] তবে একাধারে শ্রীকুমার স্বীকার করে নিয়েছেন যে, উক্ত সময়কালে কাব্য সাহিত্যের প্রেরণা ও পাঠকগোষ্ঠীর সঙ্গে তার মানস সম্পর্ক

---

[4] শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'অতি-আধুনিক উপন্যাস', *বাংলা উপন্যাসের ধারা*, পঞ্চম সং., (কলকাতা: মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৬৭), পৃ. ৪৪৫।

[5] বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৬৭, পৃ. ৪৪৫-৪৫০।

[6] তদেব, পৃ. ৪৪৬-৪৪৯।

এমন একটি জটিল অনিশ্চয়তার আবৃত হয়ে ছিল যার ফলে কাব্যসাহিত্যের মূল প্রকৃতি এবং তার সামাজিক তাৎপর্য পুনর্বিবেচনা করাও হয়ে উঠেছিল জরুরি। অতি-আধুনিক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য হিসাবে তিনি বলছেন, 'প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রায় সম্পূর্ণ উন্মূলন' এবং 'গল্প-উপন্যাসে জীবনের সাধারণ আদর্শ-প্রধান রূপের পরিবর্তে অতি সূক্ষ্ম, ভাবাবেশবর্জিত ও মনস্তত্ত্বপ্রধান বাস্তব পর্যবেক্ষণের প্রবর্তন'। 'সর্বগ্রাসী সমাজচেতনা', 'জীবনের এক কটু-কষায় স্বাদ', ভেঙে পড়া আদর্শবাদের টুকরো টুকরো খণ্ড, চারিদিকের শূন্যতাবোধের মধ্যে 'অতি-আত্মসচেতন মনের আত্মরতি', 'বিশ্লেষণ কুশলতা' ইত্যাদিকে তিনি অতি-আধুনিক বা নবসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। মহাযুদ্ধের ভয়াবহ বিপর্যয়, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক বিশৃঙ্খলতা, অনিশ্চয়তা যে শুধুমাত্র বাইরের ব্যাপার নয়, তা 'অন্তর অনুভূতির গভীরতায় পর্যন্ত অনুপ্রবেশ' করেছে এবং 'এই অভাবনীয় রূপান্তর আমাদের সাহিত্য জিজ্ঞাসা ও সাহিত্য-প্রত্যাশার মূল' ধরে নাড়িয়ে দিয়েছে, তা শ্রীকুমার মানেন।[7] তবুও তিনি শেষমেশ 'ঐতিহ্যের শিল্পশালা'-র উপরেই আস্থা রেখেছেন, 'ঐতিহ্য গৌরবে প্রবুদ্ধ' হওয়ার কথা বলেছেন।[8] একেবারে সমসময়ে জহরলাল বসুর বক্তব্যও অনেকটাই স্বচ্ছ। যদিও সামগ্রিকভাবে তিনি শরীরী চাহিদাকে খুব উচ্চ মানের বিষয় বলে মানেন না। কিন্তু তিনি 'অতি-আধুনিক সাহিত্যিক'-দের সমাজ বিচ্ছিন্ন বলেও মনে করেন না। 'সাহিত্যে লক্ষ্য করিবার বিষয় আর একটী এই যে জনসমাজে যে সময়ে যা' রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, প্রচারপদ্ধতি, হাবভাব, বিলাস-কলা বা পোষাক-পরিচ্ছদের প্রচলন থাকে—'সেই সেই সময়ের সাহিত্য-সেবিগণ জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তাহা লিপিবদ্ধ

---

7 শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'আধুনিক ও অতি-আধুনিক সাহিত্যে জীবনবোধের তারতম্য', *সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে*, (কলকাতা: মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, বৈশাখ, ১৩৬৭), পৃ. ৩০৭।

8 তদেব, পৃ. ৩১০।

করেন...'।[9] ১৩৪৩ সন মানে ১৯৩৪ সালে দাঁড়িয়ে জহরলাল সাহিত্য সমালোচনায় লিখছেন, 'রবীন্দ্রনাথের নৌকাডুবি ও চোখের বালি এবং শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীন সংস্কারের সীমানা যাহাতে অতিক্রান্ত না হয় এই সাবধানতা ও আড়ষ্টতায় কত না ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। সমাজবদ্ধ পুরুষ ও স্ত্রীর চরিত্রকে বাঁচাইতে যাওয়ার চেষ্টাটাই রস-সৃষ্টির পক্ষে খুব মারাত্মক জিনিষ... আমাদের নব্য সাহিত্যিকগণ এই বাধা হইতে মুক্ত'।[10] প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের পরীক্ষা-নিরীক্ষাকেও তিনি আহ্বান জানিয়েছেন এই ভাষায়— 'যে সকল নূতন মানুষকে সাহিত্যের আসরে আনিয়াছেন, তাহাদের দেহের কদর্য্যতা, গ্লানি ও অপরিচ্ছন্নতা আমাদের কাহারও প্রীতিকর নহে। কিন্তু প্রীতি এক জিনিষ, অনুভূতি আর এক জিনিষ। এমন একটা সহানুভূতি তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে, মানুষের হীনতা, বীভৎসতা, পঙ্গুতা, অন্ধতা আমাদের চোখে পড়ে না উজ্জ্বলভাবে উদয় হয় মানুষের একটা নিরাবিল মনুষ্যত্ব'। '...বাস্তবিক বস্তি-জীবন শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র ও অচিন্ত্যের প্রত্যেকেরই লেখনিতে অতি স্পষ্ট, সহজ ভাবে ফুটিয়াছে। তাই ভাষাও হইয়াছে তাঁহাদের নূতন রকমের। এক, ভাষার দিক হইতে ইহাদের দান বড় কম গৌরবের নহে'।... 'সাহিত্য যখন রাজবেশে এবং উকিল ব্যারিস্টার কেরাণীর ধড়াচূড়া ত্যাগ করিয়া একেবারে কাঙ্গাল সাজিয়া দিন-মজুরের সহিত রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইল, ঘটনা ও রসের বৈচিত্র ত হইবেই'।[11] নব্য সাহিত্যে যৌনপ্রেমকে জহরবাবু সমর্থন জানাতে গিয়ে একটি অদ্ভূত যুক্তির অবতারণা করেছেন, 'তাহার প্রধান কারণ, যাহাদের জীবনে আলো ও আনন্দ

---

[9] জহরলাল বসু, *বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাস,* (কলকাতা: আইডিয়াল প্রেস, আষাঢ় ১৩৪৩), পৃ. ৩২৭।

[10] বসু, আষাঢ় ১৩৪৩, পৃ. ৩৩৫-৩৬।

[11] বসু, আষাঢ় ১৩৪৩, পৃ. ৩৩৪।

নাই, প্রেম তাহাদের প্রাথমিক খুধা না হইয়া পারে না'।[12] অর্থাৎ কিনা আলো-আনন্দের বিপ্রতীপে দাঁড়িয়ে মানুষের প্রেম বা যৌন আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর হয়ে থাকে। আত্মিক এবং দৈহিক বিভাজনের মধ্যে তিনি থাকবন্দী ক্রমবিন্যাস রচনা করেছেন। যেখানে দেহজ চাহিদার স্থান নিচে। কিন্তু বাংলা অথা ভারতের বিপর্যস্ত পরিস্থিতির সঙ্গে এই 'খুধা' সাযুজ্যপূর্ণ বলে স্বাগতও জানিয়েছেন। যৌনতা নিয়ে অপেক্ষাকৃত প্রবীণদের মধ্যে যে দোলাচলতা ছিল তা বোঝা যায়। একই সঙ্গে এই পরিবর্তনকে বোঝার চেষ্টাও চলেছিল সমান্তরালে। অচিন্ত্য সেনগুপ্তের প্রথম উপন্যাস *বেদে*-র পাঠ অভিজ্ঞতায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিভাকে স্বীকৃতি দিয়েও বলেছিলেন, '...কোনোকোনো বিষয়ে তোমার অত্যন্ত পৌনঃপুন্য আছে— বুঝতে পারি সেইখানে তোমার মনের বন্ধন। সে হচ্ছে মিথুনাসক্তি। ... এসম্বন্ধে উগ্রতা নরোয়ে প্রভৃতি দেশের সাহিত্যে দেখেছি। ... আমাদের দেশের শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে এই প্রবৃত্তির উৎসুকতা অনেকের মধ্যে আজকাল দেখা যায়।' রবীন্দ্রনাথ বাঙালি সমাজে 'মিথুনাসক্তি'-কে 'অশুচি রোগের মতই' বলে মনে করেছেন কারণ নরোয়ে ইত্যাদি দেশের বলিষ্ঠ প্রাণশক্তির মধ্যে প্রবৃত্তির সহজ উত্তাপ তিনি এখানে খুঁজে পাননি।[13] যৌনতা এবং মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কিছুটা রক্ষণশীল চিন্তাভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। গিরীন্দ্রশেখর বসু 'প্রবাসী' পত্রিকায়, শ্রাবণ ১৩৩৫ সালের 'রবীন্দ্রনাথ ও মনোবিশ্লেষণ' নামক প্রবন্ধে লিখছেন অনেক ক্ষেত্রেই 'সাইকোএনালিসটরা' কি বলেন কেন বলেন তা মানুষ বোঝে না, তাই বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের মধ্যেও অনেক ভ্রান্ত মত প্রচলিত আছে। সরসীলাল সরকার এবং রবীন্দ্রনাথের একটি আলোচনার কথা উল্লেখ করে তিনি জানিয়েছেন যে, সেই

---

[12] তদেব, পৃ. ৩৩৬।

[13] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অচিন্ত্য সেনগুপ্তকে লেখা চিঠি *বেদে* পাঠ করার পর, অচিন্ত্য গ্রন্থাবলী: ১, (কলকাতা: আনন্দধারা প্রকাশন, ১৩৩৫), পৃ. ১৫৪-৫৫।

আলোচনার সঙ্গে সাইকো-এনালিসিসের কোনো সম্পর্ক ছিল না। তাঁরা দুজনেই ‘সংজ্ঞান ও নির্জ্ঞানের পার্থক্য ভুলিয়া কথা বলিয়াছেন, এইজন্যই সাইকো-এনালিসিস-সম্বন্ধে তাঁদের মত গ্রাহ্য নহে।’[14]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একটি বিষয় উঠে আসছে যে বাঙালি বৌদ্ধিক পরিমণ্ডলে মনস্তত্ত্ব ও যৌনতা নিয়ে একটি সাড়া পড়েছিল। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে পুরানো ধ্যানধারণা পরিবর্তিত হয়েছিল বা নারীর যৌনতার প্রসঙ্গে কোনো নতুন ধারার জন্ম হয়েছিল। পুরুষ লেখকদের লেখায় যৌনতা ও নারী-পুরুষের সম্পর্কের প্রভূত বহিঃপ্রকাশ থাকলেও মেয়েদের লেখালিখিতে আমরা যৌনতা নিয়ে প্রায় কোনও প্রকাশই লক্ষ্য করি না। নারী জীবনের দৈনন্দিনতা, বৈধব্যজনীত যন্ত্রণার আলেখ্য, অধিকারের দাবি নানা লেখায় উঠে আসে। মহিলা ঔপন্যাসিকদের রচনায় প্রেমও ত্যাজ্য নয়, কিন্তু তা উপস্থাপিত হয় দৈহিক কামনার ঊর্ধ্বে পবিত্রতার মোড়কে। সব থেকে বড় কথা স্বামীর ও পরিবারের নির্যাতনের বিরুদ্ধে নারীরা প্রবন্ধে বা সৃষ্টিশীল রচনাগুলিতে ক্রমশ মুখর হতে শুরু করলেও মাতৃত্বের প্রতি আকাঙ্ক্ষার অমোঘ আকর্ষণ প্রায় সবর্ত্র লক্ষ্য করা যায়। নারী-পুরুষের রোম্যান্টিক বা আবেগের প্রকাশের ক্ষেত্র হিসাবে সাহিত্যের গুরুত্বের কথা রজতকান্ত রায় তাঁর *ইমোশানাল হিস্ট্রি* গ্রন্থে অনুপুঙ্খভাবে আলোচনা করে ছেন, সেকথা আগেই আলোচিত হয়েছে। তিনি মনে করেন ভারতীয় উপমহাদেশে নারী-পুরুষের সম্পর্কের বিস্তার ও তার চিত্রায়ণ ঘটেছে একটি বিশেষ পরিবেশে, যার কিছু বৈশিষ্ট্য প্রোথিত আছে দীর্ঘ পুরাতত্ত্বে আর কিছু পাশ্চাত্যের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ায়। ভারতীয় কাব্যিক ধ্যান-ধারণা খুবই যৌনতাময় এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণ, তবে প্রগাঢ়ভাবে রহস্যময় বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন, যার বিস্তার সৃষ্টিতত্ত্ব থেকে

[14] অমিতরঞ্জন বসু, ২০১৭, পৃ. ১৪৫-৪৬।

দেহজ কামনা পর্যন্ত।[15] প্রেমের প্রকাশের ক্ষেত্রে বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের ধারাবাহিকতা বজায় ছিল বলে তিনি দাবি জানিয়েছেন, যেখানে কামজ আকর্ষণের থেকে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে কামরহিত পবিত্র প্রেমের ধারণা। তাই মেয়েদের লেখালিখিতে যৌনতার বহিঃপ্রকাশের পরিবর্তে বিরহযন্ত্রণার মাধুর্যই প্রকাশিত হয়েছে বলে রায় মনে করেন। তাঁর মতে love বা কোর্টশীপের ধারণা পাশ্চাত্য থেকে আগত, এখানে সবাই তা গ্রহণ করেননি। রজতবাবুর মতে ব্রাহ্মণ-চামার, হিন্দু-মুসলমান, বিধবা-পরপুরুষ এই তিনটি হল বিরহী বা পরিণতিবিহীন প্রেমের প্রকৃত উদাহরণ, যেখানে *বিমূর্ত মিলন* বা *ভাবসম্মিলন* ঘটার সুযোগ পায়। বিংশ শতকের প্রথম দিকের বাংলা কাহিনি সাহিত্যে এই তিনটি উদাহরণের মাধ্যমেই আধ্যাত্মিক বা দৈব মিলন ফুটে উঠত। অন্যদিকে নারী-পুরুষের মিলনাত্মক পরিণতির জন্য প্রয়োজন হত পৌরানিক বা ঐতিহাসিক কাহিনির।[16] ব্যাখ্যা হিসাবে তিনি বলেছেন যে, 'Both the continuing strength of the pathetic-sublime in Indian literature and the change in the direction of romanticism can thus be related to a social situation lagging behind thought process'।[17] শ্রী রায় নিজেই উল্লেখ করেছেন যে, চিন্তা প্রবাহের সঙ্গে সামাজিক পরিস্থিতির মধ্যে একটা ফাঁক আছে। সামাজিক পরিবেশ ছিল অনেকটাই পিছিয়ে পড়া। নিঃসন্দেহে এই দ্বন্দ্বের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল একাধারে মর্মস্পর্শী মহিমার ঐতিহ্য এবং রোমান্টিকতার প্রতি ঝোঁক। একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথা রায় নিজেই উল্লেখ করেছেন। ললিত কুমার ১৯২০ সালে লিখেছিলেন *প্রেমের কথা* নামে একটি গ্রন্থ। সেখানে তিনি উক্ত ঘটনাটির কথা উল্লেখ করেছিলেন ১৯১৭ সালে কোনো

---

15 Rajat Kanta Ray, *Exploring Emotional History: Gender, Mentality and Literature in the Indian Awakening*, (New Delhi: Oxford University Press, 2003), 38.

16 Ray, 2003, 60-61.

17 Ray, 2003, 61.

একটি সংবাদপত্রে পড়ে। ঘটনায় বন্যার কবল থেকে একটি নমশূদ্র মেয়েকে বাঁচিয়েছিল কয়েকটি দৌলতপুর কলেজের ছেলে। ঘটনাটি থেকে ছেলেগুলির উপর কোনও 'উপন্যাসচিত সম্পর্ক'-এর মিথ্যা আরোপ পড়তে পারে বলে ধারণা করেছিলেন ললিত কুমার। যদিও হোস্টেলে নাটক-নভেলের কুপ্রভাব পড়েনি তবুও ঐ চামার মেয়ে এবং ব্রাহ্মণ তরুণদের সম্পর্কে এই বছরেই বিভূতিভূষণ ভট্ট মন্তব্য করেছিলেন, তাদের 'আগুনে শুদ্ধিকরণ' দরকার। এই ঘটনাটি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে শ্রী রায়ের মন্তব্যটিও গুরুত্বপূর্ণ— এটি একটি অদ্ভুত সামাজিক বাস্তবতা, যেখানে উদ্ভিন্ন আবেগের প্রতি আছে এক অভূতপূর্ব জোর, আর আবেগ প্রকাশের সম্ভাবনা চরম সংকীর্ন।[18] অর্থাৎ কিনা প্রবল আবেগ ইতিমধ্যেই মাথার ভিতরে তৈরি হয়েছে, কিন্তু জীবনের বাস্তবতা তাকে নাকচ করে চলেছে।

কিন্তু মেয়েদের লেখায় যৌনতার অভাব ব্যাখ্যার জন্য এই ব্যাখ্যা অতিসরলীকরণ এবং অসম্পূর্ণ বলে আমার মনে হয়। এই ব্যাখ্যায় নারীসমাজের উপর চেপে বসে থাকা প্রভূত্ববাদী পিতৃতান্ত্রিক সংস্কৃতির চাপের বিষয়টি লঘু হয়ে পড়ে। নারীর উপর আরোপিত সামাজিক শর্ত/ অবস্থা এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সেই শর্তাবলি দ্বারা নারীর অভিযোজন (condition and conditioning) – এই দুটি সমান্তরাল প্রক্রিয়ার কথা মাথায় রাখতে হবে। বিংশ শতকের বিশের দশকে জাতীয়তাবাদী প্রকল্পও কিন্তু একদিক থেকে নারীর যৌনতা সম্পর্কীত ধারণার পুনর্নির্মাণ ও নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করেছিল। রাধাকৃষ্ণের প্রেমের দৈহিক কামনার দিকটি অর্থাৎ শৃঙ্গাররস ধীরে ধীরে পিছনে সরে যেতে বাধ্য হয়েছিল। সেই রাজনৈতিক সমীকরণ নারীর মনস্তাত্ত্বিক কাঠামো এবং যৌনতা-ধারণা বোঝার ক্ষেত্রে অতন্ত্য গুরুত্বপূর্ণ। নারীকেই

[18] Ray, 2003, 1080.

অবশ্যম্ভাবীভাবে *পতিব্রতা* ও *সতীসাধ্বী*-র ভুমিকা পালন করে যেতে হল। কারণ ঔপনিবেশিক শাসনের প্রত্যুত্তরে নিজস্ব গর্বের 'ঐতিহ্য'-কে রক্ষারও দরকার ছিল পুরুষের এবং পুরুষশাসিত রাষ্ট্রের। বলাবাহুল্য সর্বদেশে সর্বকালে মেয়েরাই হয়ে থেকেছে ঐতিহ্যের ধারকবাহক। সুতরাং একটি বিষয় অত্যন্ত স্পষ্ট যে, নারী-পুরুষের আবেগ (বিশেষত পুরুষের)-এর রূপান্তরের একটি সুস্পষ্ট ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া দেখতে পাচ্ছি আমরা, যা কোনোভাবেই আর্থ-সামাজিক বা সাংস্কৃতিক পরিবেশ নিরপেক্ষ নয়। তাই নারীর প্রতি পুরুষের যে আধুনিক রোমান্টিক মনোভাব, love-এর প্রতি আকাঙ্ক্ষা বা তাদের আন্তঃসম্পর্কের অগ্রগতি হল অবিমিশ্র পাশ্চাত্য প্রভাবে নির্মিত এবং বাংলার ঐতিহ্যশালী প্রেমের উদযাপন কেবলমাত্র তুরীয় মিলনেই ঘটতে পারে এবং সেটাই পবিত্র ঐতিহ্যগত ধারাবাহিকতার সাক্ষ্য, এই যুক্তি বির্দিবাদে মেনে নেওয়া যায় না। কেন এই যুক্তি আধিপত্যকামী যুক্তি কাঠামোকেই আরও মজবুত (reinsforce) করে তা বোঝার জন্য ঔপনিবেশিকতা ও হিন্দু জাতীয়তার আন্তর্সম্পর্কের দিকে নজর দিতে হবে, যথারীতি এই সমবায়টি অত্যন্ত লিঙ্গায়িত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতীয় সাংস্কৃতিক বিন্যাসে পাশ্চাত্যের রোমান্টিক উপাদান গ্রহণের প্রক্রিয়াটি কোনো ধরণের বিদারণ বা ভাঙন ছাড়াই ঘটেছিল বা উপরিতলে সামান্য প্রভাব বিস্তার করেছিল, এই দুটির কোনটাই দাবী করলে ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ করা হয়। মধ্যযুগের কামজ/দেহজ উপমা-অলঙ্কারে পরিপূর্ণ সাহিত্যের ধারা কিভাবে অশ্লীলতার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিল বিশ শতকের শুরুতে, আবার একই সময় ক্রমবর্ধমান ছিল যৌনবলবর্ধকের বিজ্ঞাপন ও চাহিদা, এবং এই দুটি বিষয় কিভাবে হিন্দু আধিপত্যকামী পুরুষতন্ত্রের দুটি রূপ – তা সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন চারু গুপ্তা। হিন্দু ধর্মে একদিকে ছিল ব্রহ্মচর্যের সন্দর্ভ, অন্যদিকে অনিয়ন্ত্রিত যৌনতার উদযাপন— এই দুইটিকেই একই

সঙ্গে সম্ভাষণ করা হয়েছে। একদিকে যৌনতার প্রভূত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র ছিল অ-হিন্দু, নিম্নবর্গ এবং বিভিন্ন জনজাতি; অন্যদিকে উচ্চ সংস্কৃতির সামনে আদর্শায়িত হল যৌনতার উপর সংযম।[19] চারু দেখিয়েছেন জাতীয়তাবাদ, ঔপনিবেশিক নিষ্পেষণ, হিন্দু জাতীয়তা ঠিক কিভাবে নারী-পুরুষের সম্পর্কের গতিপ্রকৃতিকেও নির্ধারণ ও নারীর নতুন রূপকল্প নির্মাণ করেছিল। 'In a large part of canonised high Hindi literature, there was a gradual shift in emphasis from the erotic and sexually active nayika and Radha of medieval poetry to the chaste and virtuous Hindu wife and mother'.[20] মারি ই. জোন্স এবং জানকি নায়ার *আ কোশ্চেন অফ সাইলেন্স: দ্য সেক্সুয়াল ইকোনমিক্স অফ মডার্ন ইন্ডিয়া* গ্রন্থে দেখিয়েছেন কিভাবে ভারতবর্ষে যৌনতা 'নৈঃশব্দের ষড়যন্ত্র'-এ পরিণত হয়েছে।[21] অর্থাৎ সকলেই বিষয়টি নিয়ে অবহিত কিন্তু কেউ যেন প্রকাশ্যে না উচ্চারণ করে। অথচ নানা আকারে, বিভিন্ন রূপে সততই যৌনতার প্রকাশ ঘটে চলেছে বা বলা ভালো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন চলেছে তাকে ব্যবহার করে। বিশ শতকের ঔপনিবেশিক ভারতে নারীর শরীর এবং তার যৌনতার নিয়ন্ত্রণ ও নির্মাণ হিন্দু জাতিয়তাবাদী প্রকল্পের অংশ হয়ে উঠেছিল সেভাবেই।[22] তাই যৌনতা ও তার নিয়ন্ত্রণের অর্থনীতি (economy) ও সংস্থানকে বিশেষভাবে বোঝার প্রয়োজন দেখা গেছে ঐতিহাসিকদের মধ্যেও। যৌনতা সম্পর্কে কে হ্যাঁ বলছে আর কে না, সেটা নির্ধারন করা নয়। কে নিষিদ্ধকরন চাইছে

---

19 Charu Gupta, *Sexuality, Obscenity, Community: Women, Muslims and the Hindu Public in Colonial India*, (New Delhi: Permanent Black. 2005), 67.

20 Charu Gupta, 2005, 40.

21 Janaki Nair and Mary E. John, *A Question of silence: The Sexual Economy of Modern India*, (New Delhi: Kali for Women, 1998), 1-2.

22 Charu Gupta, 2005, বিশ শতকের ভারতের যৌনতা সম্পর্কীত আলোচনার জন্য একটি স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণ পাওয়া যায়। তিনি দেখিয়েছেন হিন্দুত্বের আধিপত্যকামী প্রতিষ্ঠান বা মতাদর্শ কিভাবে কার্যকরী হয়ে ওঠে পুরুষতন্ত্রের ভেতরে ও তার সাহায্যে।

কেইবা অনুমতি দিচ্ছে, কিম্বা কে যৌনতার উপর গুরুত্ব আরোপ করতে চাইছে কে অস্বীকার করছে সেটাও নয়; বরং যৌনতা যে আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে সেই তথ্যটি তুলে ধরা জরুরি। কে বলছে সেটা বোঝার তাগিদে, এবং কোন অবস্থান এবং দৃষ্টিকোণ থেকে কথাগুলি বলা হচ্ছে, কোন কোন প্রতিষ্ঠানগুলি জনগণকে এই সম্পর্কে উৎসাহ দিচ্ছে, এবং যা বলা বলা হচ্ছে তা কোথায় সংগৃহীত এবং পরিবেশিত হচ্ছে এই সবকিছুই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।[23] ভারতে শিল্প সংস্কৃতিতে নারীর উপস্থাপন হিন্দু অধিকারবোধের অন্যতম প্রধান লক্ষ্যে পরিণত হয়েছিল, যেখানে অশ্লীলতা, সতীত্ব, ঐতিহ্য এবং আধুনিকতার প্রশ্নগুলি ক্রমাগত প্রশ্নের সম্মুখীন হত। নতুন দেশ গঠনের স্বার্থে নতুন হিন্দু নারী পরিচিতি গঠন আবশ্যক হয়ে পড়েছিল। সেই কারণেই নারীর শরীর সংক্রান্ত বাচিক ব্যবস্থাপনার (discursive management) প্রয়োজন হয়।[24] চারু গুপ্তা দেখিয়েছেন, উনিশ কুড়ি-তিরিশের দশকে হিন্দু প্রকাশক-সাংবাদিকদের মধ্যে প্রচার ও পরিচিতি নির্মাণের একটি বিশেষ ধাঁচা দেখা গিয়েছিল: আধুনিক পরিচয়ের রাজনীতিতে লিঙ্গ-কেন্দ্রিকতা হয়ে উঠতে থাকে মৌলবাদী, বর্ণবাদী ও জাতীয়তাবাদীদের চর্চার অন্যতম ভিত্তি। হিন্দু আত্মপরিচয়ের রাজনীতির স্বার্থে জরুরি ছিল নারীকে পরিবারের অভ্যন্তরে, সামাজিক এবং গণপরিসরে সর্বত্র নিয়ন্ত্রণ করা। নারীর যৌনতা ও কৌমসত্ত্বার (ethnicity)-র সঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণভাবে জড়িয়ে ছিল প্রজনন-সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ। নারী হয়ে পড়ল একটি বিশেষ সামাজিক গোষ্ঠির বা কৌমসত্ত্বার (পাত্রভেদে রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীরও বটে) সন্তান(পুরুষ)ধারণকারী।[25]

---

23 M. Foucault, *History of Sexuality: The Will to Knowledge, Vol. 1*, trans. Robert Hurley, (Australia: Penguin Books, 2008), 11.

24 Charu Gupta, 2005, 3। এই বিষয়ে বিশদে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য Tanika Sarkar, *Hindu Wife, Hindu Nation: community, religion, and Cultural Nationalism*, (New Delhi: Permanent Black, 2001).

25 Charu Gupta, 2005, 4-8.

বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে উপরোক্ত আলোচনা একটু অন্যরকমভাবে হলেও প্রাসঙ্গিক। স্বভাবতই তার সামাজিক রাজনৈতিক বাস্তবতাও ভিন্ন, কিন্তু বিচ্ছিন্ন নয়। ঔপনিবেশিক শাসনের অধীন বাংলায় ইংরাজ প্রশাসকরা উনিশ শতকের বাঙালি পুরুষকে মেয়েলি বলে ব্যঙ্গ করত। বলাবাহুল্য, *effeminate Hindoos* শব্দবন্ধটির সঙ্গে জুড়ে ছিল অবজ্ঞা ও অবমাননাসূচক ইঙ্গিত। জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেমের ঐক্যবদ্ধ উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতই একটি দায় বাঙালিদের উপর বর্তেছিল এই পরিচিতি স্খালনের। বঙ্গিমের সময় থেকে বাংলার সশস্ত্র আন্দোলনের যুগ পর্যন্ত মেয়েলিত্বের অভিধা ঘুঁচিয়ে প্রকৃত পুরুষ তথা দেশমাতৃকার লড়াকু সন্তান হয়ে ওঠার প্রচেষ্টা গণপরিসর ও গণমানসে দেখা যেত। বঙ্গিমের অধিকাংশ রচনা (বিশেষত *আনন্দমঠ* এবং *কৃষ্ণচরিত্র*)-য় 'পুরুষালি' নায়ক প্রতিষ্ঠার চাহিদা ফুটে উঠেছে। দরকার হয়েছে প্রাচীন ভারতের চরিত্রদের 'যথেষ্ট পুরুষালি' নায়ক হিসাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠার। যে কারণে দেখা যায় সেই সময় নানা ধরণের সাহিত্যিক থেকে ঐতিহাসিক রচনায় বার বার উঠে এসেছে রাজপুত বা মারাঠা বলদীপ্ত, বীর্যশালী নায়কেরা। বঙ্গিম এই উদ্দেশ্যেই বাঙালির মডেল হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন 'কৃষ্ণচরিত্র'। গোপীপ্রেমমুগ্ধ গীতিকবিতার রসিক কৃষ্ণ নয়। বীরত্ব আর পৌরুষের আগুনে 'পরিশুদ্ধ' কৃষ্ণ। প্রেমের মতো দুর্বল আবেগের বন্ধনে সে আবদ্ধ নয়। তাছাড়া বঙ্গিম মনে করতেন, মহাভারতে ব্রজগোপীতত্ত্ব নেই, কৃষ্ণ সেই বিষ্ণুর অবতার যিনি মধু-কৈটব দমন করেছিলেন। *আনন্দমঠ* উপন্যাসে একদল দেশপ্রেমী সন্ন্যাসীর মুখ দিয়ে তিনি বলাচ্ছেন যে, তারা বৈষ্ণব হলেও চৈতন্যের ভাবধারায় বিশ্বাসী নয়। কারণ চৈতন্যের বৈষ্ণবধর্ম পূর্ণসত্য নয় অর্ধসত্য। চৈতন্য রাধাভাবে প্রেমধর্মের সাধনা করেছিলেন। কিন্তু ভগবান প্রেমময় নন, তিনি অনন্ত শক্তিময়। বঙ্কিম প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন, তিনি

তা বিশ্বাসও করতেন যে, রাধা ও গোপীগণ পরে বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের হাত ধরে ধর্মীয় আখ্যানে প্রবিষ্ট হয়েছে। তাই অর্বাচীন রাধা আর তার প্রেম আরাধনাকে, অতিরঞ্জন হিসাবে দেখে, তিনি মোটেই গুরুত্ব দিতে চাননি। যুগধর্ম পালন (দেশমাতৃকার সেবা ও পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন)-এর জন্য পরাক্রান্ত প্রেমবিমুখ শাক্ত কৃষ্ণই ছিল উপাস্য। 'অগ্নিযুগ'-এর বিপ্লবীদের এই ধারণা দারুণ প্রভাবিত করেছিল। ব্রহ্মচর্য আর পৌরুষ প্রায়শই একাকার হতে দেখা যায়, বিশেষত যুদ্ধ পরিস্থিতিতে। লড়াইয়ের সময় প্রেম, যৌনতা, গৃহ, গৃহস্থালী, সংসার সবই তুচ্ছ হয়ে যায়। তখন সামনে অনেক বড় সংগ্রাম। দেশ-কাল-পাত্রভেদে এই পুরুষালী মনোভাবের প্রকাশ সর্বত্র। ঠিক এই মনোভাব ও চর্যার বিপ্রতীপে দাঁড়িয়ে আছে রিটা ফেলস্কির কল্পিত 'জনপ্রিয় মহিমান্বিত/ পরম/ সীমাহীন'-এর ধারণা।[26] এই মহিমান্বিত বা পরমের সংযুক্তভাবে এসে পড়ে আরও কিছু ধ্যান ধারণা। যেগুলিকে আমারা নারীবাদী বীক্ষায় লিঙ্গ-সংবেদী হিসাবে ব্যবহার করতে পারি। এই জাতীয় লেখায় প্রেমকে সামাজিক রাজনৈতিক ঘটনার ঊর্ধ্বে স্থাপন করা যেতে পারে।

আমাদের দেশে বিশেষত বাংলায় রাধা বা রসতত্ত্বের বিশ্লেষণ ও আত্তীকরণ মোটেও একমাত্রিক বা সমভাবাপন্ন ছিল না। বিশ শতকের শুরু থেকেই গণপরিসর, সাহিত্য এবং প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে বৈষ্ণব কাব্য নিয়ে উৎসাহের জন্ম হয়। একদিকে যেমন রাধা-কৃষ্ণের প্রেম সাহিত্যে স্থান পাচ্ছে তার পাশাপাশি উঠে আসছে ব্রহ্মচর্য উদযাপনের আগ্রহ। বাংলা সাহিত্যেও বঙ্কিমের ভাবনা থেকে বড় প্রস্থান হিসাবে দেখা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথকে। তিনি বৈষ্ণবীয় ধারার রাধাকে, চেতনে ও সাহিত্যে স্থান দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক চেতনাতেই আনন্দ-বিরহ যূথবদ্ধতার যথেষ্ট প্রভাব।

[26] Felski, 1995, 119.

তিনি রাধাকে ধর্মতত্ত্ব হিসাবে গ্রহণ করেননি, বরং তাঁর কাছে রাধা কবির ব্যক্তিগত প্রেমের প্রকাশ ও অবলম্বন। রাধা তাঁর কাছে দেবী নয়, মানবী। রাধা নামটিই প্রণয় প্রকাশের সাধন বা অধিকরণ (means)। মনে রাখতে হবে, বাউল সহজিয়া ভাবনার যথেষ্ট প্রভাব ছিল রবীন্দ্রের উপর। রাধা শব্দটিকে উলটে দিলে হয় ধারা। সহজিয়া তত্ত্বে এই ধারা হল দেহরস, যাকে উর্দ্ধপানে চালনা করাই হল সাধনা। রবীন্দ্রনাথের কাছে অবশ্য দৈহিক বা মৈথুনের দিকটি কখনওই বেশি গুরুত্ব পায়নি। তিনি মন আর তার চরম প্রকাশ হিসাবে বিরহেরই সন্ধান করেছেন রাধার ভিতরে। দেশপ্রেমের জন্য রাধা বা রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে খারিজ করতে তিনি নারাজ। তার উপন্যাসগুলিতেও দেখা যায় তথাকথিত বীরত্বব্যাঞ্জক পুরুষের বদলে চরিত্রেরা প্রধাণত সংশয়ী। দেশপ্রেমের লড়াই আর ব্যক্তি-প্রণয় সেখানে পাশাপাশি চলতে পারে। ১৯২০-র দশকে লেখালিখির জগতে একটি ঘোষিত পরিবর্তনের সূচনা হয়। সেখানেও প্রেম হয়ে ওঠে প্রধান উপজীব্য। বরং পূর্বের সমস্ত সাহিত্যরীতিকে চ্যালেঞ্জ করে সরাসরি নারী-পুরুষের সম্পর্ক নিয়ে সরব হয়ে ওঠেন তরুণ কবি সাহিত্যিকরা। বলাবাহুল্য, এখানে প্রেম সরাসরি রাধার অনুষঙ্গে আসেনি। বৈষ্ণব গীতিকবিতার রেশ কোথায় কতদূর থেকে গেছে তা সম্পূর্ণভাবে সাহিত্য তত্ত্বের আলোচনা, বর্তমান পরিসরে তাকে ব্যপ্ত করা সম্ভব বা কাম্য নয়। কিন্তু বৈষ্ণব কাব্য কিভাবে বৌদ্ধিক মহলে নতুন ব্যঞ্জনায় আলোচ্য ও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠল, তার সামাজিক-রাজনৈতিক দিক নিয়ে কিছুটা আলোচনা করা দরকার।

বিশ শতকের বিশের দশক থেকে ‘বাঙালির জাতিগত পরিচয় গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরি, রাজনৈতিক নেতা চিত্তরঞ্জন দাশ এবং অর্থনৈতিক কর্মসূচির প্রবক্তা প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের’ অবদানের পাশাপাশি বিদ্যাচর্চার ধারাতেও একই

প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা চর্চা বিষয়ক বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছিল। এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন স্যর আশুতোষ মুখার্জী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হওয়ার আগে থেকেই তিনি বাংলাসহ অন্যান্য ভারতীয় ভাষা কিভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম এবং পরীক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্ভূক্ত করা যায় তা নিয়ে ভাবনা চিন্তার পাশাপাশি সক্রিয় পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছিলেন।[27] ১৯০৬ থেকে ১৯১৪ এবং ১৬২১ থেকে ১৯২৩ সাল তিনি পর্যায়ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯১০ সালে ম্যাট্রিকুলেশন থেকে বি.এ. পর্যন্ত মাতৃভাষাকে অবশ্যপাঠ্য এবং পরীক্ষার বিষয় হিসাবে রাখার প্রস্তাব রাখেন এবং তা পাশ হয়। অবশেষ ১৯৩২ সালে ম্যাট্রিকুলেশনে বাধ্যতামূলক ইংরাজি ভাষার জায়গায় বাংলা ভাষাও গ্রাহ্যতা পেলে আশুতোষের প্রচেষ্টা সফল হয়। অবশ্য তার আগেই ১৯২৪-এ তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল। ১৯২১ সালে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'দ্য অরিজিন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফ বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ' নামে যে গবেষণাপত্রটি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দিয়েছিলেন, তা প্রকাশিত হয় ১৯২৬ সালে। বাংলার জাতিগত, ঐতিহাসিক, ভাষাতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের এটি একটি আকর গ্রন্থ। 'সুনীতিকুমার পশ্চিমবঙ্গ, পুর্ববঙ্গ এবং উত্তরবঙ্গ অর্থাৎ রাঢ়, বঙ্গ ও বরেন্দ্রের বিবিধ বংশজাত মানুষদের মধ্যে এক "সাধারণ জাতীয়তা" (nationality) সাহিত্য ও সংস্কৃতির মধ্যে লক্ষ্য করেছিলেন। তার একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ছিল যে, খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলার আদিতম চিহ্ন পাওয়া যায়। গবেষণার আরেকটি দিক ছিল যে, বাংলার ভাষাগত পরিচিতি সত্তাকে তিনি ধ্রুপদী সংস্কৃতের সঙ্গে জুড়েছিলেন, যদিও পারসি শব্দভাণ্ডারের ঋণও স্বীকার করেছেন। ভাষাতত্ত্বের পাশাপাশি বাংলার সাংস্কৃতিক

[27] ভট্টাচার্য, ২০১৮, পৃ. ১০।

ইতিহাসেও সন্দর্ভটির একটি বিশেষ অবদান আছে।[28] সব্যসাচী ভট্টাচার্য আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, *শেষের কবিতার* অমিত রায়ের হাতে উপরোক্ত বইটি দেখা গিয়েছিল। অর্থাৎ কিনা কলকাতার বুদ্ধিজীবি মহলে তার চর্চা ছিল। আর সর্বসাধারণের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল বাঙালির ইতিহাস সংক্রান্ত গ্রন্থগুলি। ১৯২০-র দশকে সখারাম গনেশ দেউস্করের 'দেশের কথা' বাংলা ভাষার ইতিহাস চর্চার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিল বলা যায়।[29] এর আগেই হরপ্রসাদ শাস্ত্রী উদ্ধার করছেন প্রাচীনতম বাংলা পাণ্ডুলিপি চর্যাপদ, ১৯০৭-এ। দীনেশচন্দ্র সেন উনিশ শতকের শেষ থেকেই লিখে চলেছেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস। স্যর আশুতোষের উদ্যোগে ১৯১৯ সালে প্রথম বাংলা সহ ১২টি ভারতীয় ভাষায় স্নাতকোত্তর চালু হয়েছিল। এই বিষয়ে দীনেশচন্দ্র অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা নিয়েছিলেন। আশুতোষ অবশ্য স্নাতকোত্তর স্তরে আরও ৬টি পৃথক বিষয় চালু করেছিলেন – তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান, ফলিত রসায়ন, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতি এবং ইসলামিয় সংস্কৃতি। দীনেশচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র থেকেও জানা যায় যে, তিনিও বাংলায় এম.এ. পড়ানো নিয়ে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। এবং 'আশুবাবুর' সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করতে চেয়েছিলেন। মডার্ন রিভিউ পত্রিকার সম্পাদকের কাছে রবীন্দ্রনাথ এর সমর্থনে খোলা চিঠিও দিয়েছিলেন।[30] আশুতোষের উদ্দীপনা ও অনুপ্রেরণায় বাংলা সাহিত্য ও তার ইতিহাসের উপর বেশ কিছু বই লেখা হয়েছিল। এর আগে পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর মতো বাংলা ভাষায় মান্য কোনো পাঠ্য পুস্তক ছিল না। ভারতীয় তথা বাঙালি জাতীয়তা প্রতিষ্ঠার একটি বিদ্যায়তনিক প্রচেষ্টা বা আত্ম-প্রমাণের ইতিবাচক প্রকল্প শুরু

---

28 ভট্টাচার্য, ২০১৮, পৃ. ১০-১৪।

29 ভট্টাচার্য, ২০১৮, পৃ. ১১-১২।

30 বারিদরবণ ঘোষ, 'আশুতোষ ও রবীন্দ্রনাথ', *পুরশ্রী পত্রিকা,* (কলকাতা: জুন ২০১৩, আশুতোষ বিশেষ সংখ্যা), পৃ. ৫৪।

হয়েছিল। বাংলা ভাষা যে আদৌ অর্বাচীন নয় তা প্রমাণের তাগিদ বৌদ্ধিক মহলের প্রায় সর্ব স্তরেই দেখা যায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রিডার হওয়ার পর মূলত আশুতোষের উৎসাহে দীনেশচন্দ্র প্রাচীন বাংলা সাহিত্য, মধ্যযুগের বৈষ্ণব সাহিত্য এবং চৈতন্যের উপর বেশ কিছু প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এরপর থেকেই বাংলা ভাষা-সাহিত্য চর্চা সূত্রে বৈষ্ণব সাহিত্যের উপর গবেষণা বৃদ্ধি পায়। স্যর আশুতোষ সমগ্র বাংলা তথা ভারত থেকে তো বটেই, বিদেশেরও যোগ্য শিক্ষকের সন্ধানে থাকতেন। এর ফলশ্রুতিতে সি.ভি. রমন থেকে রাধাকৃষ্ণণ যেমন ছিলেন, তেমনই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে এসেছিলেন প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, সত্যেন্দ্রনাথ বোস, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ। রমেশচন্দ্র ১৯১৪ থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত অধ্যাপনা করেছিলেন। তাঁর নিজের ভাষায়, 'এই সাত বৎসর আমার ভবিষ্যৎ জীবন গঠনের প্রধান ভিত্তি'। আশুতোষ কেবলমাত্র যুবক রমেশচন্দ্রকে নিয়োগ করেননি, একদম প্রথম থেকেই তরুণ অধ্যাপকদের বয়স্ক অধ্যাপক কর্তৃক নানাবিধ উৎপীড়ন থেকে আড়াল করা বা রীতিমত নির্দেশ দিয়ে গবেষণা কিম্বা বই লেখার কাজে নিযুক্তও করেছিলেন।[31] দীনেশচন্দ্রের পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে বৈষ্ণব সাহিত্য ও রসশাস্ত্র নিয়ে গবেষণা শুরু করেন আরও অনেকে। তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য হলেন – প্রমথনাথ তর্কভূষণ, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, সুকুমার সেন, বিমানবিহারী মজুমদার, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কালিদাস রায় প্রমুখ।[32] সুতরাং বলা যায়, বঙ্কিমের রাধার ধারণা থেকে বিশ শতকের বিশের দশকের বাঙালি বেশ কিছু দূর সরে এসেছিল। বঙ্কিমের মনোভাব যেমন অনেকটাই ঔপনিবেশিক প্রতিক্রিয়াজাত, এখানেও সেই জাতীয়তাবোধের সদর্থক

---

31 রমেশচন্দ্র মজুমদার, *জীবনের স্মৃতিদীপে*, (কলকাতা: জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৯), পৃ. ২৫-২৬।

32 শশীভূষণ দাশগুপ্ত, *শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ*, বিশ্বজিৎ রায় লিখিত ভূমিকা, (কলকাতা: এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং., ১৯১৪), পৃ. xvii।

ভিন্নরূপ দেখতে পাই আমরা। তবে পরবর্তী এই যাত্রা অনেকবেশি জ্ঞান বা বিদ্যাচর্চাগত। তরুণ সাহিত্যিকদের প্রায় সকলেই নিয়মিত বিদ্যাচর্চার সঙ্গে যুক্তও ছিলেন, তাই ১৯২০-র দশক ও তার পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব রসের বা ভাবের ধারাবাহিকতা খুঁজতে চাইলে, এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটি স্মরণে রাখা প্রয়োজন। যৌনতার উর্দ্ধে *বিরহ* বা *বিমূর্ত মিলন* যে উনবিংশ শতকের শেষের দিকে ও বিংশ শতকের শুরুতে বিশেষ মাত্রা পেয়েছিল তার অর্থনীতি মধ্যযুগের চিন্তাচেতনার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ফলে ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত বিচার করা অত্যন্ত জরুরি।

রিটা ফেলস্কি দেখিয়েছেন মেয়েদের লেখায় আধুনিক উপাদানগুলির মধ্যে থাকতে পারে— নারীর আন্তর্সম্পর্কের বহুস্বর, বহুস্তর, নারীর যাপন/ দৈনন্দিনতা: আধিপত্য-স্থায়ীত্ব-শৃঙ্খলার বিপ্রতীপে অবস্থান, লিঙ্গকেন্দ্রিকতার বিরোধিতা, আধুনিক বিষয়ী হিসাবে অ-সক্রিয়, অনিশ্চিত, তথাকথিক অ-প্রকাশ্য নারী সত্ত্বার উন্মেষ ইত্যাদি,[33] যার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই বাংলা সাহিত্যেও। সাহিত্যের পরিসরে নয়, কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমি একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করতে চাই নারীর নিঃশব্দ যৌন-প্রতিরোধের সাক্ষর হিসাবে। ষোলো-সতেরো বছরের অবিবাহিত তরুণী ভুবনেশ্বরী ভাদুরী ১৯২৯ সালে আত্মহত্যা করেছিল উত্তর কলকাতায় তার বাবার বাড়িতে। গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক ঘটনাটির কথা লিখেছেন। জাতীয়তাবাদী কোনও একটি দলের সঙ্গে অবিবাহিতা ভুবনেশ্বরী যুক্ত ছিল। তার উপর দায়িত্ব ছিল রাজনৈতিক গুপ্তহত্যার। দায়িত্বটি পালন করতে না পারার গ্লানিতে সে আত্মহত্যা করে। তার আত্মহত্যার প্রকৃত কারণ কিছুদিন পর জানা গেলেও খুব স্বাভাবিক ভাবেই যুবতী মেয়ের আত্মহত্যার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে অবৈধ প্রেম, অবাঞ্ছিত গর্ভধারণ থেকে শুরু

[33] Felski, 1995, 2-5.

করে বেশি বয়সেও অবিবাহিতা থাকার গঞ্জনা ইত্যাদি। তার নিজের পরিবারের মধ্যেই বহুদিন পর্যন্ত মৃত্যুকে কেন্দ্র করে এই জাতীয় পরনিন্দা-পরচর্চা জারি ছিল। ঘটনাটি এখানেই শেষ হলে তার তাৎপর্য হত সীমিত। কিন্তু ভূবনেশ্বরী তার মৃত্যুর জন্য একটি বিশেষ সময়কালকে নির্ধারণ করে অনেকগুলি মাত্রা সংযুক্ত করেছে। শুধুমাত্র নিজের শরীরকে নয়, মৃত্যুকেও সে ব্যবহার করেছে প্রতিবাদের হাতিয়ার হিসাবে। আত্মহত্যার করেছিল সে রজঃস্বলা অবস্থায়। তার এই ইঙ্গিত বিস্থিত করে দিয়েছিল অনেকগুলি পুরুষতান্ত্রিক নির্মাণকে। প্রথমত অবাঞ্ছিত গর্ভধারণের সম্ভাবনাকে সে মূলেই নস্যাৎ করেছে। তাছাড়া সতীত্ব ও পবিত্রতার মান্য ধারণাকেও সে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে। রজঃস্বলা অবস্থাকে মনে করা হয় নারীর অপবিত্র সময়। এই সময় 'সতী' হওয়ারও উপায় থাকে না। রজঃস্বলা বিধবাকে প্রকাশ্যে চারদিন অপেক্ষা করার পর স্নান করে চিতায় ওঠার অনুমতি দেওয়া হয়। স্পিভাকের মতে ভূবনেশ্বরীর ঘটনা 'সতী' হিসাবে আত্মবলিদানের সামাজিক পাঠের উপর নিম্নবর্গের পুনর্লিখন। আমি এই ঘটনার উল্লেখ করলাম কারণ নারী এবং তার যাপনের উপর সামাজিক অনুশাসনের চাপে তার প্রতিবাদের প্রকাশভঙ্গিমাকেও খুঁজে নিতে হয় অচেনা বা অভূতপূর্ব পথ।[34] প্রথাগত প্রকাশ সেখানে নাও দেখা যেতে পারে। নারীর প্রাত্যহিকতা এবং যন্ত্রণার আলেখ্যেও হয়ত বিধৃত থাকতে পারে অপরাপর পাঠ। নারীর যৌনতার প্রকাশ তার বিষয়ীসত্তার নির্মাণের সঙ্গে যা অঙ্গাঙ্গী জড়িত।

উদাহরণ স্বরূপ আধুনিক বিষয়ী স্বত্বা হিসাবে বিধবার উত্থানের প্রসঙ্গ আরেকবার আলোচনা করা যায়। প্রতিটি পরিবারের বিধবাদের কাহিনি ছিল প্রধানত এক এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের অবস্থার তেমন কোনও পরিবর্তন হয়ত ঘটেনি।

---

[34] Gayatri Chakrabarty Spivak, *Can the Subaltern Speak? Reflection on the History of an Idea*, edited by Rosalind C. Morris, (New York: Columbia University Press. 2010), 103-104.

এক্ষেত্রে মূলত বয়োজ্যেষ্ঠ নারীদের একাংশ সংসারের উপর প্রশ্নাতীত কর্তৃত্ব স্থাপন করে অনুশাসনের ধারক বাহক হয়ে উঠেছিলেন। এমনকি বৈধব্যের নিয়ম কানুন কোনো বিচ্যুতি ছাড়া মানা হচ্ছে কিনা তার উপরেও থাকতো তাদের কঠোর দৃষ্টি। সেই অর্থে পরিবারের কনিষ্ঠদের কাছে তারাই হয়ে উঠেছিলেন প্রধান নির্যাতক। সমসময় থেকে পরবর্তী কালের সাহিত্যে তার উদাহরণ ছড়িয়ে আছে। প্রসঙ্গত রাধারানী দেবীর মায়ের কথা ও পাশাপাশি শাশুড়ির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে পরস্পর বিরোধী উদাহরণ হিসাবে। মা যেখানে তেরো বছরের কিশোরী মেয়ের বৈধব্য মেনে চলার পক্ষে ছিলেন তীব্রভাবে কঠোর, সেখানে মেয়েটির একাকীত্ব এবং যন্ত্রণা ঘোচানোর জন্য তাকে পড়াশোনার করার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে দিয়েছিলেন শাশুড়িই। বৈধব্যের অনুশাসন তার উপর থেকে যথাসম্ভব সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। এমন উদাহরণও অপ্রতুল নয় যেখানে কোনো কোনো মেয়ে তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া বৈধব্যের অনুশাসনের বিরুদ্ধাচরণ করত (আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাসত্রয়ী যার উৎকৃষ্ট উদাহরণ)। তাছাড়া উনবিংশ শতকের শেষের দিক থেকে সমাজ জীবনে বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছিল। মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি পায়, জনপরিসরে মেয়েদের যোগদানের সুযোগ তৈরি হয়, বাল্যবিবাহের সংখ্যা কমতে থাকে। কল্যাণী দত্তের সংগৃহীত বিধবাদের আত্মকথাগুলিই এইসব পরিবর্তনের সাক্ষ্যবাহী। কোনো সন্দেহ নেই যে বৈধব্যের এই সমস্ত প্রশ্ন সামনে এনেছিল উচ্চবর্ণীয় বাঙালি সমাজের পিতৃতান্ত্রিক ও পিতৃস্থিত (patrilocal)[35] কৌম ব্যবস্থার সমস্যাগুলি। কিন্তু দীপেশ চক্রবর্তী মনে করেন যে, ঔপনিবেশিক শাসনের আগে পর্যন্ত বিধবাদের উপর অত্যাচার ঘটতে থাকলেও তা বাঙালি সমাজের মূলগত সমস্যা ('thematized problem')

[35] Patrilocal: relating to a pattern of marriage in which the couple settles in the husband's home or community, the residence pattern, Oxford Dictionary.

হিসাবে চিহ্নিত করা শুরু হয়নি।[36] মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে নারী বিভিন্ন সমস্যার কথা উঠে আসত কিন্তু বিশেষ করে বিধবার অশ্রুত কণ্ঠস্বরকে লিপিবদ্ধ করার প্রয়াস দেখা যায়নি। সতীদাহপ্রথা কেন্দ্রিক প্রশ্নগুলি উঠতে শুরু করেছিল ১৮২০ এবং ৩০-এর দশকে সেই সময় থেকে বিধবাদের বিষয়টি শাসক ও শাসিত উভয়ের কাছেই নতুন করে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এরপর থেকেই অর্থাৎ ১৮৭০ থেকে ১৯২০-র দশক পর্যন্ত বাঙালি সাহিত্যে বিধবা এবং তার সংকটাপন্ন দশা অন্যতম উপজীব্যে পরিণত হয়েছিল। একশ বছরের বেশি সময়কাল জুড়ে – বাস্তব জীবনে এবং সাহিত্যে – বাঙালি হিন্দু বিধবারা তাঁদের জীবনের আখ্যান সাহিত্যের বিভিন্ন ধারায়, গল্প উপন্যাস স্মৃতিকথা আত্মজীবনী, নিজেরাই প্রকাশ করেছেন। আধুনিক বৈধব্যের এই ইতিহাস (বা বলা ভালো ইতিহাসবাদের অংশ হয়ে ওঠা) বহু গবেষককে আকৃষ্ট করেছিল। ঔপনিবেশিক সন্দর্ভ এবং মেয়েদের অবস্থানের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারিত হল এই প্রক্রিয়ায়। নির্দিষ্ট করে বললে ব্রিটিশ শাসকের কাছে 'মহিলাদের অবস্থা' হয়ে উঠেছিল সভ্যতার মানের মাপকাঠি। স্বভাবতই বাংলার সামাজিক সমালোচনা ও সংস্কারের সন্দর্ভটিও কেন্দ্রীভূত হয়েছিল সতী এবং বিধবাবিবাহকে কেন্দ্র করে। এই সমস্ত বিতর্কের সমান্তরালে একটি সম্পূর্ণ পৃথক দৃষ্টিকোণ পেশ করেছেন দীপেশ। 'পীড়িত বিধবা' এই সাধারণ চরিত্র নির্মাণের মধ্য দিয়ে বাঙালি ইতিহাসে একটি সমষ্টির জন্ম হয়েছিল। সেটি হল অনেক ব্যক্তি এবং বৈধব্যের অভিজ্ঞতার অনেক চেনা স্মৃতির মধ্যে থেকে উঠে আসা একটি 'গণ' অতীত। দীপেশ এখানে প্রশ্ন তুলেছেন একাধারে দুই ধরণের স্মৃতি, গণ এবং ঘরোয়া, কি ধরণের বিষয়ী (সাবজেক্ট)-র জন্ম দিতে পারে? কিভাবে একজন আধুনিক এবং সমষ্ঠিগত বাঙালি বিষয়ীর ইতিহাস রচনা করতে পারে, যে নিজেই চিহ্নিত হয়ে

[36] Chakrabarty, 2000, 118.

আছে অত্যাচার এবং ক্ষত প্রত্যক্ষ করার এবং লিপিবদ্ধ করার ইচ্ছে দ্বারা?[37] একটি সাধারণীকৃত এবং অবশ্যম্ভাবীভাবে বিমূর্ত দর্শকের অবস্থান থেকে পীড়নকে চিহ্নিত করা এবং লিপিবদ্ধ করার যে ক্ষমতা (এমনকি যদি নিজের কষ্টভোগ হয় তাহলেও), সেটাই আধুনিক সত্ত্বার জন্মকে সূচীত করে। আদর্শগতভাবেই এই সত্ত্বা সাধারণীকরণযোগ্য (generalizable)। অর্থাৎ এখানে সহানুভূতির সামর্থ্যকে দেখা হচ্ছে মানব চরিত্রে সাধারণভাবে নিহিত থাকা একটি গুণ হিসাবে, কোনো বিশেষ ব্যক্তির বিশেষের বৈশিষ্ট্য হিসাবে নয়।[38] এক্ষেত্রে একটি সমালোচনামূলক পার্থক্য করা দরকার অত্যাচার প্রকাশের ক্রিয়া এবং অত্যাচারিতের মুখোমুখি হওয়া বা তাকে পর্যবেক্ষণ করার ক্রিয়ার মধ্যে। অত্যাচারের কথা প্রকাশ করা অনেক পুরানো সমবেদনামথিত অভ্যাস। কিন্তু অত্যাচারিত যিনি তিনি হলেন মূর্ত, বিশেষ একজন ব্যক্তি। শুধুমাত্র তার প্রতি সমবেদনাই আধুনিক বিষয়ী নির্মাণ করে বলে দীপেশ মনে করেন না। বরং যে ব্যক্তি নিজে সরাসরি অত্যাচারিত নয়, কিন্তু সাধারণীকৃত অত্যাচারের ছবি তার মধ্যে জাগিয়ে তোলে সমবেদনা এবং তার সম্ভাবনা আছে আনুষঙ্গিকভাবে অত্যাচারিত হওয়ার, এবং যিনি একাধারে সেই অত্যাচারকে নথিভূক্ত করেন সামাজিক হস্তক্ষেপের উদ্দেশ্যে – তিনিই আধুনিক বিষয়ীর প্রতিভূ।[39] আমরা এই আধুনিক বিষয়ীসত্ত্বা নিয়ে এত আলোচনা করলাম কারণ মেয়েদের লেখালিখির বিষয় এবং প্রকাশভঙ্গিমা অনুধাবনের জন্য এই তাত্ত্বিক ভিত্তির প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। এই আধুনিক বিষয়ী একাধারে অনুভব করছেন যে তিনি (নারী/পুরুষ) একজন মানুষ যে প্রত্যক্ষ করছে, আবার একই সঙ্গে একটি বিশেষ অত্যাচারিত মানুষ। অর্থাৎ তিনি দ্বিধাবিভক্ত

[37] Chakrabarty, 2000, 118-119.

[38] Chakrabarty, 2000, 119.

[39] Chakrabarty, 2000, 119-20.

অত্যাচারিত ও প্রত্যক্ষকারী দুটি ভূমিকায়। রামমোহন থেকে শুরু করে বিদ্যাসাগর কর্তৃক বিধবাদের জীবন নিয়ে বেশ কিছু আইনি হস্তক্ষেপের ফলে যন্ত্রণার ধর্মীয় ব্যাখ্যা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ধর্মে যন্ত্রণা হল অস্তিত্ববাদ সংক্রান্ত। কিন্তু সামাজিক চিন্তায় তা নয়, এখানে তা বিশেষ একটি সমস্যা, যন্ত্রণার নিরাময়ই এখানে কাম্য। ফলত সেকুলার হস্তক্ষেপের পথ খুলে গেল। সুতরাং রজত রায় সাহিত্যে প্রকাশিত যন্ত্রণাকে যেভাবে অস্তিত্ববাদী বর্গ হিসাবে ধরে নিয়ে তাকে বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের ধারার ধারাবাহিকতা বলে দেখিয়েছেন তা প্রশ্নের ঊর্ধ্বে নয়।

একই সঙ্গে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও গণ অতীতের বোধ যেমন উপরোক্ত বিষয়ীর অন্তর্গত বৈশিষ্ট্য। তেমনই অন্দর বা 'অন্তঃস্থ' বা ব্যক্তির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও কামনা (অনুভূতি, আবেগ, করুণা)–র এবং সর্বজনীন বা গণ-যুক্তির মধ্যে টানাপোড়েনের ফলে উদ্ভূত হয় বাংলা সাহিত্যের নতুন বিষয়ী। কেউ বলতে পারেন যে, এটাই সেই বিরোধিতা যা নিজেকে প্রকাশ করে আধুনিকতার অন্দর বাহিরের বিভাজনের মধ্যে। ইউরোপে আধুনিক বিষয়ীর জন্মই হচ্ছে অন্তঃস্থ-র টানাপোড়েনের ফলে। যুক্তি সেখানে সবসময় হয়ে উঠতে চাইছে পথপ্রদর্শক ও নিয়ন্ত্রক। অর্থাৎ যুক্তি হল সর্বজনীন এবং গণ বা বাহির এবং আবেগ হল অন্তঃস্থ। এবং আবেগ-যুক্তির সম্পর্ক হল শিশু-শিক্ষক-সম্বন্ধীয়, উচ্চ নীচ সম্পর্কযুক্ত (পেডাগগিক)। আবেগ ও ভাবপ্রবণতাকে আধুনিক হয়ে উঠতে হলে চাই যুক্তির নির্দেশ মেনে চলা। আর এভাবেই বাঙালি বিধবাদের অভিজ্ঞতা সংরক্ষণ ও পর্বেক্ষণের মধ্যে দিয়ে আধুনিক বিষয়ী গড়ে ওঠার মানে শুধু বিধবাদের বাহ্যিক অবস্থার বর্ণনা করা নয়, বরং পাশাপাশি তার অন্তরের যন্ত্রণার অভিব্যক্তি,

যুক্তির সঙ্গে আবেগের সংঘাতই তাকে আধুনিক বলে চিহ্নিত করে।[40] প্রথমদিকের সংস্কারকদের মধ্যে এই বোধ অনুপস্থিত ছিল বলে দীপেশ চক্রবর্তী মনে করেন।

এই প্রসঙ্গে উদাহরণ হিসাবে আমরা সাহিত্যিক রাধারাণী দেবীর কথা উল্লেখ করব। মূলত কবি হলেও তাঁর প্রবন্ধের সংখ্যা অনেক, আর আছে বারো বছর অন্তরালে থাকা তাঁর দ্বিতীয় সত্তা 'অপরাজিতা দেবী'-র বেশ কয়েকটি কবিতার সংকলন। যে বিষয়টি সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ, তা হল তাঁর গল্পের বিপুল ভাঁড়ার যার সম্বন্ধে কন্যা নবনীতাও অনেকদিন পর্যন্ত অবহিত ছিলেন না, যা লেখা হয়েছিল নবনীতার জন্মের আগে (১৯৩৮) বা নরেন্দ্র দেবের সঙ্গে তাঁর দ্বিতীয় বিবাহেরও (১৯৩১) আগে। নবনীতার নিজের কথায়, 'তরুণ ভাবনাগুলিকে মা কি পরিণত বয়সে অস্বীকার করতেই চেয়েছিলেন?'[41] নবনীতার নিজের বিশ্লেষণে 'সতীত্ব মনুষ্যত্বের সংকোচন না প্রসারণ'-এর মতো বলিষ্ঠ নারীবাদী প্রবন্ধ রচয়িতা রাধারাণী দত্তের উপর বাল্য বৈধব্যের গভীর অভিঘাত ছিল, যা জন্ম দিয়েছিল ও গভীরে প্রোথিত করেছিল তথাকথিত নৈতিকতা ও মূল্যবোধকে। পরবর্তীকালে সেই শৃঙ্খল মুক্ত স্বাধীনচেতা রাধারাণী দেবীর মধ্যে তরুণী রাধারাণীকে আর খুঁজে পাননি নবনীতা। তাঁর লেখা থেকেই জানা যায় প্রখ্যাত ঐতিহাসিক তপন রায়চৌধুরি গল্পগুলি সংকলিত করতে বলেন 'মধ্যবিত্তের সামাজিক মূল্যবোধের বিবর্তন'-এর স্মারক হিসাবে।[42] রাধারানীর (অবশ্যই অপরাজিতা দেবীরও) সমস্ত রচনা বিশ্লেষণের দাবি রাখে। রাধারাণী প্রসঙ্গে গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের সাম্প্রতিক একটি অন্তর্দৃষ্টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্পিভাকের মতে রাধারাণী দেবী নিম্নবর্গায়িত (subalternized)। কারণ ব্রহ্মচর্য হল (এক্ষেত্রে বৈধব্যজনিত) নারী ও

---

40 Chakrabarty, 2000, 131.

41 অভিজিৎ সেন, (সংকলিত), *রাধারাণী দেবীর রচনা-সংকলন* ১ (প্রথম সং.), (কলকাতা: পুস্তক বিপনি, ১৯৯৯), পৃ. নবনীতা দেবসেনের ভূমিকা ৬।

42 তদেব, ৮।

পুরুষের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অসম বিষয়ী নির্মাণের একটি প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়াকে প্রতিরোধের নতুন বয়ান তৈরী করেছিলেন রাধারাণী তাঁর অভিনব জীবন ও শিল্পচর্চার মধ্য দিয়ে। কোনো চরমপন্থা অনুসরণ করে নয়, প্রাত্যহিক পিতৃতান্ত্রিক বাচনকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন পরম শত্রুকে 'হ্যাঁ' বলার মাধ্যমে। তাঁর দ্বিতীয় সত্তা তিনি নিজেই, আবার তাঁর থেকে পৃথকও বটে। তিনি সার্থকভাবেই অপরাজিতা কারণ অন্দর/বাহিরের বিপরীত যুগ্মপদের ভাষ্যকে তিনি অতিক্রম করেছিলেন শুধুমাত্র কল্পনাশক্তির সক্রিয়তা ('imaginative activism') দিয়েই।[43] আধিপত্য আর বিরোধিতার চেনা অক্ষে তিনি আবর্তিত নন। নির্যাতিতা বিষয়ীর চেনা ছকে তিনি ধারিত হন না। তাই নারীর কণ্ঠস্বরকে খুঁজে বার করার বদলে হয়তো আমাদের উচিৎ নৈঃশব্দকে চিহ্নিত করতে পারা, তার উপস্থিতি নয় বরং অনুপস্থিতি, সেই প্রচেষ্টাকে খুঁড়ে বার করা যা হয়তো ইতিমধ্যেই ব্যর্থ হয়েছে। অন্তর্ঘাতমূলক শক্তির প্রতি রাধারানী দেবীর যে আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়, তাকে জাক দেরিদার 'অবিনির্মানের আন্দোলন' ('movements of deconstruction')-এর সঙ্গে সমার্থক বলা যেতে পারে।[44] এই প্রক্রিয়ার হয়ত আমরা একটি ঐতিহাসিক সময়ের ব্যক্তিগত মননকে কিছুদূর পর্যন্ত বুঝতে সক্ষম হব।

দীপেশ চক্রবর্তী দেখাচ্ছেন বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথের প্রথমদিকের উপন্যাসে বিধবার নিষিদ্ধ প্রেম ছিল অন্যতম উপজীব্য। প্রথমদিকের উপন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এটি কারণ বিধবার অস্বীকৃত প্রেম ও তার ব্যার্থতার মধ্যে দিয়ে একজন ব্যক্তি-মানুষের সমাজের কাছে সম্পূর্ণ নতজানু হওয়া উপস্থাপিত হত। বিধবার মধ্যেই সেই প্রকাশোন্মুখ বিষয়ীকে চিহ্নিত করা যেতে পারত যে আত্ম-

---

43 Gayatri Chakravorty Spivak, *Inaugurating Gender*, First Radharani Debi Memorial National Lecture. Organised by School of Women's Studies, (Kolkata: Jadavpur University, 2019).

44 Jacques Derrida, *Of Grammatology*, trans. Gayatri Chakrabarty Spivak, (New Delhi: Motilal Banarsidass, 1994), p. 24.

পরিচিতির জন্য চিৎকার করছে।[45] তিনজন ঔপন্যাসিকের হাত ধরে বাংলা সাহিত্যে বিষমলিঙ্গ সম্পর্ক বা প্রেমের প্রকাশ ঘটেছিল। তবে সেই প্রেমের ধারণার মধ্যেও একটি মোচড় ছিল, সেটি হল পবিত্রতা নামক শব্দটি। ১৮৭০-১৯২০ পর্যন্ত সাহিত্যে ধর্মনিরপেক্ষ মানবী প্রেমের মাপকাঠি ছিল পবিত্রতা।[46] কামনারহিত ভালোবাসা। যন্ত্রণাকে ফুটিয়ে তোলার একটি তথ্যচিত্রমূলক[47] দৃষ্টিভঙ্গী ছিল বলা যায়। দীপেশের মতে এই পবিত্রতা হল 'a set of techniques of interiority'। যার মাধ্যমে বিষয়ীর আত্মস্থ-র কাছে যা কিছু বাইরের – শরীর, স্বার্থ, সামাজিক প্রথা ও সংস্কার – তাদেরকে অতিক্রম করে যাওয়া যায়।[48] তাহলে কি এই দাবি করা যায় যে বিশের দশকের লেখকরা জ্ঞাতসারে শুধু শরীর নয়, পবিত্রতার সঙ্গে সম্পৃক্ত নানা সামাজিক অনুশাসনেরও বিরোধিতা করেছিলেন। নারী-পুরুষের সম্পর্ককে নানাভাবে বোঝার প্রচেষ্টা তাদের লেখায় লক্ষ্য করা যায়। নাগরিক সমাজে নারী-পুরুষের সমানাধিকারের দাবি ঘরের ভিতরে ও বাইরে ক্রমশ উঠে আসছিল।

সেই সময়কার মননের একটি বিশিষ্ট ছবি ধরা পড়ে বিনয় সরকারের 'মেয়েদের পুরুষ-সাম্য' প্রবন্ধে। তিনি 'পুরুষ-সাম্য' বা "ম্যাসকুলিনিজেশন" পরিভাষা ব্যবহার করেছেন।[49] ১৯০৫-১৪ সনের আন্দোলনে যার সূত্রপাত নয় বলে তিনি মনে করেন। ব্রাহ্ম সমাজের কাজের ফলেও এই মেয়েদের আন্দোলনের সূচনা হয়নি। যদিও কোনো সভায় বা সর্বজনীক প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের ছায়া হয়ত দেখা যেত। কিন্তু স্ত্রী-স্বাধীনতার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ যোগাযোগ তখনও ঘটেনি। মেয়েদের স্বাধীনতাকেই তিনি

---

45 Chakrabarty, 2000, 133.

46 Chakrabarty, 2000, 134.

47 Chakrabarty, 2000, 136.

48 Chakrabarty, 2000, 138.

49 হরিদাস মুখোপাধ্যায় এবং অন্যান্য, ২০০০, পৃ. ২৪৩।

অভিহিত করেছেন *পুরুষ-সাম্য* নামে। অর্থাৎ তাঁর ভাষায় 'পুরুষরা যা-কিছু করে মেয়েরাও তার সব-কিছুই করতে সমর্থ কর্মদক্ষতায়, মুড়োর শক্তিতে, চরিত্র-বলে মেয়েতে-পুরুষে কোনো তফাত নেই'।[50] পরিভাষাটি নিয়ে আজকের নারীবাদী তত্ত্বায়নে আপত্তি বা বিতর্ক থাকলেও, বিষয়বস্তু নিঃসন্দেহে সেকালের নিরিখে বেশ স্বচ্ছ। 'পুরুষ-সাম্যে'-র দৃষ্টান্ত –'মেয়েরা আইন-সভায় গিয়ে বসছে, পুরুষের সঙ্গে সমানে সমানে কাজ চালাচ্ছে। মেয়েরা রাষ্ট্রিক কাজের জন্য জেলে যাচ্ছে, – অনেকদিন পর্যন্ত জেল খাটছে। মেয়েরা সর্বজনীক সভায় আর রাস্তার মিছিলে নেতৃত্ব করছে। মেয়েদের জন্য স্কুল হয়েছে অনেক – কলেজও হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ পড়ছে বেশ-কতকগুলা মেয়ে। মেয়েরা চাকরি করছে, – টাকা রোজগার করছে। শুধু শখের রোজগার নয়। মেয়েদের রোজগারের ওপর বাপ-মা খেয়ে বাঁচছে। মেয়েরা রোজগার করে ভাই-বোনকে স্কুলে পড়াচ্ছে'।[51] এই প্রসঙ্গে আবার বিনয় সরকার গুরুসদয় দত্তের 'সরোজনলিনী মহিলা-সমিতি'-র মাধ্যমে জেলায় জেলায় মেয়েদের অন্নসংস্থানের সুবিধা করে দেওয়ার কথা জানিয়েছেন। কলকাতাতেও মেয়েদের ক্লাব, সমিতি, সঙ্ঘ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার ফলে মেয়েদের আত্মশক্তির বিকাশের কথা উঠে এসেছে। সরকার অবশ্য কারণ ও সময়কাল হিসাবে ১৯৩০ সালের 'অসহযোগ' আন্দোলনের কথা বলেছেন। 'বোধহয় অসহযোগ আন্দোলনে মেয়েদের জেলে যাওয়াই পুরুষ-সাম্যের আন্দোলন পয়দা করেছে'[52]। এই পরিস্থিতির কথাই উল্লেখ করে বাংলা সাহিত্যে পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করেছেন সুকুমার সেন তৎকালীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লিখতে গিয়ে। খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা সেই সময় দাঁড়িয়ে অনুভব করেছেন বিনয় সরকার,

---

50 তদেব।

51 হরিদাস মুখোপাধ্যায় এবং অন্যান্য, ২০০০, পৃ. ২৪৩।

52 হরিদাস মুখোপাধ্যায় এবং অন্যান্য, ২০০০, পৃ. ২৪৩।

‘মেয়েদের গোটা মনুষ্যত্ব নয়া গড়ন পেতে চলেছে। মানুষ হিসাবে মেয়েরা নতুন ব্যক্তিত্ব লাভ করছে। পুরুষরা যেমন মানুষ, মেয়েরাও ঠিক তেমনই মানুষ, — এই খেয়াল অনুসারে হাজার হাজার পরিবারে মেয়েরা আর পুরুষরাও জীবন গড়ে তুলছে। খেয়ালটা আজও সব ক্ষেত্রেই সজ্ঞান নয়। কিন্তু বাঙালি জাতের মেজাজটায় এই খেয়াল পাকা ঘর করে বসেছে’[53]। এই বৈশিষ্ট্যের কথা বারবার উঠে এসেছে সাহিত্যে। সে নরেশ চন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিতর্কে হোক, কল্লোলের লেখালিখিতে হোক বা প্রেমেন-অচিন্ত্যের চিঠিপত্রে হোক। নতুন ভদ্রমহিলার উত্থানের সঙ্গে এই মনোভাব অঙ্গাঙ্গী জড়িত হলেও, পার্থক্যও খানিকটা আছে বলে আমার মনে হয়। ভদ্রমহিলা নামক বর্গের উত্থানের সঙ্গে মেয়েদের স্বাধীকারের প্রশ্নটি সরাসরি যুক্ত নয়। তবে বাস্তবের অভিঘাতে কিছু দূর পর্যন্ত স্বাধীকার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল নিশ্চিত। কিন্তু ভদ্রমহিলা বর্গটির নির্মাণ প্রকল্পের নিগড় ছিল ঔপনিবেশিক-জাতীয়তাবাদী পিতৃতন্ত্রে। কিন্তু ক্রমশ পুরুষের মর্যাদার মানদণ্ড হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার বাইরে এসে মেয়েরা নিজেদের উপস্থিতি ঘোষণা করেছিল। মেয়েদের সামাজিক অবস্থা ও কার্যক্রমের পরিবর্তনের সঙ্গে সাহিত্যে প্রেম এবং যৌনতার বিষয়টি সরাসরি যুক্ত। এই প্রথম বাঙালি অনাত্মীয় যুবক-যুবতীরা পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পেল। স্বাভাবিকভাবে এই ঘটনার মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্যও অসীম। এই পরিপ্রেক্ষিতে সজ্ঞান ও অবচেতনের প্রশ্নটাও গুরুত্বপূর্ণ। মনে রাখতে হবে ইতিমধ্যেই কলকাতায় ব্যক্তিক ও কিছু পরে বিদ্যায়তনিক চর্চায় অবচেতনকে ছোঁয়ার, চেনার প্রচেষ্টা শুরু হয়ে গিয়েছিল। যৌনতা এবং নারী-পুরুষের সম্পর্কের বুননকে নতুন করে দেখার প্রয়াস মনস্তত্ত্ব এবং মনঃসমীক্ষণের

[53] হরিদাস মুখোপাধ্যায় এবং অন্যান্য, ২০০০, পৃ. ২৪৩-৪৪।

চর্চার সঙ্গেও সংযুক্ত। বৌদ্ধিক বিকাশ-যৌনতা-সাহিত্য আন্দোলন থেকে জাতীয়তা বা দেশপ্রেম সবই ছিল পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত।

তবে মেয়েদের এই পুরুষ-সাম্যে বিনয় সরকার অতীব আনন্দিত হয়ে উঠলেও, আনন্দের কারণ হিসাবে যে যুক্তি পেশ করেছেন যা যথেষ্টই লিঙ্গায়িত। পুরুষের মাপকাঠিতে মেয়েদের 'উন্নতি'-কে পরিমাপ করার মধ্যেও পুরুষের শ্রেষ্ঠত্বের দাবি নিহিত থাকে। 'পুরুষ-সাম্য' শব্দবন্ধটিই নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে যথেষ্ট আপত্তিজনক। সাম্যের মানদণ্ড এখানে পুরুষ, পুরুষ-কর্তৃক নির্ধারিত হচ্ছে মেয়েদের যোগ্যতা। অবশ্য এক অর্থে বিনয় সরকারের মতামতকে আমরা যুগের সীমাবদ্ধতা হিসাবেও দেখতে পারি। লিঙ্গ-সম্পর্ক নিয়ে কাঠামোগত বিশ্লেষণ তিনি করে উঠতে পারেননি। কিন্তু তিনিও সমালোচনাযোগ্য হয়ে পড়েন, যখন তিনি দাবি করেন নারীদের এই অগ্রসরতার প্রধান সুফল হল পুরুষের সাংসারিক দায়দায়িত্ব থেকে মুক্তি। 'মা-বোন-স্ত্রী-মেয়েদের ভাবনায় অস্থির' থাকায় পুরুষের মধ্যে যে কাপুরুষতার জন্ম ঘটছিল, তা কাটিয়ে উঠে পুরুষ আবার 'মহত্বপূর্ণ কাজে প্রাণ' দেওয়ার সাহস সঞ্চয় করতে পারবে। 'মেয়েদের আর্থিক স্বাধিনতা পুরুষদের আধ্যাত্মিক জীবনের মস্ত সহায়'[54]। স্বভাবতই এখানে তাত্ত্বিক বিতর্কের অবতারণা প্রয়োজন। কারণ সাহিত্যের বিশ্লেষণ ও পাঠে এই জাতীয় দৃষ্টিকোণের বারংরার প্রকাশ ঘটেছে বা ঘটে চলেছে। মহান এবং আধ্যাত্মিক চেতনার উন্নতি কেবল পুরুষদের জন্যই নির্ধারিত। নারী-পুরুষের মধ্যে বৌদ্ধিক তারতম্যকে সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা পিতৃতান্ত্রিক একটি নির্মাণ। তবে সে বিষয়ে সচেতনা নারী-পুরুষ নির্বিশেষেই অনেক পরে এসেছে। আলোচ্য পর্বের পুরুষের ব্যবহার ও ভাষ্যে প্রায়শই স্ববিরোধ পরিলক্ষিত হয়েছে। উদাহরণ হিসাবে বিনয় সরকারেরই 'নয়া

[54] হরিদাস মুখোপাধ্যায় এবং অন্যান্য, ২০০০, পৃ. ২৪৫।

পারিবারিক নীতি'-র কথা উল্লেখ করা যায়। একদিকে তিনি চাইছেন মেয়েদের স্বাবলম্বিতার উপর নির্ভর করে সাংসারিক দায়িত্ব থেকে পুরুষের মুক্তি। অন্যদিকে আবার এই প্রবন্ধে বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পর্কে তিনি সেকালের নিরিখে অসামান্য র‍্যাডিক্যল অবস্থান নিয়েছেন। কেবলমাত্র পুরর্বিবাহ নয়, নারীর অবিবাহিত থাকার দাবীর কথাও তুলে ধরেছেন। উপার্জনশীল মেয়েদের সম্পর্কে তিনি দাবি তুলেছেন যে, তাদের 'নৈতিক ও আধ্যাত্মিক' জীবনের উপর আর কারোর দাবি থাকতে পারে না। 'সে নিজের মালিক, নিজের অবিভাবক'।[55] এইসমস্ত 'পরিবার-পালক' মেয়েদের (বিবাহিত, বিধবা, অবিবাহিত) লোকজনের সঙ্গে মেলামেশার ক্ষেত্রেও তিনি অবাধ স্বাধিকারের দাবি তুলেছেন। বলেছেন 'বাপ-মারা চোখ (*দৃষ্টিকোণ*)[56] বদলাতে শুরু করুন। এটাই 'নয়া পারিবারিক নীতি'। পুরুষের বেলায় যে নীতি, ধর্ম। মেয়েদের বেলাতেও তাই। ভালো মন্দ-র (অর্থাৎ কিনা নৈতিকতার) প্রশ্ন তোলার মানে নেই।[57]

এই প্রসঙ্গে একটি বিশেষ দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। যদিও প্রায় সব ক্ষেত্রেই ১৯০৫-১৪-র সময়কালকে সরকার বৈপ্লবিক আখ্যা দিয়েছেন, কিন্তু তিনিও স্বীকার করে নিয়েছেন যে নারী পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে বা নারীর প্রতি মনোভাবের বিষয়ে তাঁরা বা তাঁর সময়ের অধিকাংশ মানুষ রক্ষণশীল চিন্তাই করতেন। তাঁর কথায়, '১৯০৫-১৪ সনের যুগে আমরা গোঁড়া বা প্রাচীনপন্থী হিন্দুরা মানুষের সুখ-দুঃখ মানুষের কলিজা দিয়ে,— মানুষের চোখ দিয়ে,— দেখতাম না'।[58] তাঁর নিজের দৃষ্টিকোণ পরিবর্তনের পিছনে পাশ্চাত্য ভ্রমণের প্রত্যক্ষ প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। আর সামাজিকভাবে এই বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি বদলের সময়সীমা নির্ধারণ করেছেন ১৯৩০-৩১।

---

55 হরিদাস মুখোপাধ্যায় এবং অন্যান্য, ২০০০, পৃ. ২৪৫-২৪৬।

56 বন্ধনীর শব্দ আমার।

57 হরিদাস মুখোপাধ্যায় এবং অন্যান্য, ২০০০, পৃ. ২৪৬।

58 তদেব।

বিশেষভাবে এই কথাও বলেছেন উক্ত সময়ের 'মেয়ে-আন্দোলন' মোটেও ব্রাহ্ম সমাজ সংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত বা তার উত্তরসূরি নয়। ১৯৩১ সালে বিনয় সরকার একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন 'মানুষ কি উন্নতির পথে?'। সেখানে নারী-পুরুষের সম্পর্ক বা পিতৃতন্ত্র নিয়ে সরাসরি কোনো কথা তিনি বলেননি। কিন্তু বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তৎকালীন প্রচলিত (এখনও সমানতালে চলমান) নৈতিক ধারণার মূলে আঘাত করেছেন। তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে সে সময় মানুষের নৈতিক জীবন বিষয়ক ধারণা বদলে গেছে। ভারতীয় তথা বাঙালি পরিবারের মূলগত কাঠামো প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে। পিতাকেন্দ্রিক যে উল্লম্ব থাকবন্দী সংসারের ধারণা ছিল, যেখানে পুত্র (বুঝতে হবে সন্তান) সম্পূর্ণ ভাবে পিতার অধীন, তা আর নেই। বাপ ছেলের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য নানা আইন কানুন আছে। এই কাঠামোগত পরিবর্তনের কোনো যাচাই নৈতিক মাপকাঠিতে তিনি করতে নারাজ। 'মানুষের সদগুণ বাড়ছে কি কমছে তা বলা শক্ত। তবে কাঠামো বদলাচ্ছে, গড়ন বদলাচ্ছে, মতি গতি বদলাচ্ছে'।[59] এমনকি তিনি উপাধি, পদবীর মায়া কাটিয়ে ওঠার প্রস্তাবও করছেন, যা আমার মতে জাতি-গোষ্ঠি-পরিবারের ভারসাম্যকেই নাড়িয়ে দিতে পারে।

নারী-পুরুষের সম্পর্কের পাশাপাশি ভারতীয় সমাজব্যস্থার সংস্থানকে বিস্থিত করে দেওয়ার মতো ক্ষমতাসম্পন্ন একটি প্রায়-বিস্মৃত রচনার উল্লেখ করতে চাই এখানে। শান্তিসুধা ঘোষের *নারী*। ১৩৪৭ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলেও লেখিকা জানিয়েছেন বিগত কয়েক বছর ধরে তাঁর প্রবন্ধগুলি 'যুগান্তর', 'জয়শ্রী', 'মন্দিরা' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই বইয়ের প্রতিটি প্রবন্ধের বিষয় এবং তার বক্তব্য আমাদের তৎকালীন লিঙ্গ-সম্পর্ক সম্বন্ধে শুধু সম্যক ধারণাই দেবে তাই নয়, যে

[59] হরিদাস মুখোপাধ্যায় এবং অন্যান্য, ২০০০, পৃ. ২৮৯।

নারীবাদী বীক্ষা আমি অনুসরণ করার পক্ষপাতি তার আদিরূপ ধারণ করে আছে শান্তিসুধা ঘোষের *নারী*। অনেকসময়ই দেখা যাচ্ছে সাম্প্রতিক নারীবাদী পরিভাষাগুলির ব্যবহার বাদ দিয়ে তিনি সম্পূর্ণ লিঙ্গ-সংবেদী বিচার বিশ্লেষণ করেছেন নর-নারীর সম্পর্ক সহ নারী প্রশ্নের। *নারী* নামক গ্রন্থটি একাধারে সেই সময়কার একটি পাঠ যাকে আমি আজকের নারীবাদী প্রেক্ষিত থেকে পুনর্মূল্যায়ণ করতে চাই এবং সেটি নিজেই একটি হাতিয়ার এই নারীবাদী হস্তক্ষেপের। ভূমিকায় লেখিকা তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন, 'বর্ত্তমান দিনে যখন আমাদের সমাজে নারীর সামাজিক অধিকার ও প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে আলোড়ন চলিতেছে, কিন্তু নানাবিধ মতবাদের পরীক্ষায় শুধু আবর্ত্ত ফেনায়িত হইয়া উঠিতেছে, কোনও স্থায়ী রূপ পরিগৃহীত হয় নাই,— এই দিনে নিজের জীবন সম্বন্ধে নারীর নিজের দৃষ্টিভঙ্গী যদি সমাধানের পথে কোনও সহায়তা করিতে পারে।'[60] বইটির বিষয়সূচী থেকেও আমরা তাঁর স্বকীয়তা সম্পর্কে ধারণা করতে পারব— 'ভারতীয় সভ্যতা ও নারী', 'বিবাহ সমস্যা', 'শাঁখা-সিঁদূর-ঘোমটা', 'বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার', 'মেয়েদের শিক্ষা', 'নারীর মাতৃত্ব ও মাতৃত্বের শিক্ষা', 'নারী ও উপার্জ্জন', 'আধুনিক প্রেমের কথা', 'নারীজীবনের প্রকৃত সমস্যা'। শান্তিসুধা যে যে বিষয়গুলি উত্থাপন করেছেন এবং যে গভীরতায় আলোচনা করেছেন, তা সে যুগের পক্ষে চমকপ্রদ। তিনি তাঁর লিঙ্গ-অবস্থান সম্পর্কেই সচেতন নন, লিঙ্গ এবং তার রূপকল্প নির্মাণের কাঠামোগত বুনন সম্পর্কেও সচেতন। নারী-পুরুষের সম্পর্কেও কিভাবে যুগ যুগ ধরে চলে আসা মাননির্ণায়ক ধারণাগুলিকে কোনো প্রশ্ন ছাড়াই মান্যতা দেওয়া হয়েছে, তাও তিনি দেখিয়েছেন। দেখিয়েছেন সামাজিক অধিকারের দাবিতে মেয়েদের একাংশ সরব হলেও অধিকাংশ মেয়েরাই ঐতিহ্যবাহী ধারণাগুলিকেই অনড় সত্য

---

60 শান্তিসুধা ঘোষ, *নারী*, (কলকাতা: সরস্বতী লাইব্রেরী, ১৩৪৭), ভূমিকা।

হিসাবে মেনে এসেছে, মাতৃত্বকে নারীর সার্থকতম প্রকাশ হিসাবে প্রচারের উদ্দেশ্য হল নারীকে বশীভূত রাখা কারণ তার পরিচিতি একমাত্র যৌনতার সামগ্রি হিসাবেই। কারণ মাতৃত্ব ও সন্তান সমাজের একমাত্র কাম্য হলে নারীর বহুবিবাহের প্রচলনও থাকত। সেখানে মাতৃত্বকে শ্রেষ্ঠ আখ্যা দিয়েও নারীর আদর্শ হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে পাতিব্রত্য। কেবল নারীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য কামপ্রবৃত্তির সংযম ও পবিত্রতা। কিন্তু সংযম অভ্যাসের উপায় হিসাবে কোনও তাত্ত্বিক বা আধ্যাত্মিক চিন্তার সুযোগও তার নেই। 'মাতৃত্ব-পত্নীত্ব-সতীত্বে'-র ঘেরাটোপে রুদ্ধ তার জীবন। অথচ পুরুষের জন্য আছে সংসার বহির্ভূত জগতের মহান মহৎ দায়িত্বভার। স্বামীত্ব বা পিতৃত্ব তার আত্মিক বা আধ্যাত্মিক চিন্তায় বাঁধাস্বরূপ নয়। উন্নততর জীবন, সন্ন্যাস সবই পুরুষের জন্য নির্দিষ্ট। শান্তিসুধা কোনও পরিভাষা ব্যবহার না করেই পিতৃতন্ত্রের মূলে আঘাত করেছেন। তিনি বলেছেন পুরুষ-ঋষি তাঁর নিজের অন্তর বিচার ও বিশ্লেষণ করতে করতেই নারীকে বিচার করেছেন। তাঁর 'পুরুষ-অন্তরের অনুভূতিগুলি' নিয়েই তিনি ব্যস্ত। তাই তাঁর মহানতা অর্জনের পথে নারী থেকে গেছে 'যুগপৎ লোভ ও ভয়ের সামগ্রী হিসাবে, মানুষ হিসাবে নয়।' 'তাই "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মের সাম্যনীতি' সমাজে কেবল পুরুষের জন্য নির্দিষ্ট। 'নারীকে আত্মার বাণী শুনাইলে সে যদি সত্য সত্যই বৈবাগী হইয়া বসে, পুরুষের ভোগ-প্রবৃত্তি অবাধ চরিতার্থতা পায় না।'[61]

বিবাহিত নারীর চিহ্ন হিসাবে শাঁখা সিঁদুর ঘোমটার বিষয়টি যে দীর্ঘদিনের অভ্যাসমাত্র নয় তা নারী যৌনতাকে অবগুণ্ঠিত রাখার প্রয়াস সেকথাও তিনি নিঃসংকোচে জানিয়েছেন। এমনকি সৌন্দর্যবোধ যে কোনো অনড় এবং ব্যক্তিগত বা বিষয়ীনির্ভর ধারণা নয় তারও একটি ঐতিহাসিক নির্মাণ আছে সেকথা শুনতে পাই তার

[61] শান্তিসুধা ঘোষ, ১৩৪৭, পৃ. ২০-৩০।

লেখায়। নারীর সৌন্দর্যের ধারনাটিকেই প্রশ্নের সামনে এনেছেন তিনি। বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে দৈহিক চাহিদার কথা তুলতে তার অস্বস্তি হয়নি সেযুগে দাঁড়িয়েও। শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ বিভাজনের স্বাভাবিকভাবেই বিরোধী শান্তিসুধা। স্ত্রীশিক্ষা বলে যদি কিছু তৈরি করতেই হয় সেখানেও 'শিশু মনোবিজ্ঞান' এবং যৌনশিক্ষার পক্ষে সওয়াল করেছেন, আজকের দিনেও বাঙালি সমাজে যা নিয়ে বিতর্ক চলেছে। নারীকে বুদ্ধির দিক থেকে খাটো করে রাখার এবং নারীর মনেও সেই বিশ্বাস প্রোথিত করার জন্যই নারীর পৃথক পাঠ্যক্রমের ধারণা তৈরির প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন। সব থেকে বড় কথা তিনি মাতৃত্বের ধারণা এবং নারী-সন্তান পবিত্র বন্ধনের ধারণার মূলেও তিনি কুঠারাঘাত করেছেন। বাংলা সাহিত্যের পুরুষ লেখকদের নর-নারী সম্পর্ক এবং যৌনতার ধারণা সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষাকেই তিনি প্রশ্নের সামনে এনেছেন। পুরুষের লেখনীতে আসলে নারী অনুপস্থিত। নারী-পুরুষের সম্পর্কের নির্মাণ সেখানে পুরুষের দৃষ্টিকোণ থেকে। আধুনিক-পুরুষ নারী এবং নিজের সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়ে সমস্যায় পড়েছে কারণ এই প্রথম নারীর নিজের অবস্থান সম্পর্কে ধারণা ও চেতনার বিকাশ ঘটেছে। এতদিন 'পুরুষমনিষী' 'নারী সামগ্রী' নিয়ে গবেষণা করেছে, তার সমস্যা নির্মাণ করেছে এবং নিষ্পত্তিও করেছে। কিন্তু নারী তার স্বাতন্ত্র্য অবস্থান নিয়ে আত্মপ্রকাশ করার পর তৈরি হয়েছে সংঘাতের পরিসর এবং তা ক্রমান্বয়ে তীব্রতর হয়ে চলেছে।[62]

আজকের নারীবাদী বীক্ষায় বলা হয় যেকোনো নিরপেক্ষ শব্দই পিতৃতান্ত্রিক মান্য কাঠামো-নির্দিষ্ট অর্থ দ্বারা সম্পৃক্ত। তার ফলে কোনো কোনও শব্দ বা বর্গই নিরপেক্ষ নয়। আপাতপক্ষপাতশূণ্য যেকোনো শব্দ ইতিমধ্যেই প্রাধান্যকারীর মতাদর্শে পূর্ণ। তাই মানুষ শব্দটির জাত্যর্থ নির্মিত হয়ে আছে পুরুষের ধারণা দ্বারা। সেখানে নারীর স্থান

[62] শান্তিসুধা ঘোষ, ১৩৪৭, পৃ. ৪০-১১০।

নেই। সে পুরুষের অধঃপতিত অপর (lacking other), Human=HuMan। নারী-পুরুষ সম্পর্কীত যাবতীয় বিপরীতার্থক যুগ্মের নির্মাণকে প্রশ্ন করেছেন তিনি। তাঁর আলোচনায় এসেছে শ্রেণির প্রশ্ন, সাম্যবাদী রাশিয়ার বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা, নারী-পুরুষের সম্পর্কে affinity-র প্রসঙ্গ, নারীর মানসিকতা-মনস্তত্ত্ব-যৌনতা। নারীর যৌনতার সঙ্গে সম্পৃক্ত নৈতিকতার ধারণাকেও সামনে এনেছেন। শান্তিসুধা ১৯৩০-এর দশকেই নারীবাদী লিঙ্গ-সচেতন ভাষ্য দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেছেন এবং মান্য সন্দর্ভকে বারংবার প্রশ্ন করার মধ্য দিয়ে সেই যুগে নারীর অবস্থান নির্ধারণের প্রয়াস নিয়েছেন।

বাংলা সাহিত্যে যৌনতা-মনস্তত্ত্ব সংক্রান্ত আলোচনার পর এবার আমরা সাহিত্যে প্রগতির ধারণাটির সঙ্গে একটু পরিচিত হতে চাইব। সাম্যবাদী চিন্তাধারার প্রসার বিশের দশকের আগে থেকেই বাংলায় শুরু হয়েছিল। তরুণ সাহিত্যিকদের অনেকেই সাহিত্যে বাস্তববাদ এবং সমাজ-বাস্তববাদী ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। কল্লোলের সাহিত্যিকদের মধ্যে গোর্কি, বোয়ার, হ্যামসুনের লেখালিখির বৈশিষ্ট্য নিয়ে নিয়মিত আলোচনাও হত। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মণিশ ঘটক, জগদীশ গুপ্ত প্রমুখ অনেকের লেখালিখিতেই বাস্তববাদের প্রভাব দেখা যায়। কিন্তু সাম্যবাদ বা বামপন্থার চর্চা প্রাতিষ্ঠানিক বা পার্টিগতভাবে এখানে সংগঠিত হতে শুরু করেছে অনেক পরে। বিশেষ একটি মতাদর্শের নিরিখে সাহিত্যের পরিসরকে পুনর্গঠনের ভাবনা এসেছিল মূলত তিরিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সাহিত্যিকদের মনে সংগঠিত হওয়ার তাগিদ তৈরি করেছিল। রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক পথে বিকাশ পরাধীন যুব সমাজকে আকৃষ্ট করেছিল অনেকটাই। ১৯৩০ সালে লেখা রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি' বাংলার সাহিত্যিকদের মধ্যে বেশ সাড়া ফেলেছিল।

'সভ্যতা ও ফ্যাসিজম' নামক প্রবন্ধে সাহিত্যে প্রগতির ধারণার অনুকূলে বুদ্ধদেব বসু লিখছেন, '... রবীন্দ্রনাথের রাশিয়ার চিঠি পড়েছিলুম। জারের আমলে যে দেশ ছিল দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও কুসংস্কারের ভয়াবহ অন্ধকারে মগ্ন, মাত্র কুড়ি বছরের সাধনার ফলে সে দেশের কী আশ্চর্য নবজন্ম!'।[63] বিশ্ববাণিজ্যে মন্দা, জার্মানিতে নাৎসিবাদের উত্থান, ইহুদি নিধন, স্পেনের গৃহযুদ্ধ এবং সর্বোপরি মহাযুদ্ধের সম্ভাবনা লেখক শিল্পীদের একজোট হতে অনুপ্রাণিত করেছিল। যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল সাহিত্যে প্রগতির ধারণাটিও। মূলত মার্ক্সবাদ নির্ভর দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্যের বিচার শুরু হয়। রাশিয়ার বিপ্লবের পৃষ্ঠপটে মানবমুক্তি ধারণাকে সামনে রেখে সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে উদ্যোগী হন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ভবানী ভট্টাচার্য, ইকবাল সিং, মুহম্মদ আসরফ প্রমুখ ভারতীয় ছাত্র। তাদের অনুপ্রেরণা ছিলেন রোমাঁ রোলাঁ, ম্যাক্সিম গোর্কি থেকে শুরু করে বারব্যুস, ফর্স্টার, জিদ, স্ট্র্যাচি প্রমুখ।[64] সাহিত্যের ক্ষেত্রেও প্রগতিবাদের সূচনা হয়েছিল তিরিশের দশকেই। ১৯৩৫ সালে ব্রিটিশ কম্যুনিস্ট পার্টির সহায়তায় বাম মনোভাবাপন্ন ছাত্রদের উদ্যোগে 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ' প্রাথমিকভাবে গঠিত হয়েছিল। এরপর ১৯৩৬ সালের এপ্রিল মাসে লক্ষ্ণৌতে তাদের প্রথম অধিবেশন বসে। উপস্থিত ছিলেন সাজ্জাদ জহীর, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মুলক রাজ আনন্দ, মুন্সী প্রেমচাঁদ প্রমুখ। ১৯৩৬ সালের আঠারোই জুন গোর্কির মৃত্যুতে শোকসভার আয়োজন করা হয়েছিল কলকাতার অ্যালবার্ট হলে, যার আহ্বায়ক ছিলেন আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, কাজি নজরুল ইসলাম প্রমুখ। উপস্থিত থাকার কথা ছিল নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তেরও, বিশেষ কারণে তিনি সেদিন উপস্থিত

---

63 বুদ্ধদেব বসু, 'সভ্যতা ও ফ্যাসিজম', *বাঙালির সাম্যবাদ চর্চা*, শিপ্রা সরকার এবং অনমিত্র দাশ সং., (কলকাতা: আনন্দ, ২০১৯), পৃ. ৩৫১।

64 ধনঞ্জয় দাশ (সম্পা.), *মার্ক্সবাদী সাহিত্য-বিতর্ক (অখণ্ড)*, (কলকাতা: করুণা প্রকাশনী, ২০০৩), পৃ. ৬।

হতে পারেননি। 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের ডাকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘ', যার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন নরেশচন্দ্র। ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত হয় শিল্পী-সাহিত্যিকদের চিন্তার ফসল 'প্রগতি' নামক সংকলন। যারা একসময় সাহিত্যে রাজনীতির প্রবেশের কঠোর বিরোধিতা করে এসেছেন, বা কলাকৈবল্যবাদের (art for art's sake) পূজারি ছিলেন, তাঁদের অনেকেই লেখক সংঘের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন এবং প্রগতি সংকলনে লেখা দিয়েছিলেন। বুদ্ধদেব বসু থেকে শুরু করে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় অনেকেই সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রগতির ধারণাকে সেই সময় সমর্থন জানানোর কথা ভেবেছেন এবং তার পক্ষে কলম ধরেছেন।

১৯৩৯ সালে কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশে পরিচালিত প্রথম পত্রিকা হিসাবে আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল 'অগ্রণী' পত্রিকার, সম্পাদক ছিলেন প্রফুল্ল রায়। সাহিত্যে প্রগতিবাদের আগমণের সঙ্গে সঙ্গেই সাহিত্য রচনার একটি উদ্দেশ্য স্থির হয়ে গেল। প্রগতি সংকলনের মুখবন্ধেই জানানো হয়েছিল যে লেখকদের কয়েকজন সঙ্ঘের 'সভ্য না হলেও সঙ্ঘের উদ্দেশ্যর সঙ্গে একমত।' এবং 'তাঁরা সকলেই ফ্যাশিজমের বিরোধী, ফ্যাশিজম সংস্কৃতিকে ধ্বংস করছে, প্রগতির পথ রুদ্ধ করছে, ...।'[65] এরপর থেকে প্রগতি সাহিত্য সংঘের অভ্যন্তরে প্রগতি এবং প্রগতিশীল সাহিত্যকে চিহ্নিত করার পাশাপাশি কোন সাহিত্য এবং সাহিত্যিক কেন প্রগতিশীল নয় সেটাও চিহ্নায়ণের প্রক্রিয়া শুরু হয়। সাহিত্য রচনার জন্য একটি স্থির, নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নির্মাণের পাশাপাশি কাদের নিয়ে সাহিত্য রচিত হওয়া উচিৎ বা প্রগতিসাহিত্যের উপজীব্য কোন জনগোষ্ঠী বা বিষয়, সেই নিয়েও সুস্পষ্ট মতামতের জন্ম হয়। অথচ প্রখ্যাত বামপন্থী সমাজতাত্ত্বিক বিনয় সরকার বেশ কিছু বছর আগেই সাহিত্যে মতাদর্শের বিষয় সংক্রান্ত আলোচনায়

---

65 সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী এবং হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পা., *প্রগতি*, (কলকাতা: প্রগতি লেখক সঙ্ঘ, ১৩৪৪), মুখবন্ধ।

বলেছিলেন, ‘গল্প-লেখক, নাট্যকার, কবি ইত্যাদি শ্রেণীর সাহিত্য-সেবীদের মতামত, বাণী, বুখনি ও বয়েৎগুলা আমি যখন-তখন বিচার করতে বসি না। এই সকল লেখকদের বেলায় আমার প্রধান বা একমাত্র দেখবার জিনিষ লিখবার কায়দা। খতিয়ে দেখি প্রকাশ-ভঙ্গী...’[66], বা ‘...উকিলি করতে গেলেই সাহিত্য পচে যায়। সাহিত্যটা আর শিল্প থাকে না। হয়ে পড়ে প্রবন্ধ, দার্শনিক আলোচনা, সংবাদপত্রের বিতণ্ডা, অধ্যাপকের বক্তৃতা’[67]। ‘আর্টস ফর আর্টস সেক’ এর বাঙলা করছেন তিনি ‘শিল্প-স্বরাজ’। ১৯৩১ সালের ডিসেম্বর মাসে সরকার লিখছেন ‘সাহিত্যে স্বরাজ না সামাজিক, আর্থিক ও রাষ্ট্রিক ব্যাখ্যা’ নামক প্রবন্ধটি। তিনি শিল্প সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের যোগ অস্বীকার করেন না। বরং মনে করেন, ‘শিল্প-সাহিত্যের সামাজিক, আর্থিক আর রাষ্ট্রিক ব্যাখ্যা—অধিকন্তু নৈতিক ও ধার্মিক ব্যাখ্যা চালানো অতি সম্ভব’[68]। সাহিত্যের উপকরণ হয় ব্যক্তি নয় পরিবার, সঙ্ঘ, রাষ্ট্র বা সমাজ নয়ত প্রকৃতি বা দুনিয়া বা এর সব কিছু। ‘সমাজ-হীন শিল্প প্রায় ঠিক যেন সোনার পাথেরর বাটি’[69]। তাছাড়া সাহিত্যিকরাও কোনো সমাজ বিচ্ছিন্ন জীব নন। বরং পরিবার, রাষ্ট্র, সমাজের সঙ্গে নানা ভাবে জড়িয়ে থাকা মানুষ। তা সত্ত্বেও শিল্প বা সাহিত্যে স্বরাজ সম্ভব। কিভাবে, তা ব্যাখ্যা করেছেন সরকার তাঁর একান্ত নিজস্ব ভঙ্গিমায়। সাহিত্য স্রষ্টারা ইস্কুলমাস্টারের ভাষায় বকাঝকা করেন না, পত্রিকা-সম্পাদকের তরিখাতে নয়, রাষ্ট্র-নায়কদের কায়দাতেও নয়। ‘গুরুমশায় সৃষ্টি করে তর্ক, শ’ (বার্নার্দ শ’ বা ধরে নিতে হবে সমস্ত শিল্পী সাহিত্যিক) গল্প (ঘটনা), চরিত্র ও অবস্থা’।[70] বিনয় সরকারের এই অন্তর্ভূক্তিমুখী (inclusive) এবং নমনীয়

---

66 হরিদাস মুখোপাধ্যায় এবং অন্যান্য, ২০০০, পৃ. ২৯১।

67 তদেব।

68 হরিদাস মুখোপাধ্যায় এবং অন্যান্য, ২০০০, পৃ. ২৯৩।

69 হরিদাস মুখোপাধ্যায় এবং অন্যান্য, ২০০০, পৃ. ২৯৪।

70 হরিদাস মুখোপাধ্যায় এবং অন্যান্য, ২০০০, পৃ. ২৯৫।

মনোভাব থেকে অনেকটাই সরে এসেছিলেন ‘প্রগতি লেখক সঙ্ঘ’-র মূল উদ্যোক্তারা। সাহিত্যে ঔচিত্য-অনৌচিত্য সম্পর্কে তাদের বক্তব্য যথেষ্ট দৃঢ় ও অনড় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

ফলস্বরূপ বুদ্ধদেব বসু সহ অনেকেই সঙ্ঘের সঙ্গে ক্রমশ দূরত্ববোধ করতে শুরু করেন। সাহিত্য রচনায় ঔচিত্য এবং উদ্দেশ্যের আগমণের ফলে মানদণ্ড নির্ণীত হল। প্রগতি সাহিত্যের সংজ্ঞা নির্ধারণের প্রক্রিয়ায় বাদ পড়তে থাকল বিভিন্ন সাহিত্য। সেই কারণে আমি এই প্রগতিনামক বর্গটিকেই সমস্যায়িত করতে চেয়েছি। যেকোনো স্থির বিষয়ী নির্ধারণের প্রক্রিয়াতেই বাদ পড়ে যায় অপর। উত্তর-আধুনিকতা আর নারীবাদের মধ্যেকার সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে জুডিথ বাটলার বলেছেন, রাজনীতির জন্য স্থিতু/নির্দিষ্ট বিষয়ীর কল্পনা করা সব সময়েই গণ্ডগোলের। কারণ তা রাজনীতির সীমা বা পরিসরকেই সীমায়িত করে। সমালোচনার যেকোনো ইশারাই সেখানে প্রাকরুদ্ধ (foreclosed)। বলা ভালো এহেন বিষয়ীর নির্মাণের প্রক্রিয়াটাই ভিন্নতর সম্ভবনাগুলোকে আত্মস্যাৎ করে নেয়। তার নির্মাণ প্রক্রিয়া সম্ভবপর হয় ‘অ(ন্যা)ন্য’-কে বহিষ্কার (exclusion)-এর মধ্যে দিয়ে। অপরের অস্তিত্ব মুছে দেওয়ার বিনিময়েই তৈরী হয় একটা সুস্থিত, সার্বজনীন বিষয়ী। তিনি ‘বিষয়ী’-র ধারণা থেকে সরে আসছেন না বরং তিনি বিষয়ীর সংস্থানের (constituting of the subject) প্রক্রিয়াটিকেই সমস্যায়িত করতে বলছেন।[71]

অন্যদিকে প্রগতির ধারণার সঙ্গে জুড়ে আছে বিবর্তনের ধারণা। কারণ প্রগতির সঙ্গে সংযুক্ত থাকে আগের থেকে ভালো হয়ে ওঠার দাবি। ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি এবং

---

[71] Judith Butler, ‘Contingent Foundations’, *Feminist Contentions: A Philosophical Exchange*, ed. Seylabenhabib, Judith Butler, Drcilla Cornell & Nancy Fraser, (New York and London: Routledge, 1995), 40.

প্রতিশ্রুত ভবিষ্যতকে নির্মাণ করে প্রগতিভাবনা। যেকোনো ধরণের মতাদর্শের প্রতিশ্রুত ভবিষ্যতের মধ্যে একটি অনড়, স্থিরীকৃত গুণ বা উপাদান (বা উভয়ই) থাকে। অন্যদিকে আবার আধুনিক নারীর আত্ম-সচেতনতার নির্মাণ প্রক্রিয়ার মধ্যেও আধুনিক এবং নব্য-র ধারণা আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে আছে, তার সঙ্গে আছে এক প্রতিশ্রুতি আর অঙ্গীকারভরা সুদিনের স্বপ্ন। এই চেতনাই যেমন নারীকে রাজনৈতিক বিষয়ীতে পরিণত করেছে, তেমনই ক্ষেত্রবিশেষে নারীকেই স্থাপন করেছে প্রগতিবাদের বাইরে। নারীর এই রাজনৈতিক বিষয়ী হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া অত্যাবশ্যকীয়ভাবে আধুনিকতা এবং আধুনিক-সময়ভাবনা (concept of modern time) ও কালগত সচেতনতার সঙ্গে যুক্ত। আরও একটু স্পষ্টভাবে বললে, আধুনিকতা এবং প্রগতি এই দুটি ধারণাই কালানুক্রমিক অগ্রগতি এবং সময়ের সরলরৈখিক গতির ধারণাগত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আধুনিক নামক বিশেষ ঐতিহাসিক কালপর্বেই রাজনৈতিক করণিক/প্রতিনিধি (agent) হিসাবে এবং ইতিহাসে অন্তর্ভূক্তি হয় নারীর এবং তার বিষয়ীসত্তা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে থাকে। তবে কেবলমাত্র রাজনৈতিক ইতিহাসের বিষয় হিসাবেই নয়, নারী হয়ে ওঠে ইতিহাসচর্চারও বিষয়ও। সাবজেক্ট টু হিস্ট্রি এবং সাবজেক্ট অফ হিস্ট্রি – এই দুই-এরই নির্মাণ প্রক্রিয়া চলেছে 'আধুনিক' সময়েই। মজার বিষয় হল যে, সাবজেক্ট শব্দটির মধ্যে একাধিক অর্থের খেলা চলে। এক অর্থে তা প্রজা। সেক্ষেত্রে নারীকে ইতিহাসের অধীনও বলা যায়। কোথায় অধীনতা এবং কোথায় তা বিষয়গতচর্চা তা নির্ধারিত হবে, নিশ্চিতভাবেই, লেখকের অভীপ্সা অনুসারে; এবং লেখকের উপরে সতত কাজ করে যাবে যুগধর্ম ও তার অবস্থানের প্রভাব। আধুনিকতা-অগ্রগতি-প্রগতির ধারণায় পুরুষই গবেষক এবং লেখক। সুতরাং তার প্রেক্ষিত থেকেই ব্যাখ্যা করা হতে থাকে নারীকে এবং নারীপ্রশ্নগুলিকে। আধুনিকতার কালিক বিচারে দেখা যায় নারী ইতিহাসের অধীন

বিষয়ী থেকে *অগ্রগতি*-র ধারণায় ক্রমশ হয়ে উঠছে ইতিহাসের আলোচ্য বিষয়। অগ্রগতি শব্দটি তির্যক ছাঁদে লেখা হয়েছে কারণ এই শব্দ একটি বিশেষ জাত্যর্থ বহন করছে – সময়ের তথা ইতিহাসের একটি বিশেষ (এবং অবশ্যই প্রাধান্যকারী) ধারণা, যার গতি সর্বদাই সামনের দিকে, একমুখী।

আধুনিক ইতিহাসের (সময়ের) চিন্তন প্রক্রিয়ার একটি বর্গ হল প্রগতি। প্রগতিভাবনার অনন্যসাধারণ রূপক হিসাবে উঠে এসেছে বিপ্লব ও বিবর্তনের ধারণা। এই দুই রূপকের মধ্য দিয়েই আধুনিক হয়ে উঠেছে একটি ঐতিহাসিক কালপর্ব এবং অবশ্যই একটি আদর্শ স্থাপনকারী, মাননির্ণায়ক প্রকল্প। রিটা ফেলস্কি বিপ্লব এবং বিবর্তনের ধারণা নিয়ে কিছুদূর তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। আদিতে রেভল্যুশন শব্দের অর্থ ছিল পৌনঃপুনিক চক্রাকার গতি (late Latin revolution – A revolving, from Latin revolvere – turn, roll back)। নভস্থিত বা অপার্থিব বিষয় সংক্রান্ত ব্যবহার ছিল মূলত। পঞ্চদশ শতকে তার জাত্যর্থ পরিবর্তনের সূত্রপাত এবং অষ্টাদশ শতকে বিশেষ করে ফরাসি বিপ্লবের পর থেকে রেভল্যুশন অর্থে ঝটিতি ও আমূল পরিবর্তন বোঝানো হতে থাকে। অর্থাৎ কিনা স্থিতাবস্থা বিধ্বস্ত করে নতুন ক্রম-এর উদ্ভব। সাধারণ অর্থে ভিত্তিগত, মৌলিক পরিবর্তন। ফলত বিপ্লবের ধারণা বিবর্তনের কালিক ধারণার বিপ্রতীপ, উন্নয়নমুখী অগ্রগতির জৈবিক প্রক্রিয়ার পরিপন্থী। বিবর্তনবাদী শক্তির আবেদন অবশ্যই ধারাবাহিকতা এবং অন্তর্লীন কাঠামোর প্রতি। বিপ্লবের মতো ঝটিতি বা তাৎক্ষণিক পরিবর্তন ঘটে না জীববিদ্যার বিবর্তনের ধারণায়। কিন্তু দুটি ধারনাই যোগ্যতর বা উন্নত হয়ে ওঠার পক্ষে, জীববিজ্ঞান বা সমাজব্যবস্থা যে ক্ষেত্রেই তার প্রয়োগ হোক না কেন।

বিপ্লব ও বিবর্তনের ধারণা বিপরীতমুখী হলেও, ফেলস্কি দেখাচ্ছেন, দুটি ধারণাই *আধুনিক*-কে ঐতিহাসিক কালপর্ব এবং মাননির্ণায়ক প্রকল্প হিসাবে বিবেচনা করেছে। সেই কারণেই অধুনা বহু নারীবাদী এই সমস্ত ধারণা সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দিহান এবং তারা মনে করেন এই জাতীয় ধারণাগুলি মূলগতভাবেই পুরুষ-কেন্দ্রিক রাজনৈতিক আধুনিকতার পরম্পরা বহন করে। এখনও পর্যন্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে বিশ্লেষণ করে তারা দেখিয়েছেন যে, রাজনৈতিক অভ্যুত্থানের কারণ হিসাবে উঠে এসেছে কল্পিত পিতার স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে বংশানুক্রমিক সংগ্রাম। যাকে বলা হচ্ছে বিপ্লবের অয়েদিপাউসিয় ছাঁচ (Oedipal model)। তাই নারীবাদী বীক্ষায় রাজনৈতিক প্রগতিবাদ বা বিপ্লববাদের মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে পুংবাদ বা পুরুষতন্ত্র। আর অন্যদিকে বিবর্তনবাদী ধারণার ক্ষেত্রে, রিটা দেখাচ্ছেন, সর্বদাই নারীকে ঐতিহাসিক অগ্রগতির বাইরে একটি অনৈতিহাসিক এবং কালহীন পরিসরে স্থাপন করার প্রবণতা দেখা যায়। লোর্না ডাফিনকে উদ্ধৃত করে বলা যায় নারী হল 'অগ্রগতির বন্দী'।[72] সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা, সৌভ্রাতৃত্ব – কোনো ধারণাই নারীকে অন্তর্ভূক্ত করেনি। সূচনাপর্বে তো নয়ই তারপরের পথ চলাতেও নারী ব্রাত্যই থেকে গেছে। আধুনিকতার ধারণার মধ্যস্থিত স্ববিরোধ নিয়ে আমরা আগেই কিছুটা আলোচনা করেছি। এই বিশেষ কালপর্বে এক দিকে যেমন নারী ইতিহাসের এবং ইতিহাসচর্চার কেন্দ্রীয় বিষয় হিসাবে উঠে আসছে, পাশাপাশি আবার থেকে যাচ্ছে (বলা ভালো রাখা হচ্ছে) ঐতিহাসিক অগ্রগতির পথের বাইরে একটি অ-কালিক পরিসরে (atemporal zone)। ক্রিস্টিন ক্রসবির অনুসরণে বলা যায়, বিবর্তনবাদী ইতিহাসচর্চার যে ভিক্টোরিও ধারণা, সেটি অবশ্যম্ভাবীভাবে পিতৃতান্ত্রিক। সেখানে নারীর সংজ্ঞা হল, 'ইতিহাসের অনৈতিহাসিক অপর'। স্বভাবতই

---

[72] লোর্না ডাফিন, 'প্রিজনার্স অফ প্রগ্রেস: উইমেন অ্যান্ড এভোল্যুশন', *দ্য নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরি উইমেন: হার কালচারাল অ্যান্ড ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ড*, সম্পা. সারা ডেলামন্ট, লোর্না ডাফিন, ১৯৭৮। উদ্ধৃত ফেলস্কি, ১৯৯৫ পৃ. ১৪৮।

এই ধরণের ঐতিহাসিক অধি-আখ্যানগুলি উচ্চ-নিচ থাকবন্দী এবং বহিষ্কারমুখী হতে বাধ্য, কারণ অপরত্বের বিষমসত্ত্বাকে তা স্বীকার করে না।[73]

তবে রিটা ফেলস্কির নারীবাদের ভিতরকার সমস্যা সম্বন্ধেও আমাদের সচেতন করেছেন বারবার। শব্দ কখনওই সম্পূর্ণ মুক্ত-ভাসমান বা নমনীয় নয়, বরং আদর্শগত ব্যবহাররীতি-ঐতিহ্যের পলি পড়ে আছে প্রতিটি শব্দের গায়ে। এমনকি নারীবাদীও যখন তার দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাস ও অগ্রগতির ধারণাকে পুনর্বিবেচনা করে, তখন কিন্তু তারাও একই পরিভাষা ব্যবহার করে এবং সেই পরিভাষাগুলি ইতিমধ্যেই ঐতিহ্যের ভারে ভারাক্রান্ত।[74] অনেক সময়েই দেখা যায় মধ্যবিত্ত উচ্চ শিক্ষিত মেয়েরা নিজেদের বুদ্ধিজীবী, আলোকপ্রাপ্ত, রাজনৈতিক আন্দোলনের অগ্রদূত বা ইতিহাস নির্মাণকারী হিসাবে ভাবেন। এবং যারা তাদের মতো করে, তাদের দেখিয়ে দেওয়া পথে ইতিহাস গড়ার আন্দোলনে সামিল নয় বা হতে পারে না বা চায় না, তাদের পশ্চাদপদ বলে দেগে দিতে দ্বিধা করেন না। বিবর্তন, প্রগতি বা বিপ্লবের ধারনার কৌশলগত ব্যবহার কিয়দংশের নারীকে সাহায্য করতে পারে তাদের ক্রমবর্ধমান সক্রিয়তার ধারণা, রাজনৈতিক প্রগতিবাদকে প্রকাশ করার জন্য। কিন্তু সেগুলির অন্তঃস্থ সংস্থান সম্পর্কে সচেতনতা থাকাও জরুরি। কারণ পুরুষপ্রসূত ও পুরুষকেন্দ্রিক ধারণাগুলো একাধারে এক অংশের নারী (বাদী) আত্মীকৃত করেন এবং সেগুলির দ্বারা চালিত হন।

যদিও মেয়েরা ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে বিপ্লবী কার্যকলাপে অংশ নিয়েছে, তবুও মেয়েরা স্বভাবগতভাবেই অনেক বেশি ঝুঁকে থাকে প্রগতিশীল সামাজিক পরিবর্তনের বিবর্তনবাদী পথের দিকে। কারণ বিবর্তনের পথ সাধারণভাবে মূলগত বিস্থিতি বা

---

73 খ্রিস্টিন ক্রসবি, *দ্য এন্ডস অফ হিস্ট্রি: ভিক্টোরিয়ান্স অ্যান্ড দ্য উইমেন কোশ্চেন*, রাটলেজ, ১৯৯১, উদ্ধৃত ফেলস্কি, ১৯৯৫, পৃ. ১৪৮।

74 Felski, 1995, 149.

বিপর্যয় ঘটানোর মত রূপান্তরের প্রক্রিয়া পরিহার করে চলে। বিপরীতে পুরুষেরা আবার দুনিয়ার বৈষম্য, অনৈক্য ঘোচানোর জন্য বিবর্তনের শান্ত ধীর পথের তুলনায় বৈপ্লবীক পথকেই বেছে নেয়। বিপ্লবের ধারণার মধ্যেই নিহিত থাকে বর্তমানের সব কিছুকে বদলে উন্নততর করে তোলার। 'প্রগতি' এই বাংলা শব্দটির অর্থ প্রকৃষ্টরূপে গতিপ্রাপ্ত হওয়া। বলা বাহুল্য এই গতি সামনে দিকে, ভবিষ্যতের অভিমুখে। অতীত থেকে মধ্যযুগ পেরিয়ে উন্নত আধুনিক (বা তারপরে সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদে) সময়ে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে প্রগতিবাদের যাত্রা। একদিকে ইতিহাসের পরমকারণবাদী সরলরৈখিক যাত্রাপথ (trajectory) অন্যদিকে একটি স্থির উদ্দেশ্যকে ঘিরে নিজেকে নির্মাণ করে প্রগতিবাদ। প্রগতিবাদের যাত্রা সম্ভব হয় বিপ্লবের মধ্য দিয়ে পুরাতনকে উৎখাত করে। এই একমাত্রিক অ-অন্তর্ভুক্তিমুখী কাঠামো মূলগতভাবেই আধিপত্যকামী। বিপ্লবের ধারণার তীব্র নিন্দা করেছেন এবং তাকে পুরুষালী বলে চিহ্নিত করেছেন বিভিন্ন নারীবাদী।

প্রতক্ষ্যভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান না করলেও বৌদ্ধিক সমাজের উপর প্রগতির ধারণা আরোপ করার ফলে বহু বিষয়কেই বহিষ্কার করা হয়েছে সাহিত্যের আঙিনা থেকে। নারী-পুরুষের সম্পর্ক, যৌনতা, মনস্তত্ত্ব সব কিছুকেই দেগে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে পশ্চাদপদ বা অপ্রগতিশীল বলে। প্রগতিবাদী, বৈপ্লবিকদের শব্দচয়নে পৌনঃপুনিক ভাবে উঠে এসেছে (বা আসে) বিভিন্ন আদেশমূলক বাক্য, সবসময় ভবিষ্যৎ ক্রিয়াপদের ব্যবহারে, 'উচিৎ', 'করতে হবে', 'করবোই' শব্দের প্রয়োগে। সাহিত্যকে সংযুক্ত করা হয়েছে এমন এক গৌরবোজ্জ্বল নিয়তির সঙ্গে যা অনিবার্য কিন্তু এখনও পর্যন্ত আয়ত্তাধীন নয়। এই দৃষ্টিকোণ এবং বর্গীকরণের ফলে তারা যেমন সংহত করতে পেরেছে নিজেদের, তেমনই জোরালো করেছে বিরোধীদের।

বর্গীকরণের প্রক্রিয়া সচল থাকে বহিষ্কারের মধ্য দিয়ে। তাই পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন যে সাহিত্যে প্রগতির ধারণা ভিত্তিগতভাবে লিঙ্গায়িত। সেই সঙ্গে বাংলা সাহিত্যচর্চা এবং মননের বিকাশের ক্ষেত্রে প্রগতিবাদ বেশকিছু প্রাকরুদ্ধ ধারনাকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল যে তার প্রভাব আজও বিদ্যমান।

চতুর্থ অধ্যায়

জনপ্রিয় সাহিত্য: একটি লিঙ্গসচেতন অবিনির্মাণ

নিবিড় রমণী তার জ্ঞানময় প্রমিকের খোঁজে
অনেক মলিন যুগ—অনেক রক্তাক্ত যুগ সমুত্তীর্ণ ক'রে,
আজ এই সময়ের পারে এসে পুনরায় দেখে...

জীবনানন্দ দাশ, 'উন্মেষ', *সাতটি তারার তিমির*।

বাংলা সাহিত্যে যৌনতা ও লিঙ্গ-সম্পর্ককে বুঝতে চেয়ে আমরা আগের অধ্যায়গুলিতে মূলত কতকগুলি বর্গ এবং ধারণাকে সমস্যায়িত করতে চেয়েছি। সাধারণভাবে কিছু ধারণাকে ধরে নেওয়া হয় অনড়, অপরিবর্তনীয়, স্থির ভিত্তি হিসাবে। যার উপর দাঁড়িয়ে আলোচনার সূত্রপাত ঘটে। কিন্তু মূলগত ধারণাগুলিই যদি নির্মিত হয় পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধ, দৃষ্টিকোণ এবং কাঠামো অবলম্বন করে, তাহলে সেই ভিত্তির উপরে স্থাপিত সামগ্রিক আলোচনা আলোচকের অজ্ঞাতেই হয়ে পড়তে পারে লিঙ্গ-বৈষম্যমূলক (gender biased), বা নিদেন পক্ষে লিঙ্গ-অচেতন/ অসংবেদী (gender insensitive)। সেই কারণে আলোচ্যপর্বের শহর কলকাতা, তার বৌদ্ধিক পরিসর এবং বাংলা সাহিত্য মূলত যে যে বর্গ, ধারণা, রূপকল্প দ্বারা প্রভাবিত বা আধারিত ছিল, তাদের মান্যতাকে প্রশ্ন করতে চেয়েছি আমি। এই অধ্যায়ের বিষয় জনপ্রিয় সাহিত্য। একটি আপাত নির্বিবাদী শব্দবন্ধ। এই চিহ্নক/শব্দেবন্ধের (signifier) জাত্যর্থ (signified) নিয়ে সাধারণভাবে আমাদের মনে কোনও প্রশ্ন তৈরি হয় না। বরং জনপ্রিয়তা সৃষ্টি হল কোন কোন শর্ত পূরণ করে তা নিয়ে আলোচনা চলে। আমার বর্তমান আলোচনায় এই প্রশ্নটি অবান্তর। আমি খুজতে চাইবো না, কোন সামাজিক

পরিস্থিতিতে কোন সাহিত্য কেন জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। বরং জনপ্রিয় সাহিত্য সম্পর্কে বিদ্বজ্জনের মধ্যে কি ধারণা কাজ করে, সেটা বোঝার চেষ্টা করব। পক্ষান্তরে, আবারও, 'জনপ্রিয় সাহিত্য' নামক ধারণাটিকে সমস্যায়িত করার মধ্যে দিয়ে ধারণাটির অন্তঃবুনন (economy)-কে বোঝার চেষ্টা করব নারীবাদী প্রেক্ষিত থেকে। জনপ্রিয় সাহিত্য বা সার্বিকভাবে জনপ্রিয়তা সম্পর্কে প্রায়শই শোনা যায়, সেগুলি মান বা রসোত্তীর্ণ নয়। Class এবং mass-এর পার্থক্যের মতোই, অধিক জনপ্রিয়তাকে প্রায়শই পন্ডিত মহলে অবজ্ঞাসূচক দৃষ্টিতে দেখা হয়। জনপ্রিয়তা লাভের চেষ্টা উচিৎ কি অনুচিত, বা জনপ্রিয়তা লাভের জন্য শিল্পের উৎকর্ষতাহানি হচ্ছে কিনা— এই জাতীয় নৈতিক বিতর্কও শিল্পের ক্ষেত্রে নজরে আসে। আমার আলোচনাটি প্রাসঙ্গিক হবে কারণ, আমাদের আলোচ্য পর্বে বেশ কয়েকজন মহিলা লেখকদের রচনা অসামান্য জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল এবং তাঁদের উপন্যাস ও গল্প পুনর্মুদ্রিত হত নিয়মিত। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, সীতা দেবী, শান্তা দেবী, অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবী, গিরিবালা দেবী, শৈলবালা ঘোষজায়া, আশালতা সিংহ, বিমলপ্রভা দেবী, শান্তিসুধা ঘোষ, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী ছাড়াও আরও অনেকে। এঁদের অধিকাংশ লেখাই এখন দুষ্প্রাপ্য, সংরক্ষণের অভাবে। সামগ্রিকভাবেই যদি জনপ্রিয় সাহিত্যকে মার্গ-সাহিত্যিক-সমালোচক-পাঠকরা অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখেন, তাহলে মহিলা সাহিত্যিক এবং তাদের রচনাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা হতে পারে তা সহজে অনুমেয়। আমি পরবর্তী অংশে দেখার চেষ্টা করবো, নারীদের সাহিত্য সৃষ্টি-পাঠ-চর্চাকে কোন দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখার প্রবণতা এবং ঐতিহ্য আছে, নারীর রচনা জনপ্রিয়তা লাভ করলে কোন সমালোচনা সাধারণ ভাবে উঠে আসে; এবং যেসমস্ত বৈশিষ্ট্যকে জনপ্রিয়তা এবং মেয়েলিপনার মানদণ্ড হিসাবে দেগে দিয়ে হীন ও মামুলিকরণ (trivialize) করা হয়, সেই

বৈশিষ্ট্যগুলিকে নারীবাদী প্রেক্ষিত থেকে বিশ্লেষণ করলে কোনও অপরাপর সম্ভাবনার সূত্র খুলতে পারে কিনা।

নারী সাহিত্যিকদের সৃষ্টি সম্পর্কে কথা উঠলেই প্রথমেই আসে বিষয়বস্তুর কথা। নারীরা নারীদের জীবনের কথা বলবে, এটাই যেন স্বতঃসিদ্ধ। গত শতকের বিশের দশকের দশক বা তার কিছুটা আগে থেকে যদি পরিস্থিত বিচার করা যায় দেখা যাবে শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছুটা গণতন্ত্রীকরণ (democratization) ঘটলেও তা অনেকাংশেই পুরুষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। নারীদের শিক্ষা মূলত ব্রাহ্ম পরিবারগুলি ব্যতিরেকে কিছু উচ্চবিত্ত পরিবারের বাইরে যায়নি। কলকাতা শহরেও অন্যান্য পরিবারে নারীর পূর্বতন অবস্থার খুব কিছু পরিবর্তন ঘটেনি। বিভিন্ন স্মৃতিকথাগুলি থেকে আমরা সেই যুগের সামাজিক পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি ধারণা তৈরি করতে পারি। বিশ শতকের শুরুর দিকে কলকাতায় প্রথম কলকাতায় ট্রাম চালু হওয়ার পর বাবার সঙ্গে তিন বোন ট্রামে চড়ে বেড়ানোর অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন পুণ্যলতা চক্রবর্তী, '...তখন লোকের কাছে নতুন ট্রামের চেয়ে আমরাই বেশী নতুন 'দ্রষ্টব্য' হয়েছিলাম। 'স্ত্রী-শিক্ষা' ততদিনে লোকের সহ্য হয়ে গেলেও, 'স্ত্রী-স্বাধীনতা' তখনও তাঁদের চোখে যেন সহ্য হচ্ছিল না।'[1] একথা ঠিক যে এই ঘটনার কিছু বছরের মধ্যে বঙ্গভঙ্গ, অসহযোগ ইত্যাদি আন্দোলনের ফলে জনসমাজে মেয়েদের উপস্থিতি বেড়েছিল। কিন্তু একটা কথাও স্বীকার করতে হবে যে, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর কন্যা হওয়ার জন্যই এই ট্রামে বেড়াতে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল পুণ্যলতার। অন্য যেকোনো পরিবারে এই ঘটনা ঘটানোর কথা ভাবনারও অতীত ছিল সেসময়। একথাও পুণ্যলতা লিখেছেন যে, '... নিজের ঘরের আদরযত্নে

---

[1] পুণ্যলতা চক্রবর্তী, *একাল যখন শুরু হল*, সম্পাদনা জয়িতা বাগচী এবং সহ-সম্পাদনা অভিজিত সেন, অনিন্দিতা ভাদুড়ী, (কলকাতা: দেজ পাবলিশিং এবং স্কুল অফ উইমেন্স স্টাডিজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, অগাস্ট, ২০১৮), পৃ. ৩১।

থেকেও কোন কোন নারীর মন ছটফট করতো—বাইরের বিচিত্র জগৎটাকে একটু জানবার জন্য, ... দুঃখ করে বলতেন, শুধু "মেয়েমানুষ" হয়েই রইলাম, পুরো "মানুষ" হতে পারলাম না। ...সম্ভ্রান্ত মুসলমান মহিলাও আপশোষ করতেন, "মা, খোদার দুনিয়াতে এলাম, কিন্তু দুনিয়াটা যে কী, তার কিছুই দেখলাম না, জানলাম না।'[2] একই কথার প্রতিধ্বনি পাই জ্যোতির্ময়ী দেবীর লেখাতেও। মানবজাতির অর্ধেক হলেও মেয়েদের কোনও ইতিহাস নেই। কোনও চিত্রকলা, সাহিত্য, সভ্যতা, স্মৃতি নারীর কথা ধরে রাখেনি। 'পুরুষের পরিপূরক' হিসাবেই ঘুরে চলেছে নারীর জীবন। পুরুষের দৃষ্টি থেকেই চিরকাল রচিত হয়েছে তাদের 'কর্মজগৎ', 'প্রেমের জগৎ', 'আনন্দ-বিষাদের জগৎ'।[3] এহেন পরিস্থিতে যে মেয়েরা লেখার সুযোগ ও সাহস পেয়েছেন সেটাই তাৎপর্যপূর্ণ। স্বভাবতই তারা লিখেছেন অন্দরমহলের কথা, নারীর দুর্দশা, অবদমন, যন্ত্রণার আলেখ্য। সাহিত্যেও উপজীব্য হয়েছে নারীজীবনের টানাপোড়েন। স্বর্ণকুমারী দেবী থেকে শুরু করে সরলাদেবী, সরসীবালা বসু, কৃষ্ণভাবিনী দাস, শান্তিসুধা ঘোষ, সরোজনলিনী দেবী প্রত্যেকের লেখায় বারবার উঠে এসেছে নারী প্রশ্ন। একথা অনস্বীকার্য, বিশ শতকের প্রথম-দ্বিতীয় দশকে যে মহিলারা সরব হয়েছিলেন তারা এসেছিলেন ধনী, ক্ষমতাবান, অভিজাত, উচ্চবর্গ থেকে। কিন্তু তারা কেবল 'শিক্ষা, ভোটাধিকার বা সম্পত্তির অধিকারের মত উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির দাবিগুলিই তোলেননি, সঙ্গে সঙ্গে দরিদ্র মহিলাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট নানা দাবির কথাও বলেছিলেন, যেমন, জননী ভাতা, কর্মরত মহিলাদের অবস্থার উন্নতি, জন্ম নিয়ন্ত্রণ ও বিবাহবিধি

[2] চক্রবর্তী, ২০১৮, পৃ. ৩০।

[3] জ্যোতির্ময়ী দেবী, 'নারীর ইতিহাস', *চিরন্তন নারী জিজ্ঞাসা,* (কলকাতা, ১৯৮৮), পৃ. ১৩২।

সংস্কার ইত্যাদি।'[4] ১৯২০ ও ৩০-এর দশককে ভারতের নারী আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্ব বলে মনে করেন শমিতা সেন। মহিলারা সামাজিক সংস্কার, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের জন্য সংগঠিত হতে শুরু করেন। সামাজিক ও আদর্শগত নানা সমঝোতার মধ্যে দিয়ে তাদের মধ্যে সুন্দর ঐক্যও তৈরি হতে শুরু করেছিল। মূলত সারদা (এপ্রিল, ১৯৩০) আইনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও স্তরের মহিলারা একজোট হয়েছিলেন আইনটির পক্ষে।'[5] স্বভাবতই এই বাস্তবতার ছাপ মেয়েদের লেখালিখিতেও পড়েছে। নিজেদের পরিচিত পারিবারিক গণ্ডীর বাইরে গিয়ে বৃহত্তর নারী সমাজ এবং নারী-পুরুষের সম্পর্কের প্রশ্নটি তাদের নানাস্তরে ভাবিত করেছে।

এতদসত্ত্বেও বারবার নারীর লেখালিখি ও তার জনপ্রিয়তাকে প্রশ্নের সামনে পড়তে হয়েছে। এমনকি নারীর পড়ার অভ্যাসও নানাভাবে পুরুষের অসন্তোষের কারণ হয়েছে— কখনও বলা হয়েছে পড়া তার অনধিকার চর্চা, কখনও বা অধিক সাহিত্য পাঠের ফলে তার চরিত্রহানির আশঙ্কা, বা তার জন্য নির্ধারিত কাজে অবহেলার অভিযোগ। পড়ার অপরাধে বৈধব্য ঘটার আশঙ্কার বিরুদ্ধে লড়াই করে পড়তে শুরু করেছে মেয়েরা। তাদের মধ্যে কেউ কেউ লিখতে পেরেছে, লেখার অবসর পেয়েছে। 'কনজিউমিং বুকস' বা 'গোগ্রাসে পাঠ'-এর ধারণা যেন নারী আর নাবালকের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িয়ে। নাবালক যেমন যা পড়ে তার অনেকটাই বিশ্বাস করে, নিজেকে মিলিয়ে দেয় কাহিনির সঙ্গে, তেমনই নারী। পুরুষ তাকে দাগিয়ে দেয় বিচারবিবেচনাহীন পাঠক হিসাবে। সাহিত্যিক ধারায় যাকে *Mise an abyme* বলা হয় অর্থাৎ রচিত কাহিনির ভিতরে যেন বা নিজেকে, নিজের কাহিনিকে স্থাপন করা। এর

---

4 শমিতা সেন, 'আধুনিক ভারতে নারী: পরিবর্তনশীল অবস্থা ও মনোভাব', পরিমল ঘোষ সম্পা. *আমাদের আধুনিকতার কয়েকটি দিক*, (কলকাতা: সেতু, ২০১২), পৃ. ৩০।

5 তদেব।

ফলেই কিন্তু নারীর রচনা এবং তার সঙ্গে পারিপার্শ্ব ও আত্ম-র ভিতরকার সম্পর্কের বুনন জটিলতর হয়ে ওঠে। লেখক-পাঠ-পাঠক-এর সহজ সমীকরণের প্রতিসরণ ঘটে প্রতি মূহুর্তে। নারীর ব্যক্তিগত দোলাচলতা আর টানাপোড়েনের প্রতিফলন কি তার রচনা, এই প্রশ্নটির মোকাবিলা করতে হয় নারীকে। পাঠের মধ্যে দিয়ে নারী হয়ত আত্মস্বীকৃতি পেতে চায়, অন্যের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে বুঝে নিতে চায় নিজের অবস্থান। সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র বই পড়ার নেশাই হয়ে ওঠে তার ক্ষমতায়ণের একটি ধাপ। আর নিজের এবং নিজের মত আরও অনেকের কথা লিখতে পারা আরও বড় একটি লড়াই। সহমর্মীতা ও প্রতিছলনা বা বক্রাঘাত (empathy and irony) তার লেখার প্রকরণ হয়ে ওঠে বাস্তবের সঙ্গে মোকাবিলায়। বাস্তব আর কাল্পনিকের সীমারেখা মিলে মিশে যায় সেখানে। কখনও লেখিকা বড় বেশি সহমর্মী হয়ে ওঠে কখনও হাতিয়ার করে প্রতিছলনা ও বিদ্রুপকে। লেখিকা যেমন চারপাশের অন্যান্য নারীর দুর্দশার সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়ে। অন্যদিকে পাঠিকাও আবার পঠিত সাহিত্যের নারী চরিত্রের দুর্দশার সঙ্গে একাত্মতা বোধ করে। এ এক দ্বিমুখী প্রক্রিয়া। এভাবে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বোধ তৈরি হয়। পুরুষ সমালোচক এই জায়গায় বলে ওঠে, নারী তার চারপাশ থেকে নিজেকে বিযুক্ত করতে পারছে না। কিছুটা সরে না এলে কোনো সমস্যাকেই বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখা যায় না। তাই নারী অসমালোচনাত্মক, আবেগপ্রবণ, ভাবালু, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, নান্দনিক দূরত্বের বোধহীন, সৌন্দর্য ও কামনার পৃথগীকরণে অপারগ। যার বিপ্রতীপে থাকে সাহিত্য ও সমাজের পুরুষ চরিত্রেরা। ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী, আত্মমগ্ন একাকী পুরুষ। সংসার জ্ঞানহীন। কখনও সে মগ্ন পাঠক, কখনও পালিয়ে বেড়ানো, কখনও বা উদ্দেশ্যহীন ভবঘুরে। যেহেতু নারী হল বিষয়, এবং পুরুষ স্রষ্ঠা বা গবেষক, তাই অনেক সময়েই পুরুষের একটি আপাত নিরাসক্ত চাহনি (dispassionate gaze)

দেখা যায়। যদিও অনেক ক্ষেত্রেই তার পিছনে লুকিয়ে থাকে স্মৃতিকাতরতা ও ভবিষ্যের অভিলাষী কামনা। উচ্চ/অভিজাত সাহিত্য বনাম জনসাহিত্যের ভেদ তৈরি করার মধ্যেও লুকিয়ে আছে আধিপত্যকামিতার ভাবনা। সাধারণের উদ্দেশ্যে রচিত অপরিশীলিত তুচ্ছ প্রাত্যহিক ভাবালুতার সঙ্গে নিজেকে বিযুক্ত করে অন্য এক বৌদ্ধিক উচ্চতার নিজেকে স্থাপন করে পুরুষ লেখক-সমালোচক-পাঠক। এই প্রক্রিয়ায় অসমালোচনাত্মক নিষ্ক্রিয় পাঠ ও জনতা পাঠককে তারা খাটো করতে হয়ত সক্ষম হয় কিন্তু নারীর রচনা ও তার পাঠকের ভিতরকার এই নিঃশব্দ কথোপকথনকে আটকাতে পারে না। যাকে সে নিষ্ক্রিয় পাঠ বলে চিহ্নিত করেছে , সেটাই সেতুবন্ধন ঘটাচ্ছে লেখক ও পাঠকের মধ্যে। হয়ত ভয় সেইখানেই। সেই ভয় তারা করে ফিরছে মেয়েদের লেখালিখি শুরু করার সময় থেকে এখনও পর্যন্ত। "বঙ্গসাহিত্যের একসময় গিয়াছে যখন স্ত্রীলোকের রচনামাত্রকেই অযথা উৎসাহ দেওয়া সমালোচকগণ সামাজিক কর্তব্য বলিয়া জ্ঞান করিতেন"। উনিশ শতকের শেষে 'ভারতী' পত্রিকায় লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।'[6] পরবর্তীকালের রবীন্দ্রনাথ অবশ্য তাঁর অবস্থান থেকে অনেকটাই সরে এসেছিলেন। তাছাড়া উনিশ শতকের সংস্কার আন্দোলনে নারীকেই যেহেতু কেন্দ্রীয় জায়গা দেওয়া হয়েছিল, তার উন্নতিকেই (পুরুষের প্রয়োজনে পুরুষের দ্বারা নির্ধারিত 'উন্নতি') সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিকাশের মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয়েছিল, তাই পুরুষ সংস্কারকের উপরে স্বনিয়োজিত দায় বর্তেছিল নারীকে 'শিক্ষিত', 'আলোকপ্রাপ্ত', 'অগ্রণী' করে তোলার। নারীর লেখা প্রকাশ করিয়ে দেওয়া তার একটি ধাপমাত্র। বিশ শতকেও এর রেশ থেকে গিয়েছিল। *কল্লোল যুগ* নামক গ্রন্থটি শুরুই করেছেন অচিন্ত্য সেনগুপ্ত 'প্রবাসী'-তে লেখা পাঠানোর অভিজ্ঞতা দিয়ে। বহুবার কবিতা পাঠিয়ে 'নির্মমের মত' প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর

---

6 সুদক্ষিণা ঘোষ, *মেয়েদের উপন্যাসে মেয়েদের কথা: 'কাহাকে' থেকে 'সুবর্ণলতা'*, (কলকাতা: দেজ পাবলিশিং, জানুয়ারি, ২০০৮), পৃ. ৩৫।

কলেজের এক ছেলে পরামর্শ দিয়েছিল, 'মেয়ের নাম দিয়ে পাঠা, নির্ঘাৎ মনে ধরে যাবে। তুই যেখানে পুরো পৃষ্ঠা লিখে পাশ করতে পারিস না, মেয়েরা সেখানে এক লাইন লিখেই ফার্স্ট ডিভিশন'। ঘটলও তাই, অচিন্ত্য আত্মপ্রকাশ করলেন নীহারিকা দেবী নামে। অনেক কাগজ আবার নীহারিকা দেবীকে 'গায়ে পড়ে' কবিতা পাঠানোর অনুরোধ করতে লাগল।[7] সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে সংস্কারকামিতার চেহারা কয়েক দশক পেরোতে না পেরোতেই কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে। পুরুষ-নির্ভর 'অবলা নারী' যেন তারই প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে শুরু করেছে ক্রমশ। নারীর প্রতি আর করুণা নয়, এবার জন্ম নিতে শুরু করেছে আক্রোশ। এই ঘটনারও কিছু বছর আগে, ১৯১৩ সালে শরৎচন্দ্র বর্মা থেকে এক চিঠিতে লিখছেন, '... নভেল ওরকম না হলে গ্রাহক জোটে না। লোকে নিন্দে হয়ত করবে—কিন্তু পড়বার জন্যেও উৎসুক হয়ে থাকবে। ... ঐ 'ভারতী'র বাগদত্তা, পোষ্যপুত্র, দিদি, অরণ্যবাস—বারো আনা লোকেই পড়ে না, যদিও পড়ে নেহাৎ বেগারখাটা গোছ। অথচ রত্নদীপ এর মধ্যেই অনেকের দৃষ্টি-আকর্ষণ করেছে—অথচ সেটা বটতলার যোগ্য বই। এই ধর তোমাদের "মন্ত্রশক্তি"।... অপরের কথা কি বলব ভাই, আমি এখনো পড়িনি। অথচ আমার এই ব্যবসা।'[8] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, *মন্ত্রশক্তি* ১৯১৫ সালে লেখা অনুরূপা দেবীর উপন্যাস। শরৎচন্দ্রের মত প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকের জনপ্রিয় সাহিত্য সম্পর্কে তাচ্ছিল্যের মনোভাবের পাশাপাশি অসূয়াও প্রকাশিত হচ্ছে উদ্ধৃতিটির মধ্য দিয়ে। 'নভেল ওরকম' মানে এখানে লঘু, যৌনগন্ধী; এবং তার ফলেই সাধারণ জনতার কাছে আকর্ষণীয়। অনেকটা খেউর বা কেচ্ছার মতো। জনতা-পাঠকের রুচিকেও নির্ধারণ করে দেওয়া হল এক্ষেত্রে।

---

7 অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, *কল্লোল যুগ*, (কলকাতা: এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা: লি:, আশ্বিন, ১৪২১), পৃ. ১।

8 গোপালচন্দ্র রায় সঙ্কলিত, 'শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র', *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস: পঞ্চম* খণ্ড'-এ উদ্ধৃত, (কলকাতা: আনন্দ, ২০১০), পৃ. ২২৩-২২৪।

পরবর্তীকালেরও প্রায় কোনও সাহিত্যের ইতিহাসবিদই মেয়েদের লেখাকে বিশেষ গুরুত্ব দেননি। প্রায় সকলেরই দেখার দৃষ্টি লিঙ্গ-বৈষম্যমূলক। এমনকি কারোর কারোর লেখায় মেয়েদের নাম উচ্চারিত হয়নি পর্যন্ত, বা হলেও গুটিকয়েক। ভূদেব চৌধুরী, ক্ষেত্র গুপ্ত, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সহ কেউই মেয়েদের লেখালিখি আলোচনাযোগ্য বলে মনে করেননি।[9] সুকুমার সেন তাঁর পাঁচ খণ্ডের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে পাঁচটি পৃষ্ঠা বরাদ্দ করেছেন মেয়েদের জন্য। যেখানে মেয়েদের সাহিত্যের কোনো আলোচনা না পাওয়া গেলেও বেশ কিছু লেখিকার রচনা তালিকা পাওয়া যায়। তবে অনেকের নাম অনুল্লিখিত সেখানেও।[10] শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুবৃহৎ গ্রন্থ *বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের* ধারা। এটিও কমবেশি একই দোষে দুষ্ট। শৈলবালা ঘোষজায়ার লেখা *শেখ আন্দু*-র সাম্প্রতিক সংস্করণে শিবনারায়ণ রায়ের একটি ভূমিকা রয়েছে। সেখানে শিবনারায়ণ উক্ত উপন্যাসের আঙ্গিক এবং বিষয়বস্তু উভয়ের নতুনত্ব নিয়ে ভূয়সী প্রশংসা করার পাশাপাশি শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে উদ্ধৃত করে মন্তব্য করেছেন, 'অজ্ঞতা এবং প্রতিকূল সংস্কার সাহিত্যের ইতিহাসকে কতটা অনির্ভরযোগ্য করতে পারে... '। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে প্রভাবতী দেবী সরস্বতী এবং শৈলবালা ঘোষজায়ার মধ্যে কোনো নতুন ধারা প্রবর্তনের পরিচয় পাওয়া যায় না। মোটের উপর তারা পুরাতনেরই পোষকতা করেছিলেন।[11] শ্রীকুমারের সমসাময়িক সময়ে প্রকাশিত জীবেন্দ্র সিংহ রায়ের *কল্লোলের কাল* গ্রন্থও একই কথার প্রতিধ্বনি করেছে। 'কল্লোল'

---

9 গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথা সাহিত্য,* (কলকাতা: দে'জ, ২০১৮) । গ্রন্থটিকে এই লিঙ্গ-বৈষম্যমুলক প্রবণতা থেকে কিছুটা ছাড় দেওয়া যায়। তিনি খানিকটা গভীরে গিয়ে আলোচনা করার প্রচেষ্টা করেছেন। প্রথম প্রকাশ ১৩৮০ সাল।

10 সুদক্ষিণা ঘোষ তাঁর *মেয়েদের উপন্যাসের মেয়েদের কথা* গ্রন্থে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, সুকুমার সেনের আলোচনায় আশালতা সিংহের কোনও পরিচিতি দেওয়া নেই, এবং পাদটিকায় তাঁর গল্প উপন্যাসের ভুল উল্লেখ আছে।

11 শিবনারায়ণ রায়, 'ভুমিকা', শৈলবালা ঘোষজায়া, *শেখ আন্দু,* (কলকাতা: চিরায়ত প্রকাশনি, ২০১৭), পৃ. ১০।

পত্রিকায় মেয়েদের লেখার সংখ্যা ক্রমশ কমে যাওয়ার কারণ হিসাবে তিনি জানিয়েছেন, 'সম্পাদকের এই ক্রমবর্ধমান নিরুৎসাহের কারণ সত্যিকারের ভালো লেখিকা তৈরি হয় নি, হওয়ার আশু কোনো সম্ভাবনাও দেখা যায় নি।' তা না হলে মেয়েদের লেখা নিশ্চিত প্রকাশ হত, কারণ পত্রিকার কর্তৃপক্ষ ছিলেন 'নারী প্রগতিতে বিশ্বাসী ব্রাহ্ম'।[12] প্রভাবতী দেবীর গ্রন্থের সংখ্যা যেহেতু শতাধিক (এবং প্রত্যেকটির ছিল বেশ কিছু সংস্করণ ও পুনর্মুদ্রণ অর্থাৎ খুবই জনপ্রিয়), সেই কারণে সুকুমার সেনের মন্তব্য হল, 'উপন্যাস রচনা যে ইতিমধ্যেই ইন্ডাস্ট্রিতে পর্যবসিত হইয়াছে প্রভাবতী দেবীর রচনার অজস্রতা তাহার সুনিশ্চিত প্রমাণ।'[13] অথচ এমন নয় যে প্রভাবতী দেবীই শতাধিক উপন্যাস লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা ছেড়ে দিলেও, মধুসূদন দত্ত, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কেউই খুব কম সংখ্যায় লেখেননি। বিশের দশকের প্রধান পুরুষ সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রায় সকলেরই রচনার পরিমাণ বিপুল। অথচ তাদের সম্পর্কে কোনো সাহিত্যের ইহিহাসবিদকে উপরোক্ত মত পোষন করতে দেখা যায় না, কারণ তাদের উৎকর্ষতা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত। পুরুষদের প্রতিও আক্রমণ এসেছে, সেই আক্রমণেও চরিত্রও লিঙ্গায়িত। আগের অধ্যায়ে যৌনতা সংক্রান্ত আলোচনায় দেখানো হয়েছে কীভাবে শ্লীলতা-অশ্লীলতাকে কেন্দ্র করে বিশের দশকের তরুণ সাহিত্যিকদের হেনস্থা করার প্রচেষ্টা হয়েছে। সেই সময়ে অনেক পুরুষ লেখককেও বেশি সংখ্যায় লেখার ফলে খারাপ মানের সাহিত্য রচনার অভিযোগে অভিযুক্ত হতে হয়েছে। অভিযোগের নিশানায় ছিলেন মূলত সেইসব লেখকরা যাদের বিতর্কিত লেখাগুলির বিক্রি ছিল বেশি। ১৯৩৮ সালে বুদ্ধদেব বসুকে এই অভিযোগের উত্তর দিতে দেখি। তিনি লিখছেন, 'পৃথিবীর প্রধান লেখকরা অনেকেই অজস্র লিখেছেন; আর সেটাই তো স্বাভাবিক, কেননা সাধারণ

---

12 জীবেন্দ্র সিংহ রায়, *কল্লোলের কাল*, দ্বিতীয় সংস্করণ, (কলকাতা: দেজ পাবলিশিং, ২০০৮), পৃ. ১০৫-১০৬।

13 সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস: পঞ্চম* খণ্ড, (কলকাতা: আনন্দ, ২০১০), পৃ. ২৩৫-৩৬।

নিয়ম হিসাবে বলা যায় যে রচনা পরিমাণে বেশি না হলে সমসাময়িক সাহিত্যে ও সমাজে তার প্রভাব ব্যাপক কিংবা গভীর হতে পারে না। ... লেখা যাঁর খারাপ, তিনি যতবারই একটি বই লিখবেন ততবারই খারাপ লিখবেন, এ তো সোজা কথা।' এরপর জনপ্রিয়তার বিরুদ্ধে অভিযোগের কথাও উল্লেখ করেছেন তিনি—'... জনপ্রিয় যেমন চুটকি হাসির গল্প কি গোয়েন্দা-গল্প—তার প্রতি অবজ্ঞাই মনীষীমহলে সাধারণ মনোভাব। কিন্তু সে অবজ্ঞা লেখকদের দিক থেকে না-এসে বরং তাঁদের দিক থেকে আসে যাঁরা শিক্ষিত, এবং শিক্ষা-অভিমানী, পাঠক।'[14] বুদ্ধদেবের লেখা থেকেই অনেকটা স্পষ্ট সার্বিকভাবে জনপ্রিয়তাকে বৌদ্ধিক ও মননচর্চার উচ্চ-নিচ থাকবন্দী কাঠামোয় (hierarchy) কীভাবে নিম্নস্তরে স্থাপন করা হয়। পুরুষের বৌদ্ধিক-অহং জাত আধিপত্যকামীতার নিদর্শন ছড়িয়ে আছে সাহিত্য-সমালোচনার ছত্রে ছত্রে। তাই এই থাকবন্দী কাঠামোয় নারী রচিত জনপ্রিয় সাহিত্য যে একেবারে নিচুতলায় থাকবে সেটাই স্বাভাবিক। নারীকে মনেই করা হয় অযৌক্তিক, ভাবালুতাপ্রবণ; যে সৃষ্টির অনুপ্রেরণাদায়ী হতে পারে, যাকে নিয়ে সাহিত্য রচিত হতে পারে। কিন্তু সে নিজে স্রষ্টা হতে পারে না। লিঙ্গায়িত সাহিত্য সমালোচনায় তাই নারী-রচিত সাহিত্য হয়ে যায় দ্বিতীয় শ্রেণির অন্তর্ভূক্ত। নারী-রচিত বিশেষ করে জনপ্রিয় সাহিত্যের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করে তাকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে বিচার করা হয়।

নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে সমালোচনা-সাহিত্য (literary criticism)-কে নতুন ভাবে বিচার করা প্রয়োজন। অতীত যেহেতু আমাদের কাছে উপস্থাপিত হয় টেস্ট বা রচনার মাধ্যমে, তাই একটি ঐতিহাসিক কালপর্বের সমালোচনা-সাহিত্য যদি লিঙ্গায়িত হয় তাহলে যে তথ্যভান্ডারের উপর দাঁড়িয়ে নারীর রচনার তথা সামগ্রিক সাহিত্যের

[14] বুদ্ধদেব বসু, 'কালের পুতুল', *প্রবন্ধ সমগ্র: ৪ খণ্ড*, শঙ্খ ঘোষ, অমিয় দেব, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়, দময়ন্তী বসু সিং, প্রভাতকুমার দাস (সম্পা.), (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০১৫), পৃ. ৫।

মূল্যায়ণ করা হবে, সেটা ইতিমধ্যেই বৈষম্যমূলক এবং অসম্পূর্ণ ও খন্ডিত। পুরুষ-সমালোচকের লিঙ্গায়িত দৃষ্টিকোণ বহু তথ্যসূত্রকেই অপাংক্তেয় বা ও অপ্রয়োজনীয় মনে করে আগেই ছেঁটে ফেলেছে; এবং এই প্রক্রিয়া চলমান। ফলত ক্রমাগত হারিয়ে যেতে থাকছে, এবং থাকবে বহু পাঠ। তাই নারীবাদী প্রেক্ষিত থেকে নারীর সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যগুলিকে চিহ্নিত করা প্রয়োজন। যে বৈশিষ্ট্যগুলিকে তথাকথিত মেয়েলি বলে চিহ্নিত করে অবজ্ঞা করা হয়েছে এতদিন, নতুন বিশ্লেষণের আলোকে দেখা দরকার সেগুলির অন্য ব্যাখ্যা সম্ভব কিনা। নতুন সূচনাবিন্দু (entry point) থেকে পাঠ করলে নারী-সাহিত্যের 'মর্যাদাহানিকর বৈশিষ্ট্যগুলি'-ই হয়ত দেখা যাবে মান্যতা প্রদানকারী মানদণ্ডগুলিকে চ্যালেঞ্জ করতে সক্ষম, এবং প্রতিস্পর্ধার ও নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার নতুনতর সম্ভাবনার আধার হয়ে ওঠার দাবিদার। উপরোক্ত প্রশ্নগুলি মাথায় রেখে আমাদের সমস্যায়িত করতে হবে বিভিন্ন ধারণা ও বর্গকে— সমালোচনার প্রকরণ, লিঙ্গ-কেন্দ্রিকতার (gender-centrism) সমালোচনাগুলিতেও কিভাবে ব্রাত্য-প্রান্তিক নারীর ক্ষমতায়ণের বিষয়টি আলোচিত হচ্ছে, জাতি-ধর্ম-বর্ণের ভেদাভেদ, বর্গীকরণ কীভাবে ক্রিয়াশীল থাকছে; অভিজাত বৌদ্ধিকতাবাদ নাকি অবদমিত আত্ম, কোন বিষয়টি বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে, দৈনন্দিনতার মূল্য ও মূল্যায়ণ কিভাবে হয়ে এসেছে এবং হচ্ছে; নব্য ইতিহাসবাদের সম্ভবনা ও সীমানার সম্প্রসারণ সাহিত্যে কিভাবে প্রভাব ফেলেছে; নারীর রচনায় বাস্তববাদের প্রশ্নটি কিভাবে দেখা হয় ইত্যাদি বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ। মেয়েদের উপর সাহিত্যের প্রভাব, পাঠিকার রুচি, নারীর সাহিত্য পাঠ ও রচনার আন্তঃসম্পর্ক, কল্পনার চরিত্র হয়ে ওঠার প্রবণতা ইত্যাদি নানা বিষয় এবং দিকগুলি নিয়ে অন্যভাবে ভাবার সময় এসেছে। নারীবাদী রচনা (সাহিত্য ও সাহিত্য সমালোচনা উভয়েই) বলে যেগুলি চিহ্নিত সেগুলিরও পূনর্মূল্যায়ণ প্রয়োজন। কারণ 'নারীবাদ' বিষয়টিও কোনো

সমসত্ত্ব, একরৈখিক, একশিলাবৎ বর্গ নয়। তার মধ্যেও টানাপোড়েন, বিরুদ্ধ মত বিদ্যমান। নারী সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য হিসাবে যে বিষয়গুলিকে তুলে ধরা হয়—দৈনন্দিনতায় আবদ্ধ, নিপীড়নের আলেখ্য রচনা, ধর্মীয় প্রভাব, মূলত প্রেমই প্রধান উপজীব্য, করুণ রসাত্মক, মেয়েদের রূপচর্চাসহ নানা মেয়েলিপনার প্রকাশ, আবেগসর্বস্ব কখনও কখনও যৌনগন্ধী কিন্তু আবার সামাজিক মানদণ্ড ও নৈতিকতাকে মান্যতা দিতে গিয়ে অন্তে বিয়োগাত্মক ইত্যাদি। এই বিষয়গুলিকে আমরা আলোচ্যপর্বের বাংলা সাহিত্যের নিরিখে বিশ্লেষণ করব।

আমাদের আলোচ্য সময় এবং তার কিছু বছর আগে পরে মেয়েদের মধ্যে অনেকেই কলম ধরেছিলেন। মহিলা সাহিত্যিকদের কেবল উপন্যাস ও গল্পই নয়, তাদের জীবনবোধের পরিচয় পাওয়া যায় বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির সমান্তরাল পাঠে। 'প্রবাসী', 'ভারতী' ছাড়াও সাময়িকপত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'প্রেম ও জীবন' ১৩১৯ সালে হেমলতা দেবী তার সম্পাদনা শুরু করেছিলেন। প্রতিভা দেবী এবং ইন্দিরা দেবীর যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত হত 'আনন্দসঙ্গীত' (১৩২০-২৮)। সঙ্গীত শিক্ষার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির উদ্দেশ্য এই পত্রিকার প্রকাশ। এছাড়াও 'আন্নেসা', 'নব্যভারত', 'শ্রেয়সী', 'সেবা ও সাধনা', 'শ্রমিক', 'বঙ্গলক্ষ্মী' ইত্যাদি মুখ্যত মেয়েদের সম্পাদনায় প্রকাশিত হত।[15] সৃষ্টিশীল সাহিত্যের মধ্যে খুব গুরুত্বপূর্ণ সীতা দেবীর *সে যুগের নানা কথা,* প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৭৮-১৩৭৯ সালের 'প্রবাসী' পত্রিকায়। আত্মজৈবনিক রচনা এবং তথ্যসূত্র হিসাবে এটি গুরুত্বপূর্ণ। সীতা দেবীর অন্যান্য লেখার মধ্যে অন্যতম হল— *সোনার খাঁচা* (১৯২০), *বন্যা* (১৯৩৩), *মহামায়া* (১৯৩৫), *জন্ম-স্বত্ত্ব* (১৯৩৬)। তাঁর সব থেকে বিখ্যাত উপন্যাস হল *পরভৃতিকা* (১৯৩০), *রজনীগন্ধা*

15 এই বিষয়ে বিশদে জানার জন্য দ্রষ্টব্য শোভারাণী ভট্টাচার্য, *মহিলা-সম্পাদিত বাংলা সাময়িক সাহিত্য-পত্রিকা (প্রাক স্বাধীনতা পর্ব),* (নদীয়া: স্ব-প্রকাশ, জুলাই, ২০০০) ।

(১৯২০)। শান্তা দেবীর *চিরন্তনী* সমধিক বিখ্যাত। পূর্ববর্তী অনুরূপা বা নিরুপমা দেবীর তুলনায় তাদের নৈতিক দোলাচলতা বেশি। *চিরন্তনী* এবং *পরভৃতিকা*-র নায়িকাদের জীবিকা অর্জন এবং ঘরের বাইরের পরিশ্রম এবং অভিজ্ঞতার কথা উঠে এসেছে। শৈলবালা ঘোষজায়ার *শেখ আন্দু* আজকের সময়ে দাঁড়িয়েও বিষয়বস্তু, ভাষা, আঙ্গিক সব দিক থেকেই অন্য ধরণের। সরসীবালা বসুর গল্প *প্রবাল* বা আশালতা সিংহের *শহরের মোহ* বিশেষ তাৎপর্যবাহী। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী বাংলা ভাষায় প্রথম মহিলা গোয়েন্দা চরিত্র কৃষ্ণার স্রষ্ঠা। উল্লিখিত এবং অনুল্লিখিত প্রতিটি রচনাই আলাদা করে সুচিন্তিত পাঠ ও বিশ্লেষণের দাবি রাখে; এবং এই জাতীয় লেখার সংখ্যা অগুন্তি বললে অত্যুক্তি হয় না। সন্দর্ভের স্বল্প পরিসরে নিবিড় পাঠ ও পর্যালোচনা সম্ভবপর নয়। ভবিষ্যতে আমি মহিলা সাহিত্যিকদের ব্যক্তিবিশেষের বিভিন্ন রচনার সান্নিধ্য পেতে চাই। কারণ প্রতিটি রচনার নিবিড় পাঠ আরও অনেক নৈঃশব্দ এবং মুখরতাকে আমাদের সামনে তুলে ধরতে পারে। বর্তমানে নারীদের লেখালিখি সম্পর্কে যে সাধারণিকৃত (generalized) ধারণাগুলি আছে সেগুলিকে সমস্যায়িত করার মধ্যে দিয়ে পড়ার রাজনীতি (politics of reading)-কে বুঝে নিতে চাইব।

এই কালপর্বই যেন খন্ডিত। এক দিকে পুরানো সময় তার নৈতিকতা, চিরায়ত সংস্কার, মূল্যবোধ নিয়ে দাঁড়িয়ে অন্য দিকে আধুনিকতার মোহময় ভবিষ্যত। বাইরের জগতে পুরুষের কাছে আধুনিকতা যতদূর অস্তিত্বময়, অন্দরমহলে পুরাতনের অচলয়তন ঠিক ততটাই শক্তিশালী। এই দুইয়ের টানাপোড়েন মধ্যে নিজের অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠা বা রক্ষা করতে হয়েছে মেয়েদের, সেই জলছাপ লেগে আছে প্রতিটি রচনার শরীরে। অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবী, গিরিবালা দেবী থেকে শুরু করে সীতা দেবী, শান্তা দেবী, বেগম রোকেয়া, আশালতা দেবী, শান্তিসুধা ঘোষ, জ্যোতির্ময়ী দেবী, প্রতিভা বসু, সুলেখা

সান্যাল সকলেই সংসার, পরিবারকে কেন্দ্র করে লিখেছেন। কিন্তু তার মধ্যেও বিষয় বৈচিত্র ও রূপান্তরের প্রক্রিয়া চলেছে।[16] প্রথাগত সামাজিক মূল্যবোধকে মান্যতা দেওয়া থেকে শুরু করে ক্রমাগত পরিবর্তন এবং সেই জনীত সংঘর্ষের ছবি, জীবনের যাত্রাপথের ছবি মেয়েরা যেভাবে এঁকেছেন, পুরুষের লেখায় সেভাবে পাওয়া যায় না। পড়ার অধিকার পাওয়া থেকে মেয়েদের বাইরে পড়তে যাওয়া, জীবিকা উপার্জন, কেবলমাত্র মা, স্ত্রী, কন্যার ভূমিকার বাইরে বেরতে চাওয়া এবং পারা না-পারার উপাখ্যান তেমন ভাবে কোনও পুরুষ ঔপন্যাসিকের কলমে আমরা দেখতে পাই না। আবার এমন নয় সে সংসারের কথা পুরুষরা লেখেননি। বঙ্কিম থেকে শুরু করে বুদ্ধদেব বসু পর্যন্ত অনেকেই লিখেছেন। কিন্তু সাংসারিকতার ভিতরের তুচ্ছ, ক্ষুদ্র, উপেক্ষণীয় অনুপুঙ্খতায় লুকিয়ে থাকা অস্তিত্ব এবং নৈঃশব্দকে তুলনামূলক ভাবে সংবেদী দৃষ্টিতে ফুটিয়ে তুলেছেন মেয়েরাই।[17] তার মূল কারণ নিশ্চিতভাবে প্রজন্মের পর প্রজন্মগত অভ্যাসের ফলে আয়ত্তাধীন গ্রহণযোগ্যতা, সংবেদনশীলতা, ধৈর্য, অনুকম্পা। সাধারণভাবে পৌরুষের প্রাবল্য ও আধিপত্যের দরুণ যা পুরুষদের স্বাভাবিকভাবেই দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পেরেছে। সংসারের 'তুচ্ছ' কাজের ভিতর পুরুষ মহানতার আহ্বান খুঁজে পায়নি। নারীর যাপন এবং নারীত্বের অধিকারের দাবি প্রতিষ্ঠার মধ্যবর্তী নিঃশব্দস্তরগুলি তাদের কাছে অদৃশ্য হয়েই থেকেছে। পুরুষ এতদিন তার বৌদ্ধিক মান নিয়েই চিন্তিত ছিল। আবেগের মান নির্ণয় যে সম্ভব তা ছিল তার অজানা।

---

16 মেয়েদের লেখা উপন্যাস সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য সুদক্ষিণা ঘোষ, *মেয়েদের উপন্যাসের মেয়েদের কথা*। এই গ্রন্থটিতে সুদিক্ষণা উপন্যাসের উপজীব্য, বিষয় বৈচিত্র থেকে শুরু করে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির প্রসঙ্গ উল্লেখ করে মেয়েদের অভিজ্ঞতা ও বক্তব্যের সুন্দর ও বিশদ আলোচনা করেছেন। তথ্য এবং বিশ্লেষণ দুই দিক থেকেই বইটি গুরুত্বপূর্ণ।

17 সাংসারিক অনুপুঙ্খতার বর্ণনা সূত্রে একটি উপন্যাসের কথা উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে—বুদ্ধদেব বসু রচিত *তিথিডোর*। আলোচ্য সময়ের কিছু বছর পরে লেখা, তাই আমি সরাসরি আলোচনায় রাখিনি। কিন্তু বিবাহের আচার, উপাচার, রীতি, অনুষ্ঠান, উৎসবের যে পুঙ্খানুপুঙ্খ রসময় বর্ণনা পাই তা অনবদ্য।

সাম্প্রতিক কালের স্নায়বিক বিজ্ঞান ইন্টেলিজেন্ট কোশেন্ট এর পাশাপাশি ইমোশনাল কোশেন্টের প্রশ্নটিকে আজ সামনে এনেছে। নিজের আবেগের পরিমিতি বোধ, আবেগ সংবরণ, নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে টিঁকে থাকা, ভাব বিনিময়ের ক্ষমতা, সহমর্মীতা, চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করা এবং বিরোধের নিষ্পত্তি—এই সব কটি ক্ষেত্রে মেয়েরা এগিয়ে পুরুষদের থেকে। 'আবেগ'-এর জাত্যর্থও আর আগের মত অনড় নেই। অনেক অর্থের খেলা চলে আবেগের ভিতরে। ফলে মানদণ্ড নির্ণয়কারী প্রতর্ক (normative discourse)-এ যেভাবে আবেগ-বুদ্ধির বিপরীতার্থক যুগ্মপদের (binary oposition) বিচার চলত, এবং স্বাভাবিকভাবেই আবেগের স্থান হত বুদ্ধির নিচে, সেই লিঙ্গায়িত বিচারে অনেক কিছুকেই এখন আর ব্যাখ্যা করা যাবে না। মেয়েদের লেখার বিষয়বস্তু সীমিত এই অভিযোগের মধ্যেই লুকিয়ে আছে পুরুষের আধিপত্যকামীরা, আত্মম্ভরিতা এবং নিয়ন্ত্রণকামীতার পরিচয়। ভেঙে বেরনোর লড়াই যেমন একদিকে থাকে, তেমনই থাকে মান্য গণ্ডির ভেতরে থেকে প্রতি মুহূর্তে দৈনন্দিন বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়েই গণ্ডির সীমানাকে প্রসারিত করার প্রচেষ্টা; এবং এই প্রচেষ্টা একক, একমাত্রিক বা সরলরৈখিক নয়। ব্যক্তি-পরিস্থিতি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন। তাই দৈনন্দিনতার মধ্যেও আছে বৈচিত্র। মেয়েদের লেখালিখিতে দুর্দশা, লাঞ্ছনা থেকে শুরু করে পারিবারিক রাজনীতি, মনস্তাত্ত্বিক লড়াই, প্রেম, ধর্ম, বৃহত্তর রাজনীতি, সমাজ সমস্যা, সাহিত্যচর্চা—সব কিছুই ধরা দিয়েছে; বলা যেতে পুরুষের থেকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। যাকে মান্যতা দিতে পারেনি লিঙ্গায়িত মনন (gendered intellect)। সম্ভবত এই কারণেই জনপ্রিয়তা পেয়েছিল মেয়েদের লেখা উপন্যাস-গল্পগুলি। যেকোনো সামাজিক বর্গই অনায়াসে এই লেখাতে নিজেদের সনাক্ত করতে পারত, মেয়েরা (শিক্ষিত উচ্চবিত্ত থেকে মধ্যবিত্ত গৃহবধূ) তো বটেই। অনেকে ক্ষেত্রেই পাঠিকাদের অধিকাংশই পড়তে পারতেন না।

দুপুরের আড্ডায় পড়ে শোনাতেন একজন কেউ, বিরাট যৌথ পরিবারে বা পাড়ার মধ্যে ঐ একজনই, যিনি পড়তে সক্ষম। এইভাবেই পাঠ এবং পাঠকের একাত্মতা তৈরি হত। এবং পাঠের মধ্য দিয়ে (through text) লেখক ও পাঠকের সন্নিহিতি (affinity) স্থাপিত হত।

জনপ্রিয় সাহিত্যের অন্যতম উপজীব্য প্রেম। কেবলমাত্র মেয়েদের লেখায় নয়, পুরুষ সাহিত্যিকদের লেখাও যথেষ্ট সমালোচিত হয়েছে প্রেম বিষয়টিকে বেশি প্রাধান্য দেওয়ার জন্য। আগের অধ্যায়গুলিতে আলোচনা হয়েছে, কীভাবে অশ্লীল সাহিত্য রচনা করে সমাজের নৈতিক স্বাস্থ্য ধ্বংস করছেন বলে তরুণ সাহিত্যিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল। রিটা ফেলস্কি জনতা-সাহিত্যে বা জনপ্রিয় সাহিত্যের আলোচনায় পাশ্চাত্যের *কিচ* ধারার প্রসঙ্গ এনেছেন। সাহিত্য-সমালোচনামূলক রচনায় *কিচ* শব্দটির প্রথম প্রকাশ ১৮৭০ সাল নাগাদ, সস্তা ও দ্রুত উৎপন্ন শিল্পের প্রতিশব্দ হিসাবে। পরে গণসংস্কৃতির সমার্থক জাতিবাচক শব্দ হিসাবে প্রচলিত হয়। ক্রমশ কিচ সাহিত্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী যুক্ত হয়ে পড়ল যা কিছু ভাবালুতায় আক্রান্ত, রোমান্টিক এবং অনিয়ন্ত্রিত আবেগ যা আভঁ গার্দ সাহিত্যের বিপরীত। আর তাই সুস্পষ্টভাবে মেয়েলি। কিচ-র জাত্যর্থের পরিধির মধ্যে থাকল পুরানোপন্থী রক্ষণশীল আবেগময় বা ধর্মীয় লেখালিখি। *কিচ* সাহিত্যের সমালোচনায় আরও বলা হয়েছে যে, আধুনিকতার নতুনত্বকে যেন পরিবেষ্টন করে আছে "অধঃপতিত রোমান্টিকতা" যা প্রোথিত আছে অতীত ঐতিহ্য আর নান্দনিক ধারার প্রতি রক্ষণশীল আকাঙ্খায়।[18] ব্যক্তিগত ও ঐতিহাসিক উভয় ধারার ক্ষেত্রেই *কিচ*-কে অবক্ষয়ী মনে করার একটা প্রবণতা দেখা যায়। বাস্তবের জটিলতা সামলাতে না পেরে পালানোর ইচ্ছাকে ইন্ধন যোগায় এই সাহিত্য, সহজে ভেবে নেওয়া যায় এমন

18 Rita Felski, *The Gender of Modernity*, (Cambridge, Massachusetts, London and England: Harvard University Press, 1995), 118.

একটি কাল্পনিক জগতে, যেখানে চটজলদি বাঁধাবন্ধহীন মুক্তি পাওয়া যায়। এই কারণে *কিচ*-এর পাঠকও বিশেষ তাচ্ছিল্যের শিকার হয়ে ওঠে, কেননা তারা অপরিহার্যভাবে সরল এবং আবেগের দিক থেকে অপরিণত। *কিচ* সাহিত্যের সঙ্গে রোমান্টিকতার পাশাপাশি রোমন্থনের বিষয়টিও সংযুক্ত হয়ে পড়ছে। হারম্যান ব্রচ তার প্রবন্ধ 'নোটস অন দ্য প্রোবলেম অফ কিচ: দ্য অয়ার্ল্ড অফ ব্যাড টেস্ট'-এ মন্তব্য করেছেন, *কিচ* হল ইতিহাসের নির্দোষ সারল্যের কাহিনিতে (idyll) আশ্রয় নেওয়া, যেখানে প্রচলিত প্রথাগুলি অক্ষুন্ন আছে এবং *কিচ* হল সবচাইতে সহজ ও প্রত্যক্ষ উপায় এই রোমন্থন বা স্মৃতিচারণার যাথার্থতা প্রমাণের। অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল *কিচ* সাহিত্য আবেদন জানায় 'পুরাতন ঢং-এর' অনুভুতিগুলির প্রতি, এবং তার প্রত্যয় প্রতিষ্ঠা করে পুরানোপন্থী প্রথার উপর।[19] রিটা ফেলস্কি *কিচ* সাহিত্যের পুনর্পাঠে উৎসাহী। তিনি এই জাতীয় লেখালিখির মধ্যে সন্ধান করেছেন নারীর প্রতিস্পর্ধা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাগুলিকে।

আমার গবেষণায় এই আলোচনা প্রাসঙ্গিক হবে কারণ 'কিচ' অভিধাটুকু বাদ দিলে প্রায় একই ধরণের সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয় নারী-সাহিত্য তথা জনপ্রিয় সাহিত্যকে। বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় এই জাতীয় নারীবাদী অনুপ্রবেশ এখনও পর্যন্ত সীমিত। আমি আমার গবেষণার কালপর্বের তথাকথিত বেস্টসেলার বা অতিজনপ্রিয় সাহিত্যগুলির বিচার করব রিটার বীক্ষার মূলসূত্র অনুসরণে। এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন রিটা, সুজান ক্লার্কের *Sentimental Modernism: Women Writers and the Revolution of the word*। তার মতে, আধুনিক

19 Hermann Broch, "Notes on the Problem of Kitsch", in *Kitsch: The World of Bad Test*, ed. Gillo Dorfles, (New York: Universe Books, 1969), quoted in Rita Felski, *The Gender of Modernity*, (Cambridge, Massachusetts, London and England: Harvard University Press, 1995), 118.

সাহিত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবপ্রবণতা বা আবেগময়তা হল একধারে একটি অতীত যাকে ছাপিয়ে উঠতে হবে এবং অবজ্ঞায় পরিহার করতে হবে।[20] রিটা একজন সর্বাধিক বিক্রিত লেখিকা সম্পর্কে বলেছেন, তাঁর রচনাগুলি ছিল রমন্যাস, ধার্মিকতা এবং অদ্ভুতত্বের (exoticism) যথাযথ মিশেল, যা শ্রেণি সীমানা ছাড়িয়ে বিপুল সংখ্যক তৎকালীন জনতার বাসনাকে ছুঁতে পারত। তাঁর যত বেশি বই বিকোতো ততই যেন তিনি সাহিত্যিক সংঘের কাছে নিন্দার্হ হয়ে উঠতেন।[21] যে সমস্ত শব্দ ও পরিভাষা আগে মূল্য-নিরপেক্ষ ছিল যেমন- আবেগপ্রবণ, অতিনাটকীয়, কল্পনাপ্রবন বা রোমান্টিক। বাস্তবাদের আগমণের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলির গায়ে নঞর্থক জাত্যর্থ যুক্ত হয়ে পড়ল। তার ফলে শব্দগুলি হঠাৎ করেই হয়ে পড়ল মেয়েলি, পুরানোপন্থী। মনে করা হতে থাকল এই বিশেষ শব্দ বা তার ভাবগুলি বাস্তবকে উপস্থাপিত করতে অপারগ। এই জাতীয় শব্দ প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে যেন বা তৈরি হয় এক রম্য ভ্রম এবং প্রকাশিত হয় ভাবের অতিশয়োক্তি যা জ্বালা যন্ত্রণাময় বাস্তবের প্রতিচ্ছবি নয়। এই জাতীয় সমালোচনা ‘নতুন সাহিত্য’-দের পক্ষ থেকে বার বার উঠে এসেছে। সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতাদের মধ্যেও এই ধারণাগুলি কাজ করেছে, যা আমরা আগে কিছুদূর আলোচনা করেছি। এমতাবস্থায় সাহিত্যক্ষেত্রে নারীর প্রতিষ্ঠা শুরু হলে, নারীত্বের সঙ্গে সংযুক্ত আবেগের প্রকাশকে আরও সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। রিটা বলছেন, অনুভূতি (Sentiment) আর আবেগপ্রবণতা (emotiveness)-কে নামিয়ে আনা হয় ‘ভাবালুতা’ (sentimentality)-র স্তরে।[22] এমনিতেই ঘরের কাজকে কাজ হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা থাকে অদৃশ্য কিম্বা প্রেমের শ্রম হিসাবে

20 Felski, 1995, 115.
21 Felski, 1995, 115-116.
22 Felski, 1995, 117.

খ্যাত। সেখানে এই মনোভাবের দরুণ গৃহের অনুপুঙ্খতা নেমে আসে নগন্য বা তুচ্ছ পর্যায়ে, যা পলায়নবাদী কল্পনা এবং মেয়েলিকৃত (feminised) জন/গণ সংস্কৃতি (polular culture)-র সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে চিহ্নিত করা শুরু হল। এই প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধের উল্লেখ করেছেন রিটা— খ্রিস্টিন গ্লেটিল রচিত 'The Melodramatic Field: An Investigation'। রিটা মহিলা রচিত জনপ্রিয় কাহিনিগুলির চারটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন– পলায়নবাদী, কল্পনাশ্রয়ী, গীতিনাটক বা অতিনাটকীয় এবং ভাবালুতাপূর্ণ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রজতকান্ত রায় দাবি করেছেন বাংলায় ১৯২০-র পর সেই সব সাহিত্যই জনপ্রিয় হয়েছিল, যেগুলো বৈষ্ণব কাব্যের ভাবপ্রধান, গীতিকাব্যময় রীতি অনুসরণ করেছিল। তিনি এই প্রবণতাগুলিকে সদর্থক ভাবে চিহ্নিত করেছেন।[23] আমরা তাঁর মতামতকেও নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনার পক্ষপাতি।

বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে রিটা ফেলস্কির প্রেক্ষিত কতটা উপযোগী তা দেখার আগে তৎকালীন পরিস্থিতির সঙ্গে পরিচিত হওয়া জরুরি। নারীপুরুষের সম্পর্ক বিশেষত প্রেমের বিষয়ে একটি গুরুতর সমস্যা সেই বঙ্কিমচন্দ্রের সময়কাল থেকেই বাঙালি লেখকদের সমস্যায় ফেলে আসছিল। তা হল উচ্চবর্ণের বাঙালি পরিবারের মেয়েদের বয়ঃসন্ধির অনেক আগেই বিয়ে দেওয়া হত। সুতরাং প্রাক-বিবাহ প্রেমের প্রায় কোনো অভিজ্ঞতাই সমাজে ছিল না, অন্ত্যত প্রকাশ্যে তা ছিল গুরুতরভাবে নিন্দনীয়। তাই সাহিত্যে সামাজিক বাস্তবতাকে ছাপিয়ে প্রেমের রূপায়ন করা ছিল বেশ কঠিন কাজ। প্রায়শই সম্মুখীন হতে হত কঠোর সমালোচনার, এমনকি আক্রমণেরও। খানিকটা ছাড় ছিল ব্রাহ্ম, পাশ্চাত্যায়িত এবং কিছু দূর পর্যন্ত কুলীন পরিবারের

[23] Rajat Kanta Ray, *Exploring Emotional History: Gender, Mentality and Literature in the Indian Awakening*, (New Delhi: Oxford University Press, 2003), 81.

মেয়েদের ক্ষেত্রে। যাদের বিয়ের হত খানিকটা বেশি বয়সে। কুলীন মেয়েদের বেলায় বিয়ের বয়স বাড়ার কারণ আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক কোনো পরিবর্তন নয়, বরং খানিকটা ছলনাময়ভাবেই বর্ণ-জাতি ব্যবস্থা এবং রক্ষণশীলনার সামগ্রিক পরিচয়ের বহিঃপ্রকাশ। কুলীন পাত্র ছাড়া মেয়েদের বিয়ে দিলে সমাজে একঘরে হতে হত। তাই অশীতিপর কুলিন বৃদ্ধেরা বিবাহ-ব্যবসাকে পেশা হিসাবে নিয়েছিল। অর্থাৎ বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে কুলীন কন্যাদের বিয়ে করে 'উদ্ধার' করত মন্ত্র পড়ে। মেয়েগুলির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক হত (মানে বাধ্যতামূলক সঙ্গম) কখনও বাৎসরিক তোলা তোলার (জামাই আদায়) সময়, কিম্বা আর কোনোদিনও নয়। প্রেমের বহিঃপ্রকাশের জন্য বঙ্কিম, শরৎচন্দ্র সহ সে যুগের বিভিন্ন লেখকের মধ্যে বৈষ্ণবধর্মকে ব্যবহার করার প্রবণতা দেখা গেছে। যেহেতু উচ্চবর্ণের সমাজ ছিল বিধিনিষেধে আবদ্ধ আর তার বিপ্রতীপে বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে নারী পুরুষের অপেক্ষাকৃত মুক্ত মেলামেশার সুযোগ ছিল। বিশেষত আখড়াগুলি নারীপুরুষের নিয়ম বহির্ভূত জীবনচর্যার জন্য বিখ্যাত (বলা ভালো সমাজের চোখে কুখ্যাত) হয়ে উঠেছিল। কেবলমাত্র নারী পুরুষ নয়, বিভিন্ন জাত ও বর্ণের মানুষও আখড়াগুলিতে নানাভাবে আশ্রয় পেত। তবে নিশ্চিতভাবে এমন কোনো দাবী করা হচ্ছে না যে, আখড়াগুলি ছিল লিঙ্গ, জাত, ধর্ম, বর্ণের বিভাজনের উর্দ্ধে। সেখানেও নানা ধরণের শোষন উপস্থিত ছিল, বিভাজন-বৈষম্যও ছিল। তবে কিনা আপাতদৃষ্টিতে তার মূল্যবোধ ছিল উচ্চবর্ণীয় হিন্দু সমাজের থেকে আলাদা। বৈষ্ণব আখড়াগুলি সমাজের মূলস্রোতের কাছে নিন্দার্হ ছিল 'নেড়ানেড়ি'-র ব্যভিচারের জায়গা হিসাবে। মধ্যযুগের বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের রূপকল্পের সঙ্গে এই আখড়াগুলির তুলনা করা না করাই ভালো। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবতার পরিবর্তন ঘটেছিল অনেকটাই। যাই হোক না কেন, সাহিত্যিকদের সামনে নর-নারীর প্রাক-বিবাহ বা বিবাহ বহির্ভূত প্রেমকে

পাঠক সমাজে গ্রহণীয় করে তোলার ভালো অছিলা ছিল বৈষ্ণব চর্চার পটভূমিতে নায়ক নায়িকাকে স্থাপন করা। ১৯২০ সাল নাগাদ সাহিত্যে প্রেম বিষয়টি নতুন মাত্রা পেল। প্রেমের যুগলদের বেশিরভাগই চেনাজানা সামাজিক পরিধির ভিতরেরই স্থিত। নৈতিক সাহিত্য নিয়ে কোলাহলের কারণও মূলত এটাই। তবে নবীন এবং পূর্বতনদের মধ্যে অনেক সাহিত্যিক নিজের মতো করে পুরানো ধারা বজায় রেখেছিলেন। তার মধ্যে অন্যতম হলেন শরৎচন্দ্র। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য 'শ্রীকান্ত' চতুর্থ পর্ব লেখা হয়েছিল ১৯৩৩ সালে। এছাড়াও ছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাত কুমার মুখার্জী, সরোজ কুমার রায়চৌধুরি প্রমুখ। শেষোক্ত ব্যক্তির বিখ্যাত ট্রিলজি, ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৮-এর মধ্যে রচিত, ময়ূরাক্ষী, গৃহকপোতী ও সমলতা, এই উপন্যাসত্রয়ীতে রোমান্সের প্রকাশের জন্য বৈষ্ণব জীবনচর্যাকে ব্যবহার করা হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে নিরূপমা দেবীর কথাও বলা যায়। তিনি অবশ্য বৈষ্ণবচর্যাকে সাহিত্যে ঠিক ব্যবহার করেননি। পরবর্তী জীবনে তিনি নিজেই একজন বৈষ্ণব ভক্ত হিসাবে জীবনযাপন করতে শুরু করেছিলেন। সেই অভিজ্ঞতার প্রকাশ ঘটেছিল তার শেষ দুটি উপন্যাসে – *যুগান্তরের কথা* (১৯৪০), *অনুকর্ষ* (১৯৪১)। শৈলবালা ঘোষজায়ার উপন্যাসেও বৈষ্ণব ধর্ম প্রাধান্য পেয়েছেন। তাঁর *মঙ্গলমঠ* উপন্যাসের বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের সূক্ষ্ম আলোচনা আছে। এছাড়াও সুধীররঞ্জন মুখোপাধ্যায়কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছিলেন তাঁর *বিপত্তি* ও *অভিশপ্ত সাধনা* দুটিই ধর্মাশ্রয়ী এবং জ্যোতিষচর্চা-কেন্দ্রিক।[24] অনুরূপা দেবীর উপরেও হয়ত তাঁর পিতামহ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের হিন্দুধর্মের সংস্কারের প্রভাব পড়েছিল। আধুনিক মনস্কতার সঙ্গে সেই টানাপোড়েন ফুটে উঠেছে তাঁর উপন্যাসেও। তারাশঙ্কর

[24] সুদক্ষিণা ঘোষ, *মেয়েদের উপন্যাসে মেয়েদের কথা 'কাহাকে' থেকে 'সুবর্ণলতা'*, (কলকাতা: দেজ পাবলিশিং, জানুয়ারি, ২০০৮), পৃ. ২৫৬।

বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম দুটি গল্প ও একটি উপন্যাস বৈষ্ণব প্রেমের মুধুরতায় আধারিত— *রসকলি, হারানো সুর, রাইকমল*।

রোমান্সের বহিঃপ্রকাশের জন্যই কেবল কোনো একটি বিশেষ ধর্মীয় জীবনচর্যাকে ব্যবহার করা হয়নি, অসফল বিয়োগান্তক প্রেমের পর আশ্রয় হিসাবেও ধর্ম বারংবার বাংলা সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়েছে। এই ধারাটির বাইরে গিয়ে নারী পুরুষের সম্পর্কের প্রকাশ ঘটাতে চেয়েছিলেন কিছু সাহিত্যিক লেখক। মূলত ১৯২০-র পরবর্তী সময়ে এই পরিবর্তন স্পষ্ট আকার ধারণ করলেও তার কিছু কাল আগে থেকেই এই ধারাটির সুচনা হয়েছিল। নরেশ চন্দ্র সেনগুপ্তের নাম এই ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই ধারার সাহিত্যিকরা কেবলমাত্র বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে নয়, প্রকাশ ভঙ্গিমার ক্ষেত্রেও পরিবর্তন ঘটাতে চেয়েছিলেন। চেয়েছিলেন রূপক, অলংকার সবকিছুতেই পূর্বের প্রয়োগ ও ব্যবহার থেকে বেরিয়ে আসতে। মূলত রাবীন্দ্রিক আঙ্গিক থেকে বেরনোর তাগিদ অনুভব করেছিলেন 'নতুন সাহিত্য'-র ধ্বজাধারী যুবক সম্প্রদায়ের একটি অংশ। সফল হয়েছিলেন কিনা সে প্রশ্ন আলাদা। তবে এইটুকু বলা যায় প্রেমের ধারণায় যৌনতার গুরুত্বকে তারা স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। 'কল্লোল' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সাহিত্যিকরা ছিলেন এই বিষয়ে অগ্রণী। তবে কল্লোল গোষ্ঠীর মধ্যেও যেমন বিষয় এবং আঙ্গিকগত বৈচিত্র ছিল, তেমনই তাদের সমান্তরালে পুরানো ঐতিহ্যের বহমানতা ও আত্তীকরণের প্রবনতাও দেখা যায়। প্রধান দুই উদাহরণ হিসাবে আমরা তারাশঙ্কর এবং বিভূতিভূষণের কথা উল্লেখ করতে পারি। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসেও পরিবর্তনের ধারা লক্ষ্যনীয়। ১৯১০এর দশক থেকে তাঁর নারী সংক্রান্ত চিন্তায় স্পষ্টত বাঁক বদল ঘটেছিল। যদিও তার আগে ১৯০২-০৩ সালেই ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছে *চোখের* বালি। সমাজে তার অভিঘাত কতদূর হয়েছিল তার

একটি প্রমাণ পাওয়া যায় শরৎচন্দ্রের একটি চিঠিতে, 'চোখের বালি নিন্দার কারণ বিনোদিনী ঘরের বউ। তাহাকে নিয়ে এতখানি করা উচিৎ হয়নি। এটাই বাড়ির পবিত্রতার উপরে যেন আঘাত করিয়াছে। ... আমি ত এখনো কাহারো পবিত্রতায় আঘাত করি নাই;'।[25] অর্থাৎ নিজের সামাজিক বৃত্তের ভিতরে প্রেম বা যৌন আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কথা না বললে ছাড় মিললেও মিলতে পারে। এটি একটি সাংঘাতিক টানাপোড়েন, যা দীর্ণ করেছিল যুবকদের, তাঁদের কল্পনার প্রেয়সীকে তাঁরা বাস্তবে কোথাও খুঁজে পাচ্ছিলেন না। এই টানাপোড়েনের খুব সুন্দর প্রকাশ দেখা যায় তরুণ প্রেমেন্দ্র মিত্র ও অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্তের চিঠিপত্রে। কখনও তাঁরা আশ্রয় খুঁজতে চাইছেন হয়ত সংস্কৃত সাহিত্যে, দর্শনে, চিরন্তন নিসর্গ দৃশ্যে; আবার কখনও পাশ্চাত্যের রোমান্টিকতায়।[26] বিশ শতকের প্রথমার্ধে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের সাক্ষর বাংলা সাহিত্যে পাওয়া যায়। 'পবিত্র' প্রেম বা প্রেমে 'পবিত্রতা'-র ধারণা নায়ক নায়িকাকে চালিত করত। দেখা যেত যৌনতাকে প্রেমের বাইরে রাখার প্রবণতা। কামের অর্থই যেন অপবিত্রতা। রজত রায়ের যুক্তি এখানে প্রণিধানযোগ্য; উদীয়মান কোনো ব্যক্তিস্বাতন্ত্রতাবাদী সমাজে, যেখানে পিতৃতান্ত্রিক সাম্প্রদায়িকতা চ্যালেঞ্জের সামনে পড়ে, সেখানে সম্পর্ককে আর অবৈধ বলে দেগে দেওয়া হয় না, বদলে সম্পর্কটির অযৌনকরণ (desexualize) করা হয়।[27] মনুর বিধান অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলা নিশ্চয়ই বিশ শতকে সম্ভব নয়, কিন্তু তার রেশ যথেষ্টই থেকে গিয়েছিল বলে রায় মনে করেন। কুমারী মেয়ের বিয়ের বয়স আট থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছিল চোদ্দ বিশের দশকের শেষে (চাইল্ড ম্যারেজ রেস্ট্রেইন্ট অ্যাক্ট, ২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৯)। কিন্তু অবিবাহিত মেয়ে তখনও সমাজে ছিল বিরল।

---

25 শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'চিঠিপত্র', উদ্ধৃত করেছেন সুকুমার সেন, ২০১০, পৃ. ২২৩।

26 সেনগুপ্ত, আশ্বিন, ১৪২১, পৃ. ১১-১৫।

27 Ray, 2003, 111.

অন্যদিকে ষোলো বছরের মেয়ে পূর্ণ যৌনসম্পর্কে সমর্থ হলেও তার যৌনতার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সাহিত্যে প্রায় কোনও কথা উচ্চারিত হত না। বরং তার প্রেমকে পবিত্রতার মোড়কে ঢেকে বিমূর্তায়ন করে পেশ করা হত। প্রেমজ সম্পর্কের বিবাহে পরিণতি লাভ তখনও সমাজে সে অর্থে প্রচলিত হয়নি। তাই 'বিরহ' এবং তার অনুষঙ্গে 'অভিমান'-এর ধারণাই ছিল সাহিত্য ও সমাজে বেশি প্রচলিত।[28] এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছিল নবীন সাহিত্যিকদের (অবশ্যই মুখ্যত পুরুষ) হাত ধরে। আগের অধ্যায়গুলিতে যা আলোচিত হয়েছে।

রজতকান্ত রায় 'আবেগ'-কে চিহ্নিত করেছেন বাংলা সাহিত্যের মূল রস হিসাবে। মেয়েদের উপন্যাসের আবেগধর্মিতা এবং দৈবী প্রেমের প্রতি আকর্ষণকে তিনি সপ্রশংস দৃষ্টিতে উর্দ্ধে তুলে ধরেছেন। তিনি মনে করেন এই ধারারই আধিপত্য বজায় ছিল বিশ তিরিশের দশকেও, বাংলা সাহিত্যে এবং পাঠক মানসে। সেই কারণেই মেয়েদের রচনাগুলি জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। তারা ছিলেন তথাকথিত পরীক্ষা নিরীক্ষার বাইরে। রজত বাবুর কথায় তারা দেশীয় শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন নন। এমনকি ১৯৩০-এর দশকে নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষার সময়েও বাজারের উপর আধিপত্য বজায় রেখেছিল তাদের লেখাপত্র। তাঁর মতে লেখকদের উদ্দেশ্য ছিল, প্রশান্তির ভিতরে আবেগকে পুনরাবিষ্কার করা, 'ক্রুসেড'-র মাধ্যমে সমাজ সংস্কার নয়।[29] এই সমস্ত লেখার প্রবণতা ছিল ত্যাগের মধ্যেই পরমানন্দের সন্ধান পাওয়ার ('sublimation of loss'), আর এর ফলেই আধিক্য ছিল করুণ রসের; কারণ, ত্যাগেই মুক্তি, বিরহের মধ্যেই নিহিত থাকে প্রকৃত প্রেম। 'প্রকৃতি-পুরুষে'-র চিরন্তন ভারতীয় ধারণা ও আবেগ এই লেখাগুলির মধ্যে দিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে। বাংলা উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য হিসাবে আবেগের গভীরতা,

---

[28] Ray, 2003, 112.

[29] Ray, 2003, 92.

আঞ্চলিকতার গণ্ডি ছাপিয়ে সুস্পষ্ট ভারতীয় সত্ত্বার প্রকাশ ঘটিয়েছিল বলে রায় মনে করেন। একই আবেগের প্রতীক হল ঐতিহ্যগত যুগল রূপকল্প— রাম-সীতা, রাধা-কৃষ্ণ; অবচেতনের তাড়না থাকা সত্ত্বেও বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের উৎস হল প্রগাঢ় আবেগ এবং এক চেতনা, যা উঠে আসছে দৈব প্রেমের সঙ্গে মানুষী সংযোগ থেকে।[30] এই ভাবের প্রকাশ ঘটেছে যায় নিরূপমা দেবী, অনুরূপা দেবী, শান্তা দেবী, সীতা দেবী, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রমুখের লেখায়। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, সরোজ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, জসীমুদ্দীন বা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামও করা চলে। রজতবাবু বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন যে, নিরূপমা দেবীর লেখাগুলি। 'সুরমা' নামক নারী চরিত্রটি অন্য কোনো সমাজে তো নয়ই, অন্য কোনো সময়ও লিখিত হতে পারত না। কারণ সুরমা ১৯১৫ সালেরই মেয়ে। তার প্রথাগত গতানুগতিক বিদ্রোহটিও কিন্তু বঙ্গিমের কোনো নায়িকার পক্ষে করা সম্ভব নয়।[31] রজতকান্ত রায় এই বিশেষ আবেগটির সৃষ্টির পিছনের সামাজিক বাস্তবতার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সেই সমাজেই নারীর 'অভিমান' তৈরি হয় যেখানে পুরুষের যৌনতার উপরে তার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। পুরুষ একাধিক বিবাহ করতে সক্ষম। তবুও নারীকে মুখাপেক্ষী থাকতে হয় সেই স্বামীরই। কারণ দীর্ঘ দীর্ঘ যুগের সামাজিক অনুশাসন নারীকে ভাবতে বাধ্য করেছে স্বামী অপেক্ষা তার নিজের কেউ নেই। শুধু তাই নয়, এই স্বামীই তার পরিচয়, সে ব্যাভিচারী হলেও। বেশিরভাগ সময় স্বামীর ব্যাভিচারের দায় বর্তায় নারীই উপর, কেন সে স্বামীকে ধরে রাখতে পারেনি। নারীর রূপ যৌবন সব কিছুর উদ্দেশ্যই পুরুষের কামনা চরিতার্থ করা আর তাকে সৎপথে চালিত করা।[32] রজতবাবু মনে করেন, বাংলা

30 Ray, 2003, 105.
31 Ray, 2003, 108.
32 Ray, 2003, 107.

সাহিত্য পাশ্চাত্য থেকে কোর্টশিপের ধারণা নিয়েছিল। কারণ এখানে প্রেম মানেই ছিল অযৌন। গান সাহিত্য নাটক নভেলে প্রেমের প্রকাশ ছিল নিন্দার্হ। *অভিমান* নামক রসটি সাহিত্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আবেগে পরিণত হয়েছিল তার কারণ হিসাবে শ্রী রায় দেখিয়েছেন, নিজের কাছেই নারীর আত্মগরিমার প্রত্যক্ষ এবং বারংবার অবমাননার ফলে ইতিমধ্যে জন্ম হয়েছিল এই বিশেষ আবেগের, যেখানে মিশ্রিত হয়েছিল আহত আত্মগরিমা ও প্রেম একাধারে। ফলত সাহিত্যে এমনকি বাস্তবেও *অভিমান* গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিয়েছিল। *অভিমান* শব্দটিকে বিশ্লেষণের জন্য রজতবাবু চমৎকার একটি বাক্য ব্যবহার করেছেন, 'আমি তোমায় ভালোবাসি – তুমি আমার আত্মাভিমানে আঘাত করেছো'। বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে প্রেমের যে ছয়টি স্তর, তা আর উনিশ শতকের শেষার্ধের এবং বিশ শতকের শুরুর বাংলা আবেগের ধাঁচার সঙ্গে মিলবে না এই কথা মেনে নিয়ে তিনি রাধার 'মান'-কে তিনি স্পষ্টতই কৃষ্ণের অসংখ্য গোয়ালানীর প্রতি যৌন ঈর্ষা বলে চিহ্নিত করে দেখিয়েছেন এই ভাবের প্রকাশ কোনো ভাবেই বিশ শতকের গোড়ায় সম্ভব ছিল না। সেই কারণে আলোচ্য সময়কালের নায়িকাদের আবেগ হল অত্যন্ত পরিশীলিত অভিমান। তৎকালীন রাধার ভাব অনেক বেশি অপরিশীলিত। এহেন পরিস্থিতিতে, যেখানে কামনা বাধ্য হয় উদযাপনের জন্য কোনো পরিবর্ত খুঁজে নিতে, সেখানে প্রেম বা কামের এক জটিল রূপান্তর ঘটতে থাকে— ইন্দ্রিয়পরায়নতা থেকে রোমান্সে (সেই প্রেম হল নিকষিত হেম, যার গায়ে কামগন্ধ লেগে নেই)। শেষ পর্যন্ত রায় মনে করেন এই অবস্থায় ভাবসম্মিলন (sublimation) ছাড়া কোনো রাস্তাই আর পড়ে থাকে না।[33] সেই কারণে তিনি মনে করেন বাংলা সাহিত্যের 'নিউ মুড' তৈরি করতে চাওয়া তরুণ সাহিত্যিকরা দেহাতীত প্রেম ও বহিরাগত মনঃসমীক্ষণের

[33] Ray, 2003, 105-108.

টানাপোড়েনে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। 'আপ-টু-ডেট' থাকার প্রবণতা সাহিত্যচর্চাকে ব্যহত করেছিল এবং দেশীয় ঐতিহ্য বিচ্ছিন্ন হয়ে পাশ্চাত্যমুখী মননের চর্চা অধিক হওয়ায় তাদের সাহিত্য জনপ্রিয়তা পায়নি বা অনেক সময় বিস্মৃতির আতলে তলিয়ে গেছে।[34]

রজতকান্ত রায় নারী রচিত তথা জনপ্রিয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে আবেগ ও সহমর্মিতা সমালোচনাত্মক দৃষ্টিকোণ থেকে তো দেখননি বটেই, বরং তাকেই সাহিত্যের মূল ধারা হিসাবেই চিহ্নিত করেছেন। জনপ্রিয় সাহিত্যকে তথাকথিত উন্নাসিকতা থেকে ত্যাজ্য ঘোষণা করেননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি সমালোচনার উর্দ্ধে নন বেশ কয়েকটি কারণবশত। প্রথমত, কাঠামোগত ভাবেই তিনি নারী-পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রথাবাদী (conformst) অবস্থান গ্রহণ করে, বিভেদকে মান্যতা দিয়েছেন। পিতৃতান্ত্রিক আধিপত্যকামী কাঠামো বিভিন্ন পরিসরেই বেশ কিছু বিপরিতার্থক যুগ্মপদকে (binary oposition) মান্যতা দেয়, নিজের নিয়ন্ত্রণ কায়েম রাখার জন্যে। রায়ের বক্তব্য সেই বাইনারি অপোজিশনগুলির উপরেই ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে। আধুনিকতাকে তিনি চিহ্নিত করেছেন মূলত পরজ বয়ান (derivative discourse) হিসাবে। পাশ্চাত্যের প্রভাব ঔপনিবেশিক বাঙালির মননের স্তরে কাজ করেছে, কিন্তু আবেগের পরিসরে ধারাবাহিকতা বজায় থেকেছিল বলে তিনি মনে করেন। অর্থাৎ আবেগ ও মননের পরিসরকে তিনি বিচ্ছিন্ন ও বিপরীত বর্গ হিসাবে চিহ্নিত করছেন। প্রবন্ধ সাহিত্যে আধুনিক মননের কিছু সাক্ষর থাকলেও সৃষ্টিশীল উপস্থাপনা মূলত আবেগ দ্বারা চালিত হয়, এমনই দাবি তাঁর। প্রকৃতি-পুরুষের যে রূপকল্পকে তিনি ঐতিহ্যের পরাকাষ্ঠা হিসাবে চিহ্নিত করেছেন সেটিও একটি নির্মাণ, এবং অবশ্যই পুরুষতান্ত্রিক নির্মাণ। তিনি মনে করেন দীর্ঘদিনের অনুশাসন ও চর্যার ফলে ভারতীয় নারী পুরুষের

---

[34] Ray, 2003, 80-84.

অনিয়ন্ত্রিত যৌনযাপনে অভ্যস্ত এবং সে মনে করে স্বামী বহুগামী হলেও স্ত্রীর রূপ যৌবন সব একান্তই স্বামীর কল্যাণার্থে নিয়োজিত। সীতা-সাবিত্রী-দময়ন্তীর মডেলে ভাবতে অভ্যস্ত বলে নারী সাহিত্যিক ও তাদের সাহিত্যের নায়িকাদের মধ্যে অভিমান জন্ম নেয়। এই অভিমানই তাদের প্রতিরোধ। এভাবে ব্যাখ্যার ফলে *অভিমান*-এর অর্থ সংকুচিত হয়, এবং একটি শব্দের অর্থনির্মানের অপার সম্ভাবনার দিকটি মুছে যায়। *অভিমান*-এর মধ্যে দিয়ে নারী আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবি গোড়াতেই নস্যাৎ হয়ে যায়। কোর্টশিপের ধারণা পাশ্চাত্য থেকে আমদানীকৃত বলে তিনি মনে করেন। এখানে প্রাক-বিবাহ প্রেমের কোনো রীতি ছিল না। অথচ ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতার প্রশ্নে তিনি রাধা-কৃষ্ণের প্রতীকের কথা বারবার উল্লেখ করেন। গোয়ালিনীর প্রেম তাঁর কাছে অপরিশীলিত কিন্তু বিশ শতকের নায়িকার অভিমান এতটাই পরিশীলিত যে নিজের দাবির কথাও জানাতে পারে না, বিরহ তার শ্রেষ্ঠ উদযাপন, দুঃখ তাকে পবিত্র করে তোলে, তার প্রেমে ইন্দ্রিয়পরায়নতা বা কামগন্ধ নেই। রজত রায় সম্ভবত বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে শৃঙ্গার রসের ধারাটির কথা বিস্মৃত হয়েছেন। রাধার অভিমানের তীব্রতার কথাও, রাধার মান ভাঙানোর জন্য কী কী করতে হয়েছিল কৃষ্ণকে। এর দ্বারা আমি মোটেও প্রমাণ করতে চাইছি না যে, রাধাকৃষ্ণের প্রেম র‍্যাডিক্যল ছিল। কিন্তু ইন্দ্রিয়পরায়ণতাকে বাদ দিয়ে বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের ধারণা কল্পনা করা কঠিন। রজত রায়ের বক্তব্য থেকে বেশকিছু বিপরীতার্থক যুগ্ম উঠে আসে—প্রাচ্য/পাশ্চাত্য, আবেগ/মনন বা যুক্তি, শীলিত/অপরিশীলিত, পবিত্র প্রেম/ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, প্রকৃতি/পুরুষ ইত্যাদি। তাছাড়া যে ঐহিহ্যের ধারাবাহিকতার কথা রজতবাবু বলেছেন তা সম্পূর্ণভাবে হিন্দু পুরান-উপকথার রূপকল্প। বাংলার মধ্যযুগের ঐতিহ্যে কেবলমাত্র যে হিন্দু রূপকল্প ছিল না, সেটা বলাবাহুল্য। বর্ণহিন্দু সমাজে উনবিংশ শতকে প্রাক-

বিবাহ প্রেম না থাকলেও বিভিন্ন জনজাতি এবং অন্তজ সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিল। তাদের অনেকেই মধ্যবিত্ত বাঙালির চেনা চৌহদ্দির আশে পাশেই ছিলেন। তাছাড়া আধুনিকতার ভিতরকার স্ববিরোধ, বৈপরীত্য এবং বহুত্বকে তিনি উপেক্ষা করে, love-কে শুধুমাত্র বিদেশ থেকে আমদানীকৃত একটি ধারণামাত্রে পর্যুবসিত করেছেন। পরিবর্তনকামী তরুণ সাহিত্যিকরা ঐতিহ্যগত প্রতীকের বাইরে গিয়ে নতুন ভাষা-রূপকের সন্ধান করছিলেন। তাদের লেখায় যে সাংস্কৃতিক আবেগ ফুটে উঠেছে তা কেবলমাত্র ঔপনিবেশিকতার অংশ নয়, বরং অনেকাংশেই দেশজ পিতৃতান্ত্রিক সংস্কৃতির অংশ। মনুবাদ, জাতি-বর্ণ ব্যবস্থা, বাল্যবিবাহ, বয়োজ্যেষ্ঠদের তত্ত্বাবধানে আদর্শ পাত্র/পাত্রী নির্বাচন, স্ত্রী কন্যা সহ যাবতীয় নারীর প্রতি অবহেলা, নারীপুরুষ কারোরই পছন্দের সঙ্গী এবং যৌন-পছন্দ না থাকা ইত্যাদি দেশজ পুরুষ/পিতৃতন্ত্রের সংস্কৃতির প্রেক্ষিতে বিশ শতকের নারী-পুরুষের সম্পর্কের আবেগকে বুঝতে হবে। অন্যদিকে পাশ্চাত্যের প্রভাব যে কেবলমাত্র পুরুষদের উপরেই পড়েছিল এমনটা নয়। মেয়েরাও বিদেশী সাহিত্য পড়তেন, যথেষ্ট পরিমাণেই। স্বর্ণকুমারী দেবী থেকে শান্তা দেবী, সীতা দেবী, আশালতা সিংহ, বেগম রোকেয়া—অনেক মেয়ের লেখায়, প্রবন্ধে তো বটেই, উপন্যাসের চরিত্রের মুখেও, বিদেশী সাহিত্যের আলোচনা পাওয়া যায়। একজনের উল্লেখ করা জরুরি। যে মেরি করেলির লেখার প্রসঙ্গে রিটা ফেলস্কি কিচ সাহিত্যের নারীবাদী পাঠ উপস্থাপিত করেছেন, সেই বেস্টসেলার করেলির কথা পাই আমরা নারী ঔপন্যাসিকদের কলমে। শৈলবালা ঘোষজায়া তাঁর *তেজস্বতী* উপন্যাসের করেলির কথা লিখছেন, '...তবু তাহার মধ্যে যে উচ্চ তপস্যাপূত, নির্মল-সুন্দর সত্যনিষ্ঠ প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায়, তার মধ্যে কপটতা নেই।'[35] অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন লেখার প্রভাব নারী-পুরুষভেদেও ছিল

[35] শৈলবালা ঘোষজায়া, *তেজস্বতী*, উদ্ধৃত করেছেন সুদক্ষিণা ঘোষ, ২০০৮, পৃ. ২৫৯।

ভিন্ন। মেয়েরা যে লেখাগুলির সঙ্গে একাত্মবোধ করতেন, পুরুষরা সেগুলির সঙ্গে নয়। নানান দিক বিচার করে আমার মনে হয়েছে রজতকান্ত রায়ের বক্তব্য অত্যন্ত সরলীকৃত এবং একপেশে বিশ্লেষণী কাঠামোর উপর দাঁড়িয়ে। শুধুমাত্র লিঙ্গগত পক্ষপাত নয়, ধর্ম-বর্ণগত পক্ষপাতদুষ্টও বটে।

রিটা ফেলস্কি আবেগ, ভাবালুতা, অতিনাটকীয়তা এবং ধর্মপরায়ণতাকে নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং প্রতিস্পর্ধার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহারের পক্ষপাতি। রিটা মনে করেন, *কিচ* নামক বর্গটি এতই মার্যাদাহানীকর জাত্যার্থ দ্বারা ভারাক্রান্ত যে মহিলা-রচিত কাহিনির আলোচনায় কার্যকরী কোনোও ভূমিকা রাখতে অক্ষম। তাই তিনি *কিচ*-র বিকল্প হিসাবে 'popular sublime' নামক ধারণাকে তুলে ধরতে চান। চান এই পরিভাষার মাধ্যমে মেয়েদের লেখালিখিকে বিশ্লেষণ করতে।[36] বলা যেতে পারে, এতদিন যে সাহিত্যকে অবজ্ঞা করা হয়েছে ভ্যাদভ্যাদে ভাবাবেগ বলে, তার পরিবর্তে রিটা 'জনপ্রিয় পরম বা মহত্তম'-এর একটি ধারণাকে সামনে আনতে চান। একই সমস্যাকে তিনি খতিয়ে দেখতে চান অপেক্ষাকৃত কম-নির্ধারিত (less deterministic) বা অস্থিরীকৃত কেতায়। মেয়েদের লেখালিখিতে ঢোকার আগে তিনি আধুনিক গণ-সংস্কৃতি (mass culture)-র কেন্দ্রীয় উদ্দীপনাগুলিকে বিশ্লেষণ করেছেন। প্রথমত, তুরীয় অবস্থার জন্য আকুতি। দ্বিতীয়ত, গৌরবান্বিত হওয়ার প্রতি আকাঙ্খা। পরিশেষে অনির্বচনীয় বা ভাষাতীতের প্রতি কামনা। এই মহিমান্বিত বা পরমের সঙ্গে সংযুক্তভাবে এসে পড়ে আরও কিছু ধ্যান ধারণা। যেগুলিকে আমারা নারীবাদী বীক্ষায় লিঙ্গ-সংবেদী হিসাবে ব্যবহার করতে পারি। রিটা মনে করেন এই মহিমান্বিত বা পরমের ধারণা হল আভঁ-গার্দের সমালোচনা। নিছক গণ-বাজারি (mass-market) লেখা নয়। উদাহরণ

[36] Felski, 1995, 119.

স্বরূপ তিনি লিওতারকে উদ্ধৃত করেছেন। লিওতারের মতে এই পরমের অবস্থান সৌন্দর্য ও রাজনীতির হৃদয়ে। এ হল সেই মহিমান্বিত যা প্রচলিত যাবতীয় সন্দর্ভ, রীতিনীতি এবং অর্থ ব্যবস্থার ঊর্ধ্বে অবস্থান করে।[37] ভয় বা আতঙ্ক থেকে পরমকে চিহ্নিত করার যে ধারা, তা এই বিষয়ের বহুবৈচিত্রময় ইতিহাসের একটা অংশমাত্র। যথারীতি মহিমান্বিতের যে কল্পনা সাধারণত করা হয়ে থাকে, তিনি সর্বদাই পুরুষ। এর বিপ্রতীপে দাঁড়িয়ে যদি মেয়েলি রীতির রোমান্স ও অতিনাটকীয়তার অভ্যন্তরে এই মহিমান্বিতকে খোঁজার প্রচেষ্টা চলে তাহলে সেটাই হবে প্রচলিত ধারণাকে প্রশ্ন করা। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই পরমকে সংযুক্ত করা হয় আবেগময়তা, ছেদ এবং আত্ম-অপচয়ের সঙ্গে। আর ঐতিহাসিক ভাবেই এই প্রক্রিয়া লিঙ্গায়িত। পুরুষালী নয় মেয়েলি। অ্যান চেকোভিচ মনে করেন, আসলে এই *মহিমান্বিত* হল সাংস্কৃতিকভাবে সম্মাননীয় একটি খন্ডমাত্র, যা খুজে পাওয়া যেতে পারে অতিনাটকীয়তা, আবেগঘন লেখাপত্র এবং উত্তেজনাপূর্ণ কাহিনির মেয়েলিকৃত বা নারীত্বায়িত রূপের মধ্যে।[38] এইখানে রিটার উদ্দেশ্য হল *জনপ্রিয় মহিমান্বিত বা পরম*-র সন্ধান করা, *অনির্বচণীয়*-কে চিহ্নিত করা এবং তার সঙ্গে তার জনপ্রিয় উপস্থাপনের আপাত বিরোধীভাবকে আলোচনার পরিসরে টেনে আনা। রিটা খুব সুন্দর করে লিখেছেন, তিনি সেই অনির্বচণীয় বা অবর্ণণীয় এবং তার জনপ্রিয় উপস্থাপনার মধ্যে যে আপাত-বৈপরীত্য (paradoxical) বা বিরোধাভাস (oxymoronic)-কে খতিয়ে দেখতে চাইছেন।[39]

---

37 জঁ ফ্রঁসোয়া লিওতার, "দ্য সাব্লাইম অ্যান্ড দ্য আভঁ-গার্দ", *ইনহিউম্যান* (স্ট্যান্ডফোর্ড: স্ট্যান্ডফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেস, ১৯৬০), উদ্ধৃত করেছেন রিটা ফেলস্কি তাঁর *জেন্ডার অফ মডানিটি*, রীতা ফেলস্কি, (হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, কেমব্রিজ, ম্যাসাচুসেটস, লন্ডন, ১৯৯৫), পৃ. ১১৯।

38 মিক্সড ফিলিং: ফেমিনিজম, ম্যাস কালচার, অ্যান্ড ভিক্টোরিয়ান সেন্সেনালিজম (নিউ বার্নস উইক: রাটগারস উনিভারসিটি প্রেস, ১৯৯২), উদ্ধৃত করেছেন রিটা ফেলস্কি, ১৯৯৫, পৃ. ১২০।

39 Felski, 1995, 120.

ধর্মীয় ক্ষেত্রে মহিমান্বিতের ধারণা বা *কিচ* সাহিত্য আধুনিকতার অনেক আগে থেকেই ছিল এবং বর্তমান যুগেও তা অব্যাহত। সেলেস্ত ওলালকিওগা, ভেনেজুয়েলার বিখ্যাত লেখিকা, ধর্মীয় কিচ সম্পর্কে বলেছেন, এই ধরণের কাঠামো, ধারণের-অতীত বিমূর্তকে পরিচিতির মধ্যে আনার চেষ্টা করে। বাস্তবে পরিণত করতে চায় তুরীয়কে। সেই কারণে একটি টানাপোড়েনের ক্ষেত্র তৈরি হয়, অপার্থিবের সঙ্গে পরিচিত এবং প্রতিষ্ঠিত রীতিনীতির মাধ্যমে তাকে প্রকাশের মধ্য দিয়ে। রিটা তাই *sublime*-র সহজ অর্থ করেছেন 'অনন্তের প্রতি মানবী মস্তিষ্কের উচ্চাকাঙ্ক্ষা', যার মধ্য দিয়ে বিদারণ (rupture), স্থানান্তর (transport) এবং আত্ম-দেহাতীত (self-transcendence)-এর অনুভূতি পাওয়া যায়। যা আবার যুক্ত অনির্বচণীয় এবং অপার্থিবের ধারণার সঙ্গে। তাই এই ধরণের আদর্শবাদী বা কাল্পনিক/ইউটোপিয়ান জনপ্রিয় কাহিনিগুলির মধ্যেকার পরিব্যাপ্তির প্রবণতা বা ধাঁচাটি আধুনিকতার সঙ্গে আসা ক্রমবর্ধমান মোহমুক্তির ভিত ক্ষয়িয়ে দেয়। পাঠককে টেনে নিয়ে যায় পলায়নবাদী সুখস্বপ্নের অনিবার্য শক্তিতে এবং আদর্শের প্রতি আকাঙ্ক্ষার দিকে।[40] মেরি করেলির উপন্যাস প্রসঙ্গে ডি. লিভিসের বক্তব্যকে উদ্ধৃত করেছেন রিটা। লিভিস যথেষ্ট অবজ্ঞাসূচকভাবে এই জাতীয় সাহিত্যগুলি সম্পর্কে বলেছেন, এরা আবেগমথিত শব্দভান্ডারের সেই বিশেষ শব্দগুলি নিয়ে খেলা করে, যার মাধ্যমে পাঠকের মনে তৈরি হয় ধর্ম ও ধর্মীয় বিকল্পগুলির সঙ্গে সংযুক্ত অস্পষ্ট অনুভূতির জোয়ার। যেমন ধরা যাক, জীবন, মৃত্যু, প্রেম, ভালো, মন্দ, পাপ, ঘর, মা, মহান, ভদ্র, পবিত্র, সম্মান ইত্যাদি। তিনি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈশিষ্ট্যের প্রতিও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, জনপ্রিয় সাহিত্যগুলিতে যে ধরণের শব্দভান্ডার ব্যবহৃত হয় সেগুলি মোটেই প্রাত্যহিকের সঙ্গে সংযুক্ত শব্দ নয়। বরং

40 Felski, 1995, 120.

রোববারের সাজগোজ বা বিশাল কোনো ঘটনার সঙ্গে বিশেষ মিল পাওয়া যায়। পাঠকের মনে সাহায্য পাওয়ার অনুভূতি সৃষ্টি হয়, মনে হয় যেন বা আদর্শের সঙ্গে তার সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে।[41]

আদর্শবাদী এবং আবেগতাড়িত স্তরের উপন্যাসগুলি লিঙ্গ-রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত বলে রিটা মনে করেন। পিটার ব্রুক তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ *দ্য মেলোড্রামাটিক ইমাজিনেশন: বালজাক, হেনরি জেমস, অ্যান্ড দ্য মোড অফ এক্সেস*-এ অতিনাটকীয়তার বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। যেমন, শক্তিশালী আবেগকে প্রশ্রয় দেওয়া, নৈতিক মেরুকরণ ও বিন্যাস, জীবন ধারণ, পরিস্থিতি ও কার্যকলাপের চরম অবস্থা, প্রকট শত্রুতা, শুভ/ভালো-র নিপীড়ন, অন্তে সদগুণের পুরস্কার, পরিস্ফীত এবং অসংযত বহিঃপ্রকাশ, অন্ধকারময় কাহিনি বিন্যাস, রহস্য, উত্তেজনা, রুদ্ধশ্বাস, আকস্মিক ভাগ্যোদয় বা ভাগ্যের দ্রুত পরিবর্তন, অসম্ভব সমাপতন ইত্যাদি। কাহিনির চরিত্রগুলি অনেক ক্ষেত্রেই রূপকধর্মী (allegorical) বা প্রতীকস্বরূপ (emblematic), মনস্তাত্ত্বিক ভাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র নির্মাণের বদলে যা মূর্ত করে মানব চরিত্রের বিশুদ্ধ ও অনিবার্য গুণাবলিগুলিকে। মূর্ত শরীর সেখানে আত্মার/ সত্তার গুণের আভাস দেয় এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় পাঠকের কাছে পৌঁছে দেয় চরিত্রের নৈতিক অবস্থান। পিটার মনে করেন, এই ধরণের কার্যকলাপই অতিনাটকীয়তার কেন্দ্রীয় ভাব, যেখানে চরিত্ররা নিজেদের, অন্যের এবং জগতের নৈতিকতার বিষয়ে সোচ্চারে রায় দিয়ে থাকে।[42] করেলির রচনা কেন আলোচ্য সময়ের বাঙালি মেয়েদের ভালো লেগেছিল তা বোঝা যাচ্ছে। নিজেদের কঠোর

---

41 Felski, 1995, 117.

42 *দ্য মেলোড্রামাটিক ইমাজিনেশন: বালজাক, হেনরি জেমস, অ্যান্ড দ্য মোড অফ এক্সেস*, নিউ ইয়র্ক, কলম্বিয়া উনিভারসিটি, ১৯৮৪, উদ্ধৃত করেছেন রিটা ফেলস্কি তাঁর আধুনিকতার লিঙ্গ/ *জেন্ডার অফ মডার্নিটি*, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, কেমব্রিজ, ম্যাসাচুসেটস, লন্ডন, ১৯৯৫, পৃ. ১২২।

নৈতিক চরিত্র নির্মাণ এক্ষেত্রে হয়ে ওঠে তাদের প্রতি প্রতি মূহুর্তে ঘটে চলা অন্যায়ের প্রতিবাদ করার হাতিয়ার।

নারীর আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্ব (পুরুষের উপর) প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে প্রাধান্যকারী বয়ানের সঙ্গে একটা সমঝোতায় আসা সম্ভব হয়। প্রেম-যৌনতা, ভিতর-বাহির, আবেগ-যুক্তি ইত্যাদি বিপরীত যুগ্মপদের বিরোধিতা উপরোক্ত অবস্থানের মাধ্যমে করা সম্ভব না হলেও, এই বিভাজনের মধ্যে দিয়ে নারীর যে অবমূল্যায়ণ করা হত তার বদল ঘটানো সম্ভবপর হয়ে ওঠে, নারীর অবস্থান-স্বার্থ-দাবিকে উর্দ্ধে তুলে ধরার মধ্য দিয়ে। তবে সমস্যা থেকে যায় কয়েকটি বিষয়ে। কারণ এই প্রক্রিয়ায় পুরুষ/পিতৃতন্ত্রের মূলগত ভিত্তিকে প্রশ্ন করা হচ্ছে না। বরং সামাজিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত ধারণাগুলিকে আত্তীকরণের প্রবণতা থেকে যাচ্ছে। বাঙালি পরিবারগুলিতে কঠোর রীতি-আচার পালনকারী শুদ্ধাচারী মহিলার দেখা মিলত। তাদের মধ্যে রক্ষণশীল মনোভাবে প্রকাশও ঘটত প্রায়শ। তবে অন্যথা যে হত না তা নয়। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যৌনতার দিক দিয়ে মুক্তমনা নারীরা কঠোর সামাজিক নিয়মপালনকারীদের আক্রমণের মূল লক্ষ্যে পরিণত হয়। আবার র‍্যাডিক্যল মেয়েদের ক্ষেত্রে ঘটে ঠিক বিপরীত প্রতিক্রিয়া। আধুনিক জগতে প্রবেশের সময় পুরুষের মত হয়ে ওঠার তাগিদে এই মেয়েরা নৈতিক কর্তব্যের প্রতি তাদের বিশেষ দাবিগুলিকে সমর্পণ করে দিতে থাকে।[43] তাই জনপ্রিয় মহিমান্বিতের ধারণা সম্পন্ন রচনাগুলিতে প্রায়শই কিছু স্ববিরোধ দেখা যায়। কখনও বা তারা মেয়েলিপনাকে নিজেদের অধিকার মনে করে আঁকড়ে ধরে, আবার কখনও বিপরীত লিঙ্গের প্রতি প্রকাশ করে চরম রাগ, বিরক্তি, হতাশা, সেই সঙ্গে পরমাত্মার সঙ্গে তুরীয় মিলনের আকাঙ্খায় নিজেকে সমর্পনের মধ্য দিয়ে পেতে চায় মুক্তি, প্রতিষ্ঠা করতে চায়

[43] Felski, 1995, 128.

নিজের যৌক্তিকতা। তবে একই সঙ্গে এই মানসিকতায় বিষমলিঙ্গ-প্রেমের আদর্শস্থাপনকারী, পরিণামবাদী (heterosexual normative, deterministic) স্বাভাবিকতা থেকে প্রস্থানের চেষ্টাও দেখা দেয়। নারীর মুক্তি ও পরমানন্দ লাভের পৃথক পন্থা হিসাবে নারী-পুরুষের প্রেমের বাইরে অন্য বিকল্পের খোঁজ চলতে থাকে। তাছাড়া প্রাত্যহিক ঘর-গেরস্থালী, স্বামী-সংসারের মধ্যে নিমজ্জিত থাকার বদলে আধ্যাত্মিক নিবিষ্টতায় নিজের একাকী পরিসর খুজে নেওয়ার মাধ্যমে নারীর বিষয়ীসত্তা এবং কর্তৃত্ব (agency) তৈরির সম্ভবনা বাড়ে। ভারতের আধ্যাত্মিকতার ধারণায় মীরা বা রাধার এই নিবিষ্টতার ঐতিহ্য প্রাচীন। এই দুইজনের ক্ষেত্রেই দেখা যায় প্রেমই (লোকোত্তর বা লোকায়ত যাই হোক না কেন) তাদের তাদের জীবনের মূল ছন্দ বা বিষয়ীসত্তার প্রধান ভরকেন্দ্র। প্রেমের স্বার্থে তারা নারীর জন্য নির্ধারিত সব কাজ ও দায়িত্বকে সহজেই উপেক্ষা করতে পারে। নারী সুলভ যাপনকে বিপর্যস্ত করে দিতে পারে। শত বিদ্রুপ, শত অপমান, অত্যাচারেও অবিচলিত। হয়তবা তারা এমন এক উচ্চতায় অবস্থান করে যেখানে, এই সব কিছুই স্পর্শই করে না। নিবিষ্টতা তাদের চারপারের বাস্তবতাকেও পরিবর্তন করতে পারে। হয়ত সেই পরিবর্তনে তাদের কোনো সুবিধা বা লাভ হয় না, পড়তে হয় প্রবল সমস্যাজনক পরিস্থিতিতে। কিন্ত তা বিস্থিত (destabibilize) করার ক্ষমতা রাখে প্রচলিত সংস্থানকে। অনঢ় থাকবন্দী কাঠামোয় ঘটাতে পারে সেই বিদারণ যা সমাজের মান্যতাকে বদলাতে না পারলেও, প্রশ্ন করতে পারে।

রিটা ফেলস্কি আধুনিক নারীর বিষয়ীসত্তা হিসাবে উন্মাদিনীর ধারণাকে তাত্ত্বিকভাবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। যে ক্রমাগত ঘেরাটোপের মান্যতাকে প্রশ্ন করে চলে। মধ্যযুগের মীরার চরিত্রের মধ্যেই সেই সম্ভবনা খুঁজে দেখা যেতে পারে। মীরার ভজন থেকেই জানা যায় কৃষ্ণপ্রেমে সে পাগল হয়ে প্রকাশ্য রাস্তায় নেমে এসেছিল,

রাজ-অন্তঃপুর ছেড়ে। পাগলিনী মীরা, কুলত্যাগিনী। তাই রানা নিজের হাতে তাকে তুলে দিয়েছিলেন বিষের পাত্র। প্রেমের ধারণা ছিল তখন ধর্মের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, নশ্বর মানুষের সেখানে কোনো ভূমিকা নেই। দৈনন্দিন জীবনে প্রেমের কোনো স্থান নেই, কারণ প্রেম অবিনশ্বর, ঐশ্বরিক, সমাজের বিধানের বাইরে। সেই প্রেমকে মীরা টেনে এনেছেন সমাজের ভিতরে :

বিষ কা পেয়ালা রানাজি নে ভেজা
পিওয়াৎ মীরা হাসিঁ রে
লোক কহে মীরা ভায়ি রে বাওরি
নাথ কহে কুলনাশী
মীরা কহে প্রভু গিরিধর নাগর
সহজ মিলে অভিনাশী রে
পাগ ঘুঙরু বাঁধ মীরা নাচি রে।

(মীরা ভজন, কণ্ঠ: এম. এস. শুভলক্ষ্মী, সঙ্গীত নির্দেশক: নরেশ ভট্টাচার্য, এস. ভি. ভেঙ্কটরামন, ১৯৬৫)

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এই জাতীয় নারী চরিত্রের উদাহরণ যেমন ভারতীয় ধর্ম-সাহিত্যে আছে, তার পাশাপাশি আরও অনেক দৃঢ় ভাবে প্রোথিত আছে সীতা-সাবিত্রি-দময়ন্তীর মডেল। পরিব্রতা, সর্বত্যাগিনী, সর্বংসহা নারীই সংসারের প্রকৃত ধাত্রী। সেই নারী তার জীবনের মূল্যে (জীবনের মূল্য শব্দবন্ধের অর্থ শুধুমাত্র ত্যাগ স্বীকার, পরিশ্রম অথবা পরের জন্য আত্ম্যোৎসর্গ করারই নয়। বরং তার সমগ্র বিষয়ীসত্তা, জীবিত সামাজিক প্রাণী হিসাবে তার যাবতীয় পরিচিতি ও উপস্থিতির কথা বোঝাতে চাইছি) কেবলমাত্র সংসারের সেবা করে না, পুরুষকে যোগান দেয় আশ্রয় এবং সেই মহামূল্য অবসর, যাতে সে তার ইচ্ছে মত নেশা, অর্থ উপার্জন, জ্ঞানচর্চা বা সাহিত্য সাধনায়

নিজেকে নিয়োজিত করতে পারে। এই পুরুষ কখনও পিতা, কখনও স্বামী কিম্বা সন্তান, যে প্রয়োজন পড়লে খুঁজে নিতে পারে অন্য কোনো আশ্রয়। স্ত্রীর ভূমিকায় নারীর দায়িত্ব হয়ে পড়ে সবথেকে কঠিন। রত্নগর্ভা মাতার গৌরব তার নেই, গৌরব অর্জনের পথও তেমন নেই, অনেক পুরুষ সন্তান ধারণ এবং সতী হওয়ার সুযোগ পাওয়া ছাড়া। প্রাথমিকভাবে স্বামীই যেহেতু তার একমাত্র পরিচিতি, তাই তার পরীক্ষা চলে প্রতি মূহুর্তে। সপত্নীক যাপন কেবল মহাভারতের কালেই নয়, এই সেদিন পর্যন্ত (বিংশ শতকের শুরুর দিকে বা তার পরেও) বলবৎ ছিল বহাল তবিয়তেই। নিজের সধবাবস্থা বজায় রাখার জন্য যেকোনো কষ্ট স্বীকারকেই নারীশক্তির পরিচায়ক বলে জ্ঞান করা হত। বলা বাহুল্য কোনো মেয়েকেই মীরা বা রাধার মতো নিবিষ্টচিত্ত হওয়ার আশির্বাদ করা হত না। নিজের বলে স্ত্রীলোকের কিছু থাকতে পারে, সেই ধারণাই গণমানসে তৈরী হতে যথেষ্ট সময় লেগেছে। সুতরাং স্বতঃসিদ্ধ আশীর্বাদ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল সীতা বা সাবিত্রী হয়ে ওঠার কথা। ভারতীয় তথা বাংলার ‘কিচ সাহিত্য’ পরিভাষা যদি প্রয়োগ করা যায়, তাহলে দেখা যাবে সেই জাতীয় সাহিত্যে আধিপত্য বিস্তার করে থেকেছে মূলত সীতা-সাবিত্রীর ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা। অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবী থেকে শুরু করে আশালতা দেবী পর্যন্ত স্বামীর প্রতি কর্তব্যকে প্রশ্ন করেছিলেন অনেকেই। কিন্তু মাতৃত্বের বিষয়টিকে কেউই অস্বীকার করতে পারেননি, প্রত্যেকেই অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। একমাত্র বোধহয় বেগম রোকেয়া তাঁর লিঙ্গ-অবস্থান সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন এবং লিঙ্গ-বৈষম্যের বিরুদ্ধে নিয়মিত প্রতিবাদ প্রকাশ করেছেন তাঁর লেখায়। এই স্থিরীকৃত কাঠামোর ভিতরেও প্রতিস্পর্ধী সম্ভবনা বা ইশারা নিহিত থাকতে পারে যা দুর্বল করে দিতে পারে নিজের ভিতকেই। সেই কারণেই ‘Cultural intepellation of femininity’-র উপর জোর দিয়েছেন রিটা। রচনার মেয়েলিকরণ

বা feminisation of text। *Interpellation* খুবই গুরুত্বপূর্ণ মার্ক্সিয় পরিভাষা হিসাবে আমাদের সামনে আসে। সাংস্কৃতিক বা মতাদর্শগত যেকোনো অবস্থান বা ধারণা আমরা যদি আত্মীকৃত করি, তাহলে তার ছাপ আমাদের জীবনে পড়তে বাধ্য। অনির্বচনীয়-র প্রতি যে রোমান্টিক আকুতি তা কিন্তু কালহীন (anachronic) অতীতের প্রত্যাবর্তনকে আদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠার রক্ষণশীল চেষ্টা নয়। বরং এই আকুতি আধুনিককালের গণ-সংস্কৃতির একটি প্রধান ও কেন্দ্রীয় বিষয় হিসাবেই উঠে আসে। আধুনিক লেখকদের রচনায় *কিচ* এই সাংস্কৃতিক ইন্টারপেলেশানের ইঙ্গিতই দেয়।[44]

এই প্রসঙ্গে একটি সাধারণ ভ্রান্তির কথা স্মরণে রাখা দরকার। জনপ্রিয় সাহিত্যকে মান্যতা দেওয়ার অতিরিক্ত প্রবণতার ফলে অনেক সময় মহাকাব্যিক স্তুতি ও আবেগপূর্ণ রচনাকেও মনে হতে পারে অন্তর্ঘাতমূলক। খুব ভাল গবেষণাতেও এই জাতীয় সমস্যা থেকে যায়, বিশেষ করে যেখানে পরিচয়ের রাজনীতি (identity politics) সংক্রান্ত আলোচনায় নারীকেই নারীলিঙ্গের যাবতীয় প্রতিরোধের জামিনদার নিযুক্ত করা হয় এবং নারী কর্তৃক রচিত যেকোনো রচনার গভীরেই নারীবাদ নিহিত আছে বলে জোর দেওয়া হয়। এই ক্ষেত্রে সচেতনতা জরুরি কারণ, জৈবিক ভাবে নারী হওয়ার জন্যেই কেউ পিতৃতন্ত্রের সর্বময় কাঠামো সম্পর্কে সচেতন হয়ে যায় না বা নারীবাদী হয়ে ওঠে না। নিশ্চিতভাবেই নারীর দৈনন্দিনতা ও প্রাত্যহিক যাপন গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আধিপত্যকামী ব্যবস্থা কিভাবে কাজ করে তা বোঝার জন্য সচেতন প্রয়াস জরুরি। বিশেষ করে ভারতের মতো বিষমবিকাশের দেশে সচেতনতারও স্তরভেদ থাকতে পারে। নারী কিভাবে কোন পরিস্থিতিতে পিতৃতন্ত্রের ধারকবাহক হয়ে ওঠে, সেই প্রক্রিয়া সম্পর্কেও বিশ্লেষণ জরুরি।

---

44 Felski, 1995, 121.

"The future must no longer be determined by the past. I don't deny that the effects of the past are still with us. But I refuse to strengthen them by repeating them, to confer upon them irremovability the equivalent of destiny, to confuse the biological and the cultural. Anticipation is imperative"।[45] আঁচ বা আন্দাজ হল অত্যাবশ্যক, বিশেষত নারী সম্পর্কীত বা আরও বিশেষ ভাবে বলতে গেলে লিঙ্গ সম্পর্কীত আলোচনায়। কারণ অতীতের অনুজ্ঞা কখন কিভাবে কোথায় ক্রিয়াশীল থেকে পুনরাবৃত্তি ঘটায়, বা আপাতভাবে প্রগতিশীলতার আড়ালে রক্ষণশীলতাকে প্রশ্রয় দিতে পারে, কিম্বা হয়ত কখনও সম্ভাবনা সৃষ্টি করে প্রতিস্পর্ধার, তা অনুধাবন করার জন্য দরকার কল্পনাশক্তির। যে কল্পনাশক্তি মূর্ত করতে পারে কল্পনাযোগ্যকে (imaginable), কাল্পনিককে (imaginary) নয়। লিঙ্গ-সম্পর্কের ইতিহাস রচনায় যা বিশেষ মূল্যবাহী। জনপ্রিয় সাহিত্যকে আমরা এই প্রেক্ষিত থেকে বিচার করলে নতুনতর সম্ভাবনাকে চিহ্নিত করা সম্ভব হতে পারে।

[45] Helene Cixoux, "The laugh of the Medusa", trans. Paula Cohen and Keith Cohen, Signs, vol. 4. (Summer, 1976), pp. 875-893.

উপসংহার

একটি আরম্ভের সূচনা

... And sorry I could not travel both
And be one traveler, long I stood
And looked down one as far as I could
To where it bent in the undergrowth:
Robert Frost, *The Road Not Taken.*

বাংলা কথাসাহিত্যে যৌনতা ও লিঙ্গ-সম্পর্কের নানামুখী প্রবণতাকে বোঝার জন্য আমি একটি বিশেষ কালপর্বকে চিহ্নিত করেছিলাম, যেখানে পরিবর্তনকে সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সমকাল ও পরবর্তীকালের উপস্থাপনায়। শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে কোনও *নতুন*-ই স্বয়ম্ভূ হতে পারে না। এক দীর্ঘ প্রস্তুতি পর্ব অতিক্রম করে তাকে আসতে হয়। অবশ্য আমি সাহিত্যের নতুন ধারা চিহ্নিত করতেও চাইনি। 'নতুন' বা 'পরিবর্তন'-এর ধারণাকে বিশ্লেষণ করে বুঝতে চেয়েছি তার অন্তর্গত লিঙ্গ-চেতনাকে। যৌনতা এবং লিঙ্গ-সম্পর্কের বিন্যাস ও উপস্থাপনে যেমন আমি পূর্বের ধারাবাহিকতাও লক্ষ্য করেছি, তেমনই কিছু রচনায় খুঁজে পেয়েছি প্রতিস্পর্ধী কণ্ঠস্বর; বা এমন কোনও নৈঃশব্দ যা অনেক সম্ভবনাকে ধারণ করতে করতে সক্ষম।

আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগের একটি ঐতিহাসিক কালপর্বের সাহিত্য বিচারের সময় যদি বর্তমান সময়ের লিঙ্গসচেতনতা এবং ধ্যানধারণা কঠোর ভাবে অনুসরণ করি তাহলে সব রচনাই সম্ভবত লিঙ্গায়িত (gendered) হিসাবে প্রতিপন্ন হবে। কারণ লিঙ্গ-কেন্দ্রিকতা ও সচেতনতা সংক্রান্ত বিবিধ ধারণা এবং মাপকাঠি উক্ত কালপর্বে বিকশিতই হয়নি। তাছাড়া পিতৃতন্ত্র এমন একটি পরিব্যাপ্তি যা অনেক সচেতনতার পরেও

তার চিহ্ন রেখে যায়। প্রতিটি অক্ষর এবং উচ্চারণের শরীরেই থাকে তার ছাপ। আমরা তাই প্রতিস্পর্ধী বা বিদারণমূলক সম্ভাবনাকে চিহ্নিত করতে পারি মাত্র। ঠাসবুনোটে ফাটল বা চ্যুতিরেখার খোঁজ করতে পারি। অলোচ্য কালপর্বে বাংলা সাহিত্যে লিঙ্গ-সম্পর্ক এবং যৌনতার অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমি মূলত কয়েকটি ধারণা এবং বর্গকে সমস্যায়িত করতে চেয়েছি। কারণ কোনও একটি বিশেষ ঐতিহাসিক সময়ে বিশেষ বিশেষ বর্গগুলিই নৈতিকতার মানদণ্ড নির্ধারণ করে এবং একটি মান্য ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে যার উপর দাঁড়িয়ে থাকে শিল্প-সংস্কৃতির নানাবিধ প্রকাশ। লিঙ্গ-সম্পর্ক হল এমন একটি বিষয় যা সমাজ-সংস্কৃতি-মনস্তত্ত্ব সব স্তরেই কখনও প্রকাশ্যে কখনও অন্তরালে বহমান থাকে।

সন্দর্ভটি লিখতে গিয়ে আমায় বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থ এবং সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কিত গ্রন্থ পাঠ করতে হয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখেছি লেখকদের চিন্তাভাবনা খুবই বেশি মাত্রায় লিঙ্গায়িত। দুঃখের বিষয় হল, এক্ষেত্রেও নারী এবং পুরুষ ঐতিহাসিক (ইতিহাস নামক ডিসিপ্লিন বা সাহিত্যের ইতিহাস এই দুটি বিষয়েই যারা চর্চা করেছেন)-এর মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য থেকে গেছে। মহিলা লেখকরা তুলনামূলকভাবে অধিক লিঙ্গ-সংবেদী। পুরুষ/পিতৃতন্ত্রের ভিতরে নারীর অবস্থান নির্ণয়ের বিষয়ে তাঁদের ধারণার স্বচ্ছতা আমায় অনুপ্রাণিত করেছে। সাহিত্যের ইতিহাসের ক্ষেত্রে লিঙ্গ-সচেতনার অভাব এবং লিঙ্গ-বৈষম্যমূলক মন্তব্য ও বিশ্লেষণের আধিক্য অত্যন্ত পীড়াদায়ক। ফলত গবেষণার শেষে একটি অত্যন্ত দুঃখজনক সত্যের সম্মুখীন হতে হল। মাত্র একশো বছরের মধ্যে আমরা আমাদের মহিলা সাহিত্য ঐতিহ্যকে প্রায় বিলুপ্ত করে দিতে পেরেছি। অন্তত সাত-আট জন মহিলা সেই সময় লিখেছেন যাদের উপন্যাসের সংখ্যা কুড়ির অধিক বা আশেপাশে। বেশির ভাগই সংরক্ষণের অভাবে পাওয়া যায় না, এমনকি পাঠাগারগুলিতেও না। যাদবপুর এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবী বিদ্যাচর্চা কেন্দ্র যেগুলি সংরক্ষণ

করেছেন, মূলত সেগুলির উপরেই নির্ভর করতে হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসও সেই কারণে অসম্পূর্ণ, তা খণ্ডিত ইতিহাস পরিবেশন করে। পুরুষ লেখকদের এক এক জনের জন্য পাতার পর পাতা লেখার পর একটি অনুচ্ছেদ রাখা হয়েছে মেয়েদের জন্য। অনেক সময়ই মেয়েদের লেখা উপন্যাস ও গল্পের কেবলমাত্র নাম ও প্রকাশ সাল জানাটাও কঠিন হয়ে পড়েছে। কেবল নারীর রচনার ক্ষেত্রে নয়, পুরুষ সাহিত্যিকদের সমস্ত রচনাও সহজলভ্য নয়, অনেক সময়ই দুষ্প্রাপ্য। শুধু লিঙ্গ-বৈষম্য নয়, আরো নানা ধরণের পক্ষপাতদুষ্টতার ফলস্বরূপ কোনও বিশেষ সাতিহ্যিকের বিশেষ কালপর্বের রচনা সংরক্ষণের অনিহা কাজ করেছে। সাধারণভাবে সচেতনতার অভাব এবং সংরক্ষণের প্রতি অনাগ্রহে অনেক লেখাই সংগৃহীত হয়নি। বর্তমান গবেষণাপর্বটি আমায় আরও গভীরে অনুসন্ধানের জন্য অনুপ্রাণিত করেছে বললে কম বলা হবে। প্রকৃতপ্রস্তাবে এই গবেষণা সম্পূর্ণতা পেতে পারে আরও কয়েকটি ক্ষেত্রে আনুভূমিক ও সমান্তরালভাবে প্রবেশ করতে পারলে। প্রথম উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন বিশ শতকের প্রথমার্ধের বিভিন্ন রচনার অনুসন্ধান ও যথাযথ সংরক্ষণ। অর্থাৎ রচনার সময় থেকে শুরু করে প্রকাশ কাল, কোথায় প্রকাশিত হয়েছিল, পুর্নমুদ্রন এবং সংস্করণসমূহ, কোনও বিশেষ রচনা সংক্রান্ত বিতর্ক, চিঠিপত্র, লেখক-সম্পাদক-প্রকাশক লিখিত ভূমিকা ইত্যাদি সমস্ত কিছুর উদ্ধার ও সংরক্ষণ। কাজটি নিঃসন্দেহে শ্রম এবং সময়সাধ্য।

দ্বিতীয় বিষয়টি বর্তমান সন্দর্ভের তাত্ত্বিক কাঠামোর সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। আমি বিভিন্ন বর্গ ও ধারণা নিয়ে আলোচনার করেছি তার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছি বলেই। এবার এই আলোচনার আলোকে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বিভিন্ন সাহিত্যিকের সৃষ্টিশীল লেখার (যত বেশি সংখ্যক উপন্যাস ও গল্প সংগ্রহ করা সম্ভব) বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। গবেষণাপত্রের ক্ষুদ্র পরিসরে সেই কাজ সম্ভবপর ছিল না। তাছাড়া এই কাজ সীমিত

সময়েরও নয়। আমি সাহিত্য-পাঠের অভিজ্ঞতা থেকে একথা অনুভব করেছি যে মান্য নৈতিকতাকে প্রশ্ন করার বা অতিক্রম করে যাওয়ার সম্ভাবনা বা ক্ষমতা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে অনেকের লেখাতেই আছে। প্রত্যেকের প্রতিটি লেখাই যে সম্ভাবনাময় সেকথা আমি অবশ্যই দাবি করব না।

১৯২০-৪০-এর ঐতিহাসিক দাবি হিসাবেই উঠে এসেছিল নারী-পুরুষের সম্পর্ককে নতুন ভাবে বোঝার চেষ্টা। সাহিত্যিকদের প্রায় প্রত্যেকেই এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে চেয়েছেন। অবশ্যই পন্থা-প্রকরণ-পটভূমি-আঙ্গিকের পার্থক্য ছিল। তাছাড়া নারী-পুরুষের সম্পর্ককে বোঝার চেষ্টা মানেই যে যৌনতার উপরে জোর পড়বে এমনটা নয়। এই প্রচেষ্টাগুলির বহুমুখীনতা লক্ষ্যণীয়। কিন্তু সব রচনাই যে লিঙ্গ-সংবেদী হয়ে উঠেছে বা উঠতে চেয়েছে তা নয়। নারী সম্পর্কে পূর্ববর্তী ধ্যানধারণার ধারাবাহিকতা অনেক ক্ষেত্রেই বজায় ছিল। 'লিঙ্গ' শব্দটির মধ্যে দিয়ে sex এবং gender দুটি ধারণাই প্রকাশিত হয়। সেই অর্থে বাংলা ভাষায় sex, gender-এর পৃথক কোনও প্রতিশব্দ নেই। আমি লিঙ্গ-সম্পর্ক বলতে gender relation-কেই বোঝাতে চেয়েছি। সেই কারণেই ভিত্তিমূলক ধারণাগুলির উপরে বেশি জোর দিয়েছি কারণ নারীর নারী হয়ে ওঠা এবং পুরুষের পুরুষ হয়ে ওঠার পিছনে সামগ্রিক সামাজিক কাঠামোর ভূমিকা থাকে এবং তা অনেকাংশেই স্থান-কাল-পাত্র নির্ভর। এই হয়ে ওঠা নির্ধারিত হয় ঐতিহ্যগত নৈতিক অনুশাসনের মধ্য দিয়ে। Gender-এর নির্মাণের সঙ্গে জড়িত ঔচিত্য-অনৌচিত্যের প্রশ্ন। লিঙ্গভেদে তার সামাজিক দায়িত্ব, কার্যভার, কাজের পদ্ধতি, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ভূমিকাও নির্দিষ্ট হয়। বলা ভালো উপরোক্ত শর্তাবলীর মধ্যে দিয়েই নারী নিজেকে নারী এবং পুরুষ নিজেকে পুরুষ বলে চিনতে শেখে। আমাদের আলোচ্য সময়ে সামাজিক শর্তাবলীর ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। তার অর্থ এই নয় যে নারী-পুরুষ বিভাজনের ক্ষেত্রে

কোনও পরিবর্তন এসেছিল। বলা যায় নারীর নারীত্বের শর্তগুলি কয়েকটি ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী অবস্থান থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়েছিল। সেই পরিবর্তন নারীর ইচ্ছার উপরে নির্ভর করে হয়নি, তাই পরিবর্তনের সাপেক্ষে পুরুষ-নারী উভয়কেই বোঝাপড়া করতে হয়েছিল। কিন্তু পরিস্থিতি পরিবর্তনের ফলে নারীর পূর্ববর্তী অবস্থার পরিবর্তন হয়েছিল অনেকটাই। নারী তার অবস্থান এবং অধিকার সম্বন্ধে ক্রমশ সচেতন হয়ে উঠতে শুরু করেছিল। পুরুষ তার প্রতিক্রিয়া জানাতে খানিকটা বাধ্য হয়েছিল বলা যায়। পাশ্চাত্যের নারী-পুরুষের সম্পর্কে পরিবর্তনের প্রতিফলন পড়েছিল সেখানকার সাহিত্যে। বাঙালি উচ্চ শিক্ষিত বৌদ্ধিক নাগরিক সমাজের এক অংশের মধ্যে সেগুলি পাঠের প্রভাব ছিল, যথারীতি প্রভাবের ধরণেও ছিল বিভিন্নতা। তবে এক ধরণের সদর্থক প্রতিক্রিয়া এবং প্রত্যাশারও জন্ম হয়েছিল। পাশ্চাত্যের নারী-পুরুষের সম্পর্ক তাদের কাছে কল্পরাজ্যের সন্ধান এনে দিয়েছিল যেন। আধুনিক বিষয়ী হিসাবে নিজেদের চিহ্নিত করার তাগিদে বা আকর্ষণে সাহিত্যিকদের একাংশ চেয়েছিলেন তাদের বাস্তবতায়ও সেই জাতীয় পরিবর্তন সাধন করতে। সামাজিক অনুশাসনের জন্য তা পুরোপুরি সম্ভব না হওয়ায় সাহিত্যকে নির্গমণ পথ হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন অনেকে। কল্পরাজ্যের চাহিদা এবং বাস্তবের সংঘাত এবং টানাপোড়েনের প্রতিফলনও ঘটেছে গল্প-উপন্যাসে। প্রেমের চাহিদা মেটাতে অনেক সময়েই কাহিনির পটভূমি হয়েছে বিদেশ, পাহাড়ি গ্রাম বা পশ্চিমের নির্জন উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা বা পাশ্চাত্যায়িত উচ্চবিত্তের ড্রয়িংরুম বা টেনিসকোর্ট। নায়িকাদের মধ্যেও বিলাত ফিরত উচ্চবিত্ত নারী, অন্যান্য জনজাতির নারী, অভিনেত্রী বা সম্ভব হলে বিদেশিনীর দেখা পাওয়া যেতে শুরু করেছিল। এক কথায় মধ্যবিত্ত বাঙালি পারিবারিক পরিকাঠামোর বাইরে কাহিনির পটভূমি স্থাপন করতে হত প্রায়শই। সুতরাং বেশিরভাগ সময়েই নিজেদের স্বপ্ন-কল্পনা এবং চাহিদা অনুযায়ী নারীকে এবং নারী-

পুরুষের সম্পর্ককে বোঝার চেষ্টা করেছেন পুরুষ সাহিত্যিকরা। বুদ্ধদেব বসুর একটি উপন্যাসের নাম এই প্রসঙ্গে স্মরণে এল— *মনের মত মেয়ে*। তবে পরিবর্তিত নারীত্বের ধারণার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষত্বের ধারণাতেও অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তন এসেছিল। পুরুষরাও নিজেদের অবস্থান এবং দায়িত্বগুলিকে পুনর্বিবেচনা করেছিলেন বা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। যে পরিসরগুলি আগে একান্তভাবেই পুরুষকেন্দ্রিক বা পুরুষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল সেখানে নারীর অনুপ্রবেশের ফলে উভয় লিঙ্গের ক্ষেত্রেই বাধ্যতামূলক পরিবর্তন এসেছিল। নারীর ক্ষেত্রে যে পরিস্থিতি সুবিধাজনক ছিল এমনটা মনে করার কোনও কারণ নেই। বরং তাদের উপরে সৃষ্টি হয়েছিল বিবিধ চাপ। দীর্ঘদিনব্যাপী গৃহবন্দী জীবন কাটানোর ফলে তাদের সামনে পরিবর্তন নামক ধারণাটির অভিঘাত ছিল বেশি। মেয়েদের কাছে শিক্ষা ও তার মাধ্যমে আসা নবত্বের উদঘাটন ছিল বিলম্বিত এবং সীমিত। অধিকাংশ মেয়েদের কাছে সেইটুকুও পৌঁছায়নি। ফলত প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসা শর্ত এবং অনুশাসন ও তার প্রতিক্রিয়া ছিল মেয়েদের উপরে অনেক বেশি। নারীত্বের ঐতিহ্যগত ধারনাগুলির সঙ্গে তারা এতটাই একাত্ম হয়ে পড়েছিল (বলা উচিৎ তাদের থাকতে বাধ্য করা হয়েছিল) যে, সেগুলি কাটিয়ে ওঠার জন্য লড়াই করতে হয়েছিল নিজের সঙ্গে এবং বেঁচে থাকার প্রতিটি পদক্ষেপে। স্বল্প সংখ্যক মেয়ের মধ্যে পরিবর্তনের চেতনা কাজ করলেও তার চারপাশের পিতৃতান্ত্রিক অনুশাসন (পরিবারের ভিতরে অনেকক্ষেত্রেই যার ধারক-বাহক ছিল মেয়েরা) তাদের অবদমন করত। তাসত্ত্বেও মেয়েরা তাদের অধিকার এবং লিঙ্গ-অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হতে শুরু করেছিলেন, যার প্রমাণ তাদের অসংখ্য প্রবন্ধ-গল্প-কবিতা-উপন্যাস।

পরিশেষে নারীবাদ এবং সাহিত্যে নারীবাদী হস্তক্ষেপ সংক্রান্ত কিছু কথা বলা দরকার। কারণ আজকের সময় দাঁড়িয়েও নারীবাদ সম্পর্কে অবজ্ঞাসূচক এবং নিন্দাজনক

মন্তব্যের সম্মুখীন হতে হয়। নারীবাদ বহু মানুষকে অস্বস্তিতে ফেলে দেয় অংশত তার কারণ 'মহিলা কারা এবং তারা কি চায়' সেটা বুঝতে না চাওয়া। মহিলা কোনও সমসত্ত্ব বর্গ নয়, তাদের মধ্যেও সমাজের সমস্ত ধরণের বৈষম্য এবং পক্ষপাত আছে। পুরুষের সঙ্গে তার সম্পর্কের বিন্যাস বহুমুখী, বহুমাত্রিক— এই গোটা বিষয়টাই, বহির্জীবন ও ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে আমাদের যে বিভাজন, তাকে চ্যালেঞ্জ করে। প্রথমেই মনে রাখা দরকার নারীবাদের মধ্যেও বহু বিতর্ক আছে, তা কোনও সমসত্ত্ব একক নয়। নারীবাদীদের উদ্দেশ্য কোনও ভাবেই পুরুষকে আক্রমণ বা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয় লাভ করা নয়।

বিংশ শতকের 'প্রথম তরঙ্গ'-এর নারীবাদীরা নাগরিক ও রাজনৈতিক সাম্যের দাবি তুলেছিলেন। ১৯৭০-এর দশকে, 'দ্বিতীয় তরঙ্গ'-এর নারীবাদীরা মনোযোগ দিয়েছিলেন, এবং অত্যন্ত জোর দিয়েছিলেন, মেয়েদের যৌন ও পারিবারিক অধিকারের দিকে। বর্তমানে এই দাবিগুলি প্রতিক্রিয়ার মূল লক্ষ্যবস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯৭০-এর দশকে জনপ্রিয় 'যা ব্যক্তিগত তা-ই রাজনৈতিক' স্লোগানটি কিছু আধুনিক নারীবাদী উলটে দিতে চান। তাঁদের মতে রাজনৈতিক এখন *স্রেফ* ব্যক্তিগততে পরিণত হয়েছে যৌনতা ও পারিবারিক জীবন সংক্রান্ত প্রশ্নগুলিকে ঘিরে। কিন্তু মনে রাখা দরকার এই প্রশ্নগুলিরও অবশ্যই রাজনৈতিক মাত্রা রয়েছে এবং সেগুলিকে জরুরি ভিত্তিতে বিবেচনা করা প্রয়োজন। ব্যক্তিগত স্তরে পরিবর্তনের *বিপজ্জনক* সম্ভাবনা, স্বয়ং পরিবর্তনের মতোই, মানুষকে শঙ্কিত করে। তাই কেউ কেউ স্মৃতিকাতরভাবে আঁকড়ে ধরে থাকতে চান স্থায়ী লিঙ্গ-পরিচয়ের এক কাল্পনিক স্বর্ণযুগকে; পুরুষ ও নারীর মধ্যে এমন এক সম্পর্কের স্বপ্নকে, যেখানে যত অসাম্যই থাকুক না কেন তা সুখের। কিন্তু নারীবাদের মূল উদ্দেশ্য এমন এক জগতের কল্পনা যা শুধুমাত্র কিছু নারীর জন্য উন্নততর স্থান নয়, বরং সমস্ত

নারীর জন্যই। যাকে প্রসারিত অর্থে একটি সমাজতন্ত্রী নারীবাদী দর্শনও বলা যায়, যে জগৎ শিশু-বালক-বালিকা এবং পুরুষদের জন্যেও আরও বেশি সহনীয় হয়ে উঠতে পারে।

বিদ্যায়তনিক নারীবাদীরা লিঙ্গ-সচেতনতার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। বিপুল সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয়, বেশিরভাগ অবশ্যই পশ্চিমী দেশগুলিতে, মানবীবিদ্যাচর্চার উপর পাঠক্রম চালু করেছে এবং বিশেষভাবে নারীবাদের উপর। কেতাবি গবেষণাগুলি অন্য যুগের ও অন্যান্য সংস্কৃতির মেয়েদের জীবন সম্পর্কে চূড়ান্ত মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি সরবরাহ করেছে আমাদের; বিভেদ সম্পর্কে আমাদের ভাবতে বলেছে, একই সঙ্গে সাধারণ সমস্যাগুলি সম্পর্কেও। কেতাবি গবেষণামূলক নিবন্ধ, পাণ্ডিত্যপূর্ন প্রবন্ধ ও রচনাগুলির পাশাপাশি সম্মেলনগুলিও সারা পৃথিবীর নারীবাদ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ খবরাখবর প্রচার করার কাজে অত্যন্ত সাহায্য করেছে। কিন্ত তার একটি সমস্যার দিকও আছে এবং সেটা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যায়তনিক নারীবাদ এমন একটি ভাষার জন্ম দিয়েছে যা শুধুমাত্র দীক্ষিতদের বদ্ধ গোষ্ঠির কাছেই অর্থবহ হতে পারে। অসংখ্য মেয়ে এর সঙ্গে নিজেদের সম্পর্কহীন ও বিচ্ছিন্ন বলে মনে করছে। এটি মোটেই শুধুমাত্র নারীবাদের নিরিখে সত্য নয়, বিদ্যাচর্চাকারীদের ব্যবহৃত ভাষা সাধারণভাবে অর্থ আদানপ্রদান করতে ব্যর্থ। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা নিজেদের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষায় অত্যন্ত পারঙ্গম কিন্তু বাদবাকি দুনিয়ার বেশিরভাগের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার ব্যাপারে নয়। নারীবাদকে জীবন্ত ও অর্থবহ হয়ে উঠতে গেলে শুধুমাত্র নতুন নতুন সমস্যা নয়, খুঁজে বের করতে হবে নতুন ভাষাও। সাহিত্য সে ক্ষেত্রে হয়ে উঠতে পারে অন্তর্ঘাতের অন্যতম প্রকরণ।

গ্রন্থ তালিকা

বাংলা প্রাথমিক ও সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

আইয়ুব, আবু সয়ীদ। *আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ*। কলকাতা: ভারবি, এপ্রিল ১৯৫৩।

আতর্থী, প্রেমাঙ্কুর। *মহাস্থবির জাতক: প্রথম পর্ব*। কলকাতা: রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, বৈশাখ ১৩৫৬।

আতর্থী, প্রেমাঙ্কুর। *মহাস্থবির জাতক: দ্বিতীয় পর্ব*। কলকাতা: ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রা: লি:, ১৯৪৭।

ইসলাম, কাজি নজরুল। *ভাঙার গান*। কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিমিটেড, দ্বিতীয় মুদ্রণ, শ্রাবণ, ১৯৪৯।

___, *সঞ্চিতা*। কলকাতা: ডি. এম. লাইব্রেরী, মাঘ, ১৩৭৯।

ঈগলটন, টেরী। *মার্কসবাদ ও সাহিত্য* সমালোচনা। নিরঞ্জন গোস্বামী দ্বারা অনূদিত। কলকাতা: দীপায়ন, অক্টোবর, ২০০১।

কর, প্রদ্যোৎ। *বিস্মৃত লেখক*। কলকাতা: নব সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৮৯।

গুপ্ত, ক্ষেত্র। *আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*। কলকাতা: গ্রন্থ-নিলয়, প্রথম প্রকাশ আশ্বিন, ১৩৫৮।

গুপ্ত, জগদীশচন্দ্র। *জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী: প্রথম খণ্ড*, সম্পাদনা নিরঞ্জন চক্রবর্তী এবং সহ সম্পাদনা শুভেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা: গ্রন্থালয় প্রা: লি: এপ্রিল, ১৯৭৮।

___, *জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী: দ্বিতীয় খণ্ড*, সম্পাদনা নিরঞ্জন চক্রবর্তী। কলকাতা: গ্রন্থালয় প্রা: লি: শ্রাবণ, ১৩৬৫।

___, *জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড*। কলকাতা: বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির, ফেব্রুয়ারি, ২০১৫।

___, *জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড*। কলকাতা: বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির, প্রকাশ সাল নেই।

গুপ্ত, মেঘনাদ। *রাতের কলকাতা*। কলকাতা: ঊর্বী প্রকশন, জানুয়ারি ২০১৫।

গুহ, রণজিৎ। *কবির নাম ও সর্বনাম*। কলকাতা: তালপাতা, জানুয়ারি, ২০০৯।

___, *তিন আমির কথা*। কলকাতা: তালপাতা, জানুয়ারি, ২০১১।

___, *দয়া: রামমোহন রায় ও আমাদের আধুনিকতা*। কলকাতা: তালপাতা, জানুয়ারি, ২০১১।

___, *প্রেম না প্রতারণা*। কলকাতা: দেজ পাবলিশিং, জানুয়ারি, ২০১৩।

গোস্বামী, পরিমল। *সমগ্র স্মৃতিচিত্র*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, মে, ২০১২।

গোস্বামী, সুরেন্দ্রনাথ এবং হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। *প্রগতি*। কলকাতা: প্রগতি লেখক সঙ্ঘ, ১৩৪৪।

ঘটক, প্রাণতোষ। *কলকাতার পথ-ঘাট*। কলকাতা: ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রা: লি:, ৭ অঘ্রাণ, ১৩৬৩।

ঘটক, মণীশ। *রচনা সংকলন: প্রথম খণ্ড*, সম্পাদিত সোমা মুখোপাধ্যায়। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৪।

ঘোষ, অসিতকুমার এবং অজিতকুমার সংকলন ও সম্পাদিত বন্দ্যোপাধ্যায়। *বাংলা গল্প সংকলন, প্রথম খণ্ড*। নতুন দিল্লি: সাহিত্য আকাদেমি, ২০১৬।

ঘোষ, দেবীপ্রসাদ সম্পাদিত। *বাংলাভাষায় চলচ্চিত্র চর্চা ১৯২৩-৩৩*। কলকাতা: সিনে ক্লাব অফ ক্যালকাটা, সেপ্টেম্বর, ১৯৯০।

ঘোষ, পরিমল সম্পাদিত। *আমাদের আধুনিকতার কয়েকটি দিক*। কলকাতা: সেতু, ২০১২।

ঘোষ, বারিদবরণ। *ভারতীয় সাহিত্যকার পুস্তকমালা: গজেন্দ্রকুমার মিত্র*। নয়া দিল্লি: সাহিত্য আকাদেমি, ২০১৯।

ঘোষ, বিনয়। *বাংলার নবজাগৃতি*। কলকাতা: ওরিয়েন্ট লংম্যান, আষাঢ়, ১৩৯১।

____, *টাউন কলিকাতার কড়চা*। কলকাতা: বিহার সাহিত্য ভবন প্রা: লি:, অক্টোবর, ১৯৬১।

____, *নূতন সাহিত্য ও সমালোচনা*। কলকাতা: নূতন সাহিত্য ভবন, ডিসেম্বর, ১৯৪০।

____, *মেট্রোপোলিটান মন মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ*। কলকাতা: ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান প্রাঃ লিঃ, ২০০৯।

____, *সূতানুটি সমাচার*। কলকাতা: বাক-সাহিত্য, মার্চ, ১৯৬১।

ঘোষ, লোকনাথ। *কলকাতার বাবু বৃত্তান্ত*, অনুবাদ শুদ্ধোদন সেন। কলকাতা: অয়ন, ১৯৫৮।

ঘোষ, শঙ্খ। *শব্দ আর সত্য*। কলকাতা: প্যাপিরাস, জানুয়ারি, ২০১৯।

ঘোষ, শ্রী শান্তিসুধা। *নারী*। কলকাতা: সরস্বতী লাইব্রেরী, ১৩৪৭।

ঘোষ, সরোজ নাথ। *বিশ্ব-নারী-প্রগতি*। কলকাতা: গুরুচরণ পাবিলিশিং হাউজ, ভাদ্র, ১৩৪৫।

ঘোষ, সাগরময় সম্পাদিত। *দেশ: সুবর্ণজয়ন্তী গল্প সংকলন, ১৯৩৩-১৯৮৩*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৭।

____, সম্পাদিত। *দেশ: সুবর্ণজয়ন্তী প্রবন্ধ সংকলন; ১৯৩৩-৮৩*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, নভেম্বর, ২০০৪।

ঘোষ, সুদক্ষিণা। *ভারতীয় সাহিত্যকার পুস্তকমালা: জ্যোতির্ময়ী দেবী*। নয়া দিল্লি: সাহিত্য আকাদেমি, ২০১৬।

___, *ভারতীয় সাহিত্যকার পুস্তকমালা: স্বর্ণকুমারী দেবী*। নয়া দিল্লি: সাহিত্য আকাদেমি, ২০১৮।

___, *মেয়েদের উপন্যাসে মেয়েদের কথা 'কাহাকে' থেকে 'সুবর্ণলতা'*। কলকাতা: দেজ পাবলিশিং, জানুয়ারি, ২০০৮।

ঘোষজায়া, শৈলবালা। *শেখ আন্দু*। কলকাতা: চিরায়ত প্রকাশনি, ২০১৭।

ঘোষাল, জয়ন্তকুমার। *বাংলা উপন্যাসের সমাজ বাস্তবতা*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৯২।

চক্রবর্তী স্পিভাক, গায়ত্রী। *যুক্তি ও কল্পনাশক্তি*। কলকাতা: অনুষ্টুপ, জানুয়ারি, ২০২০।

চক্রবর্তী, অরিন্দম অতিথি সম্পাদনা। *সুবর্ণজয়ন্তী ভাবনা: বাঙালির ইউরোপ চর্চা*। কলকাতা: অনুষ্টুপ, এপ্রিল ২০১৬।

___, *এ-তনু ভরিয়া: দর্শন আপাদমস্তক*। কলকাতা: অনুষ্টুপ, জানুয়ারি, ২০২০।

___, *মননের মধু*। কলকাতা: গাঙচিল, ১৫ অগাস্ট, ২০০৮।

চক্রবর্তী, দীপেশ। *মনোরথের ঠিকানা*। কলকাতা: অনুষ্টুপ, ফেব্রুয়ারি, ২০১৮।

___, *সাম্প্রতিক ইতিহাস ভাবনা: আমার ইতিহাসের আলপথ ধরে*। কলকাতা: তালপাতা, জানুয়ারি, ২০১৬।

চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ। *আয়ুবের সঙ্গে*। কলকাতা: বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা: লি: কার্তিক, ১৩৬৭।

চক্রবর্তী, পূণ্যলতা। *একাল যখন শুরু হল,* সম্পাদনা জয়িতা বাগচী এবং সহ-সম্পাদনা অভিজিত সেন, অনিন্দিতা ভাদুড়ী। কলকাতা: দেজ পাবলিশিং এবং স্কুল অফ উইমেন্স স্টাডিজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, অগাস্ট, ২০১৮।

চক্রবর্তী, প্রশান্ত। *ভারতীয় সাহিত্যকার পুস্তকমালা: সৈয়দ মুজতবা আলী*। নয়া দিল্লি: সাহিত্য আকাদেমি, ২০১৮।

চক্রবর্তী, বিপ্লব। *ভারতীয় সাহিত্যকার পুস্তকমালা: বনফুল*। নয়া দিল্লি: সাহিত্য আকাদেমি, ২০১৬।

চট্টোপাধ্যায়, পার্থ। *ইতিহাসের উত্তরাধিকার*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, এপ্রিল, ২০০০।

চট্টোপাধ্যায়, বীরেন। *সাহিত্যতত্ত্ব: প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য*। কলকাতা: দেজ পাবলিশিং, অগাস্ট, ২০১৬।

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার। *জীবন কথা*। সংকলন ও সম্পাদনা অনিলকুমার কাঞ্জিলাল। কলকাতা: প্রকাশ ভবন, ২৬ নভেম্বর, ২০১৫।

চট্টোপাধ্যায়, হীরেন। *ভারতীয় সাহিত্য পুস্তকমালা: জগদীশ গুপ্ত*। নয়া দিল্লি: সাহিত্য অকাদেমি, ২০১৬।

চট্টোপাধ্যায়, হীরেন। *সাহিত্য-প্রকরণ*। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ১৪১৯।

চন্দ, শ্রীরানী। *গুরুদেব*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, শ্রাবণ, ১৩৯৪।

চাকী, জ্যোতিভূষণ সম্পাদিত। *প্রবোধচন্দ্র বাগচী প্রবন্ধ সংগ্রহ*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ফেব্রুয়ারি, ২০০১।

চাকী, লীনা সম্পাদিত। *বাঙালির আড্ডা*। কলকাতা: ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১৩৬৭।

চৌধুরী, উত্তম সম্পাদিত। *১৬টি সাক্ষাৎকার*। কলকাতা: বাণীশিল্প, জুন, ১৯৮৫।

চৌধুরী, ঋতু সেন সম্পাদিত। *নারীবাদের নানা পাঠ*। কলকাতা: আনন্দ, ২০২১।

চৌধুরী, নারায়ণ সম্পাদিত। *মানিক-সাহিত্য সমীক্ষা*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৪১।

চৌধুরী, নীরদ চন্দ্র। *নির্বাচিত প্রবন্ধ*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১১।

___, *আত্মঘাতী বাঙালী*। কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১৯৮৮।

___, *আমার দেশ আমার শতক*। কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১৯৯৬।

___, *বাঙালী জীবনে রমণীঃ আবির্ভাব*। কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, চৈত্র, ১৩৭৪।

প্রমথ চৌধুরী, *প্রবন্ধসংগ্রহ*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ২০১০।

চৌধুরী, ভূদেব। *ছোটগল্পের কথা*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, মে, ১৯৯৬।

___, *প্রবন্ধ সংগ্রহ*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, জানুয়ারি, ২০১৩।

___, *বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*। বোলপুর: বর্ণপরিচয় ও পুঁথিঘর, প্রকাশ সাল নেই।

___, *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা: চতুর্থ পর্যায় [রবীন্দ্রযুগ: দ্বিতীয় পর্ব]* । কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৪।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *পরিশেষ*। কলকাতা: বিশ্বভারতী, আশ্বিন, ১৩৫৪।

___, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, এক থেকে পঞ্চদশ খণ্ড। কলকাতা: বিশ্বভারতী, সুলভ সংস্করণ, পৌষ, ১৪০২।

ডাইসন, কেতকী কুশারী। *তিসিডোর*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১১।

ত্রিপাঠী, অমলেশ। *ইতালীর র‍্যনেশাঁস বাঙালির সংস্কৃতি*। কলকাতা: আনন্দ, ২০০২।

দত্ত, অজিত। *প্রবন্ধ সংগ্রহ*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, জানুয়ারি, ২০০০।

দত্ত, গুরুসদয়। *সরোজ-নলিনী: সংক্ষিপ্ত জীবনী*। সম্পাদনা গুরুসদয় দত্ত এবং সংযোজন, টীকা রাজীব কুন্ডু। কলকাতা: অবভাস, জুলাই ২০১৪।

দত্ত, ভূপেন্দ্র নাথ। *সাহিত্যে প্রগতি*। কলকাতা: পূরবী পাবলিশার্স, ১৯৪৫।

দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ। *কুলায় ও কালপুরুষ*। কলকাতা: সিগনেট প্রেস, আষাঢ়, ১৩৬৪।

___, *স্বগত*। কলকাতা: ভারতী ভবন, ১৩৪৫।

দাশ, অনির্বাণ সম্পাদিত। *বাংলায় নির্মাণ অবিনির্মাণ*। কলকাতা: অবভাস, জানুয়ারি, ২০০৮।

দাশ, জীবনানন্দ। *কবিতার কথা*। কলকাতা: নিউ স্ক্রিপ্ট, জানুয়ারি, ২০১৩।

___, *মাল্যবান*। কলকাতা: নিউ স্ক্রিপ্ট, জুন, ১৯৪৮।

___, *উপন্যাস সমগ্র*। ঢাকা: গতিধারা, ২০০০।

___, *জীবনানন্দ রচনাবলী: তৃতীয় খণ্ড, গল্প*, সম্পাদনা দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। ঢাকা: গতিধারা, জন্ম শতবর্ষ সংস্করণ।

___, *সমগ্র প্রবন্ধ*। সম্পাদনা ভূমেন্দ্র গুহ। কলকাতা: প্রতিক্ষণ, জানুয়ারি, ২০১৮।

___, *জীবনানন্দ দাশের কাব্যসংগ্রহ*, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। কলকাতা: ভারবি, ১৯৯৩।

দাশ, ধনঞ্জয়। *মার্ক্সবাদী সাহিত্য-বিতর্ক (অখন্ড)*। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী, ২০০৩।

দাশ, শিশিরকুমার। *ভারতসাহিত্যকথা*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৯৯৯।

দাশগুপ্ত, অশীন। *প্রবন্ধ সমগ্র*। সম্পাদনা উমা দাশগুপ্ত। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, জানুয়ারি, ২০০১।

দাশগুপ্ত, মানসী। *কম বয়সের আমি*। কলকাতা: রামায়ণী প্রকাশ ভবন, প্রথম সং. ১৩৬১।

দাশগুপ্ত, শশিভূষণ। *শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ: দর্শনে ও সাহিত্যে*। কলকাতা: এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রা: লি:, সপ্তর্ষি প্রকাশন, জানুয়ারি, ২০১৪।

দাস, সমরেন্দ্র সম্পাদিত। *কলকাতার আড্ডা*। কলকাতা: গাংচিল, প্রথম সংস্করণ ২০০২।

দাস, কৃষ্ণভাবিনী। *কৃষ্ণভাবিনী দাসের নির্বাচিত প্রবন্ধ*। সম্পাদনা অরুণা চট্টোপাধ্যায়এবং সহ সম্পাদনা অভিজিত সেন, অনিন্দিতা ভাদুড়ী। কলকাতা: দেজ পাবলিশিং এবং স্কুল অফ উইমেন্স স্টাডিজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, অগাস্ট, ২০০৪।

দাস, সজনীকান্ত। *বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস*। কলকাতা: মিত্রালয়, শ্রাবণ, ১৩৬৬।

____, *আত্মস্মৃতি*। কলকাতা: সুবর্ণরেখা, অগ্রহায়ণ, ১৩৬১।

দাস, সমরেন্দ্র সম্পাদিত। *কলকাতার আড্ডা*। কলকাতা: গাঙচিল, ২০০২।

দাসী, সরলাবালা। *চিত্রপট*। কলকাতা: রায় এম. সি. সরকার বাহাদুর এন্ড সন্স, সম্ভবত ১৩২৩, প্রকাশ সাল নেই।

দেবসেন, নবনীতা এবং অঞ্জলি দাশ সম্পাদিত। *সই*। কলকাতা: লালমাটি, ২০১৩।

____, এবং সুচিত্রা ভট্টাচার্য সম্পাদিত। *সই*। কলকাতা: পুষ্প, প্রকাশ সাল নেই।

____, *চন্দ্রমল্লিকা এবং প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ*। কলকাতা: দেজ পাবলিশিং, জানুয়ারি, ২০১৬।

____, *শব্দ পড়ে টাপুর টুপুর*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, মে, ২০১৫।

দেবী, ইন্দিরা। *আমার খাতা*, সম্পাদনা অভিজিৎ সেন এবং অনিন্দিতা ভাদুড়ী। কলকাতা: দে'জ এবং স্কুল অব উইমেনস স্টাডিজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯।

দেবী, কানন। *সবারে আমি নমি*, অনুলিখন সন্ধ্যা সেন। কলকাতা: এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা: লি:, ১৪১৯।

দেবী, প্রতিমা। *চিত্রলেখা*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, শ্রাবণ, ১৩৯৯।

দেবী, রাধারাণী। *রাধারাণী দেবীর রচনা-সংকলন-১*। সংকলন অভিজিত সেন। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, নভেম্বর, ১৯৯৯।

___, *রাধারাণী দেবীর রচনা-সংকলন-২*। সংকলন অভিজিত সেন, অভিজিত এবং অনিন্দিতা ভাদুড়ি। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, জানুয়ারি, ২০০০।

দেবী, শান্তা। *পূর্বস্মৃতি*। কলকাতা: থীমা, ২০১৪।

দেবী, শ্রীমতী অনুরূপা। *উত্তরায়ণ*। কলকাতা: ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং, ৭ আষাঢ়, ১৮৭৯।

দেবী, সীতা। *তিনটি উপন্যাস*, সম্পাদনা অনসূয়া গুহ। কলকাতা: দে'জ, ২০০৯।

দেবী, স্বর্ণকুমারী। *স্বর্ণকুমারী দেবীর রচনা-সংকলন*। সংকলন অভিজিত সেন এবং অনিন্দিতা ভাদুড়ী। কলকাতা: দীপ প্রকাশন, ১৯৬০।

ধর, অমিয় রতন। *ভারতীয় সাহিত্যকার পুস্তকমালা: গোপাল হালদার*। নয়া দিল্লি: সাহিত্য আকাদেমি, ২০১৭।

নন্দী, আশিস ও জয়ন্তী বসু। *ফুটপাথ পেরোলেই সমুদ্র: আশিসবাবু আপনি কি আত্মগত?*। কলকাতা: তালপাতা, জানুয়ারি, ২০১৬।

নন্দী, আশিস। *জাতিয়তাবাদ ও ভারতচিন্তা*, সম্পাদনা ও ভাষান্তর সজল বসু। কলকাতা: বুকপোস্ট পাবলিকেশন, ২০২০।

নাগ, অরুণ। *চিত্রিত পদ্মে*। কলকাতা: সুবর্ণরেখা, বৈশাখ, ১৪০৬।

পাল, ডঃ রবিন। *কল্লোলের কোলাহল ও অন্যান্য প্রবন্ধ*। কলকাতা: শ্রীভূমি পাবলিশিং, ডিসেম্বার ১৯৮০।

পাল, বিপিনচন্দ্র। *সত্তর বৎসর*। কলকাতা: পত্রলেখা, ২০১৩।

বনফুল। *প্রবন্ধ সংগ্রহ*। সংকলন ও সম্পাদনা প্রশান্তকুমার দাশগুপ্ত। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, জানুয়ারি, ২০০০।

___, *বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র: প্রথম খন্ড*। কলকাতা: বাণীশিল্প, জানুয়ারি, ২০০৩।

বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত। *আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত*। কলকাতা: মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ ১৩৬৭।

বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর। *আমার সাহিত্য জীবন*। কলকাতা: বেঙ্গল পাবলিশার্স, শ্রাবণ, ১৩৬০।

বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ। *বিভূতিভূষণের অপ্রকাশিত দিনলিপি (১৯৩৩, '৩৪ ও '৪১)*, সম্পাদনা সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়। কলকাতা: নাথ ব্রাদার্স, বৈশাখ, ১৩৬৭।

বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেশ্বর। *স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পত্র-পত্রিকা*। কলকাতা: প্রজ্ঞাভারতী, শ্রাবণ, ১৩৯৪।

বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক। *দিবারাত্রির কাব্য*। কলকাতা: লেখাপড়া, জৈষ্ঠ্য, ১৩৮৩।

___, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র: চতুর্থ খণ্ড*। কলকাতা: ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লি:, ১৮৮২ শকাব্দ।

___, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র: প্রথম খণ্ড*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রকাশ সাল নেই।

___, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র: দ্বিতীয় খণ্ড*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রকাশ সাল নেই।

___, *শ্রেষ্ঠ গল্প*, সম্পাদনা আবদুল মান্নান সৈয়দ। ঢাকা: অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ২০১৬।

___, *সমগ্র প্রবন্ধ এবং*। সম্পাদনা শুভময় মণ্ডল এবং সুকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা: দীপ প্রকাশিন, ১৯ মে, ২০১৫।

বন্দ্যোপাধ্যায়, ললিতকুমার। *প্রেমের কথা*। কলকাতা: এমারেল্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কস, জৈষ্ঠ্য, ১৩২৭।

বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবাজী। *প্রসঙ্গ: জীবনানন্দ*। কলকাতা: গাঙচিল, জানুয়ারি, ২০১১।

___, *গোপাল রাখাল দ্বন্দ্বসমাস: উপনিবেশবাদ ও বাংলা শিশুসাহিত্য*। কলকাতা: কারিগর, সেপ্টেম্বর, ২০১৩।

___, *বাংলা উপন্যাসে 'ওরা'*। কলকাতা: প্যাপিরাস, নববর্ষ ১৪০৯।

___, *ভারতে মহাভারতে*। কলকাতা: চার্বাক, জানুয়ারি ২০২২।

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার। *বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*। কলকাতা: মডার্ন বুক এজেন্সী প্রা: লি:, ১৩৬৭।

___, *সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে*। কলকাতা: মডার্ন বুক এজেন্সী প্রা: লি:, ১৩৬৭।

বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ। *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*। কলকাতা: সাহিত্যশ্রী, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৯৬১।

বসু বুদ্ধদেব, *এরা আর ওরা এবং আরো অনেকে*। কলকাতা: ডি. এম. লাইব্রেরী, পরিমার্জিত সংস্করণ ১৯৪৬।

___, *ধুসর গোধূলি*। কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড, ১৯৩৩।

___, *প্রবন্ধ সমগ্র: ১ খণ্ড*, সম্পাদিত শঙ্খ ঘোষ, অমিয় দেব, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়, দময়ন্তী বসু সিং, প্রভাতকুমার দাস। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০১৫।

___, *প্রবন্ধ সমগ্র: ২ খণ্ড*, সম্পাদিত শঙ্খ ঘোষ, অমিয় দেব, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়, দময়ন্তী বসু সিং, প্রভাতকুমার দাস। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০১৫।

___, *প্রবন্ধ সমগ্র: ৩* খণ্ড, সম্পাদিত শঙ্খ ঘোষ, অমিয় দেব, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়, দময়ন্তী বসু সিং, প্রভাতকুমার দাস। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০১০।

___, *প্রবন্ধ সমগ্র: ৪ খণ্ড*, সম্পাদিত শঙ্খ ঘোষ, অমিয় দেব, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়, দময়ন্তী বসু সিং, প্রভাতকুমার দাস। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০১৫।

___, *মন-দেয়া-নেয়া*। কলকাতা: এম. সি. সরকার এন্ড সন্স, প্রথম সংস্করণ ১৯৩২।

___, *যেদিন ফুটলো কমল*। কলকাতা: শ্যামসুন্দর মজুমদার দ্বারা প্রকাশিত, প্রথম সংস্করণ ১৯৩৩।

___, *রূপালি পাখি*। কলকাতা: ডি. এম. লাইব্রেরী, প্রথম সংস্করণ ১৯৩৪।

___, *লাল মেঘ*। কলকাতা: ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড, পরিমার্জিত নতুন সংস্করণ ১৯৫৩।

___, *সাড়া*। কলকাতা: গুপ্ত ফ্রেন্ডস এন্ড কোং, প্রথম সংস্করণ ১৯৩০।

___, *সূর্যমুখী*, কলকাতা: শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ১৯৩৪।

___, *উত্তরতিরিশ*। কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড, ১৯৪৫।

___, *প্রবন্ধ-সংকলন*, সম্পাদনা বুদ্ধদেব বসু। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৩৬৩।

___, *শ্রেষ্ঠ গল্প*। কলকাতা: বেঙ্গল পাবলিশার্স, জৈষ্ঠ্য, ১৩৫৯।

___, *গল্প সংকলন*। কলকাতা: কবিতা ভবন, প্রকাশ সাল নেই।

___, *অভিনয়, অভিনয় নয়*। কলকাতা: চতুরঙ্গ প্রকাশালয়, প্রথম সংস্করণ ১৯৩০।

___, *আমার বন্ধু*। কলকাতা: শ্যামসুন্দর মজুমদার দ্বারা প্রকাশিত, প্রথম সংস্করণ ১৯৩৩।

___, *কবিতা সংগ্রহ চতুর্থ খণ্ড*। সম্পাদনা নরেশ গুহ। কলকাতা: দেজ পাবলিশিং, জুন, ১৯৯৪।

___, *তিথিডোর*। কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স, ২০০৯।

___, *সাহিত্যচর্চা*। কলকাতা: দেজ পাবলিশিং, মে, ২০০৯।

___, *শ্রেষ্ঠ কবিতা,* সম্পাদনা নরেশ গুহ। কলকাতা: দে'জ পাবলশিং, ১৯৯৮।

বুদ্ধদেব বসু শতবর্ষসমিতি সংকলন। *স্বাগত সংলাপঃ বুদ্ধদেব বসুকে নিবেদিত*। কলকাতা: দেজ পাবলিশিং, নভেম্বর, ২০০৮।

বসু, অমিতরঞ্জন সংকলন, সম্পাদনা এবং অবতরণিকা। *গিরীন্দ্রশেখর বসু: অগ্রন্থিত বাংলা রচনা*। কলকাতা: অনুষ্টুপ, ২০১৭।

বসু, গিরীন্দ্রশেখর। *স্বপ্ন*। সম্পাদনা পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। কলকাতা: পত্রলেখা, ২০২০।

বসু, জহরলাল। *বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাস*। কলকাতা: আইডিয়াল প্রেস, আষাঢ়, ১৩৪৩।

বসু, জ্যোতিপ্রসাদ সম্পাদিত। *গল্প-লেখার গল্প, আকাশবাণী পর্যায় ২*। কলকাতা: বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৩৫।

বসু, প্রতিভা। *জীবনের জলছবি*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, শ্রাবণ, ১৪২৫।

বসু, প্রদীপ। *পারিবারিক প্রবন্ধ: বাঙালি পরিবারের সন্দর্ভ বিচার*। কলকাতা: গাঙচিল, মার্চ, ২০১২।

___, *বাংলা ভাষায় সমাজবিদ্যাচর্চা: নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব ভাবনার ইতিবৃত্ত*। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, জানুয়ারি, ২০২০।

___, *ভাষা দর্শন সঙ্গীত সমীক্ষা ও সন্ধান: প্রদীপ বসুর প্রবন্ধ সংকলন*। কলকাতা: অনুষ্টুপ, জানুয়ারি, ২০১৪।

___, *রাজনীতির তত্ত্ব তত্ত্বের রাজনীতি*। কলকাতা: চর্চাপদ, ২০১১।

বসু, শ্রীলা। *পরিচয় পত্রিকা ও কয়েকজন*। কলকাতা: প্যাপিরাস, ২০১১।

বসু, সরসীবালা। *সরসীবালা বসুর নির্বাচিত গল্প*। সংকলন সেন, অভিজিত এবং অনিন্দিতা ভাদুড়ী। কলকাতা: দেজ পাবলিশিং এবং স্কুল অফ উইমেন্স স্টাডিজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, জানুয়ারি, ২০০৪।

বিশী, প্রমথনাথ। *পুরানো সেই দিনের কথা*। কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ফাল্গুন ১৪১৮।

___, *বাঙালি ও বাংলা* সাহিত্য। কলকাতা: বেঙ্গল পাবলিশার্স, কার্তিক, ১৩৬৭।

বিশী, প্রমথনাথ। *ব্যক্তিত্ব ও স্রষ্টা*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১১ জুন ২০০১।

ভট্টাচার্য, কল্যাণকুমার সম্পাদিত। *কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য: প্রবন্ধ-সংকলন*। কলকাতা: দেজ পাবলিশিং, জুন, ২০১১।

ভট্টাচার্য, গৌতম। *'কল্লোলে' রবীন্দ্রনাথ*। কলকাতা: প্যাপিরাস, ১৩৯৪।

ভট্টাচার্য, জগদীশ সম্পাদিত। *বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প*। কলকাতা: বেঙ্গল পাবলিশার্স, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৯।

ভট্টাচার্য, প্রদ্যুম্ন সম্পাদিত। *তারাশঙ্কর: ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য*। নতুন দিল্লি: সাহিত্য আকাদেমি, ২০১৫।

___, *আখ্যান ও সমাজ: তারাশঙ্কর*। কলকাতা: অবভাস, জানুয়ারি, ২০১৪।

ভট্টাচার্য, সব্যসাচী। *বাংলায় সন্ধিক্ষণ: ইতিহাসের ধারা, ১৯২০-১৯৮৭*। নয়া দিল্লি, ভারত: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, প্রথম বাংলা সং. ২০১৮।

ভট্টাচার্য, সুভাষ। *সংসদ ইতিহাস অভিধান, প্রথম খণ্ড (ভারত ব্যতীত সমগ্র বিশ্বের ইতিহাস)*। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, নভেম্বর, ২০১৫।

ভট্টাচার্য, সৌরীন সম্পাদিত। *প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্প*। কলকাতা: দেজ পাবলিশিং, অগাস্ট, ২০০৪।

___, *আধুনিকতার সাধ-আহ্লাদ*। কলকাতা: তালপাতা, অক্টোবর, ২০০৭।

ভট্টাচার্য্য, শোভারাণী। *মহিলা-সম্পাদিত বাংলা সাময়িক সাহিত্য-পত্রিকা (প্রাক স্বাধীনতা পর্ব)*। নদীয়া: স্ব-প্রকাশ, জুলাই, ২০০০।

ভদ্র, গৌতম এবং পার্থ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। *নিম্নবর্গের ইতিহাস*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ডিসেম্বর, ২০০৪।

___, *জাল রাজার কথা: বর্ধমানের* প্রতাপচাঁদ। ইতিহাস গ্রন্থমালা ৮। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স। ২০১৬।

ভাদুড়ি, ঈশিতা। *ভারতীয় সাহিত্যকার পুস্তকমালা: যতীন্দ্রমোহন বাগচী*। নয়া দিল্লি: সাহিত্য আকাদেমি, ২০১৬।

ভাদুড়ী, সতীনাথ। *সতীনাথ বিচিত্রা*। কলকাতা: প্রকাশ ভবন, অঘ্রাণ, ১৪০৭।

মজুমদার, মোহিতলাল। *বিস্মরণী*। কলকাতা: জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড, ১৩৬১।

___, *বাংলার নবযুগ*। কলকাতা: বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রা: লি:, ১৩৫২।

___, *আধুনিক বাংলা সাহিত্য*। কলকাতা: জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স, ১৩৫৩।

মজুমদার, রমেশচন্দ্র। *জীবনের স্মৃতিদীপে*। কলকাতা: জেনেরাল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রা: লি:, ডিসেম্বর, ১৯৫৯।

মন্ডল, স্বস্তি। *ভারতীয় সাহিত্যকার পুস্তকমালা: সতীনাথ ভাদুড়ি*। নয়া দিল্লি: সাহিত্য আকাদেমি, ২০১৭।

মল্লিক, ঋত্বিক। *নজরুলের ধূমকেতু: সম্পাদকীয় বিষয়সূচি ও অন্যান্য*। কলকাতা: পত্রলেখা, ২০১৯।

মহান্তি, জিতেন্দ্র নাথ। *আত্ম এবং তার অপর: কয়েকটি দার্শনিক প্রবন্ধ*। নয়া দিল্লি: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১৮।

মিত্র, গজেন্দ্রকুমার এবং চন্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়, তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। *বিভূতি-রচনাবলী, প্রথম-দ্বাদশ খণ্ড*। কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ।

মিত্র, প্রেমেন্দ্র। *নির্বাচিতা*। এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স, ১৩৫৯।

___, *অসংলগ্ন*। কলকাতা: নিওলিট পাবলিশার্স (প্রাইভেট) লিঃ, প্রকাশ সাল নেই।

___, *পাঁক*। কলকাতা: নবপত্র প্রকাশন, ১৯২৪।

___, *প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প*। কলকাতা: নাভানা, ১৩৫৯।

___, *মিছিল*। কলকাতা: দেব সাহিত্য কুটীর, ১৩৫২।

মুকুল, এম আর আখতার। *কলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী*। ঢাকা: অনন্যা, ২০১৪।

মুখোপাধ্যায় ধূর্জ্জটিপ্রসাদ। *ধূর্জ্জটিপ্রসাদ রচনাবলী: তৃতীয় খণ্ড*। কলকাতা: দেজ পাবলিশিং, ২০১৭।

___, *ধূর্জ্জটিপ্রসাদ রচনাবলী: দ্বিতীয় খণ্ড*। কলকাতা: দেজ পাবলিশিং, কলকাতা ২০১০।

___, *ধূর্জ্জটিপ্রসাদ রচনাবলী: প্রথম খণ্ড*। কলকাতা: দেজ পাবলিশিং, ২০১১।

মুখোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ। *আমার ইউরোপ ভ্রমণ*, অনুবাদ পরিমল গোস্বামী। কলকাতা: চর্চাপদ, ২০০৯।

মুখোপাধ্যায়, মীনাক্ষী। *উপন্যাসে অতীত: ইতিহাস ও কল্পইতিহাস*। কলকাতা: থীমা, ২০০৩।

মুখোপাধ্যায়, রাধাকমল। *বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্য*। কলকাতা: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, ১৩৪১।

মুখোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ। *শ্রেষ্ঠ গল্প*। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী, মে, ২০০২।

___, *আজ শুভদিনে*। কলকাতা: উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, প্রকাশ সাল নেই।

___, *কয়ালাকুঠির দেশ*। কলকাতা: নিউ এজ, ২০১৪।

মুখোপাধ্যায়, হরিদাস। *ইতিহাস-চর্চায় বিনয় সরকার (ভারতীয় সংস্কৃতির নয়া ব্যাখ্যা)*। কলকাতা: বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ, ১৫ই অগাস্ট, ২০০১।

মুখোপাধ্যায়, হরিসাধন। *কলিকাতা সেকালের ও একালের*। কলকাতা: পি. এম. বাগচী, ১৯১৫।

মুখোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ। *তরী হতে তীর*। কলকাতা: মনীষা, ১৯৬৪।

মুরশিদ, গোলাম। *নারী ধর্ম ইত্যাদি*। ঢাকা: অন্যপ্রকাশ, ২০০৭।

___, *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*। ঢাকা: অবসর, ২০০৬।

মৈত্র, জ্ঞানেশ। *নারী জাগৃতি ও বাংলা সাহিত্য*। কলকাতা: ন্যাশনাল পাবলিশার্স, ১৯৮৭।

রায়, অন্নদাশঙ্কর, *আগুন নিয়ে খেলা*। কলকাতা: ডি. এম. লাইব্রেরী, পঞ্চম সং. ১৩৬৩।

___, *অন্নদাশঙ্কর রায়ের রচনাবলী, দ্বিতীয় খন্ড*। সম্পাদনা ধীমান দাশগুপ্ত। কলকাতা: বাণীশিল্প, অগাস্ট, ১৯৪৭।

___, *কলঙ্কবতী*। কলকাতা: ডি. এম. লাইব্রেরী, বৈশাখ, ১৩৬০।

___, *ক্রান্তদর্শী, প্রথম পর্ব*। কলকাতা: ডি. এম. লাইব্রেরী, পৌষ, ১৩৩৯।

___, *দেশকালপাত্র*। কলকাতা: ডি. এম. লাইব্রেরি, ১৩৫৫।

___, *প্রকৃতির পরিহাস*। কলকাতা: ডি. এম. লাইব্রেরী, ফাল্গুন, ১৩৫৩।

___, *প্রত্যয়*। কলকাতা: ডি. এম. লাইব্রেরী, ১৩৫৮।

___, *রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড*। কলকাতা: বাণীশিল্প, প্রথম প্রকাশ, প্রকাশ সাল নেই।

___, *রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী ও সবুজ পত্র*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, জানুয়ারি, ২০১৪।

___, *সিংহাবলোকন*। কলকাতা: সাহিত্যলোক, ভাদ্র, ১৩৭০।

রায়, অলোক এবং পবিত্র সরকার, অভ্র ঘোষ সম্পাদিত। *দুশ বছরের বাংলা সাহিত্য, দ্বিতীয় খণ্ড*। কলকাতা: সাহিত্য আকাদেমি, ২০০২।

রায়, আনন্দ সম্পাদিত। *বুদ্ধদেব বসু: নানা প্রসঙ্গ*। কলকাতা: বর্নালী, ১৯৬০।

রায়, গোপালচন্দ্র। *শরৎচন্দ্র: প্রথম খন্ড*। কলকাতা: সাহিত্য সদন, ১৯৬১।

___, *শরৎচন্দ্র: দ্বিতীয় খন্ড*। কলকাতা: সাহিত্য সদন, ১৯৬৬।

রায়, জীবেন্দ্র সিংহ। *কল্লোলের কাল*। কলকাতা: দেজ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৮।

রায়, নীহাররঞ্জন। *বাঙ্গালির ইতিহাস:* আদিপর্ব। কলকাতা: দেজ পাবলিশিং, বৈশাখ, ১৪২৪।

রায়, প্রফুল্লচন্দ্র। আত্মচরিত*: অখন্ড*। কলকাতা: ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১৯৩৭।

রায়, প্রফুল্লচন্দ্র। *বাঙালির মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার*। কলকাতা: পাতাবাহার, ২০১১।

রায়, রাধারমণ। *কলকাতা দর্পণ*। কলকাতা: সুবর্ণরেখা, ১৯৫২।

___, *কলকাতা বিচিত্রা*। কলকাতা: দেব সাহিত্য কুটির প্রা: লি:, ২০২২।

রায়, সত্যেন্দ্রনাথ। *বাংলা উপন্যাসের আধুনিকতা*। কলকাতা: গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, শ্রাবণ, ১৩৯৪।

রায়, সুশীল। *মনীষী-জীবনকথা*। কলকাতা: ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, অক্টোবর, ১৯৬৩।

রায়, হেমেন্দ্রকুমার। *এখন যাঁদের দেখছি*। কলকাতা: ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, প্রথম সং. ১৩৬২।

___, *সময়চিত্রকথা*। কলকাতা: তালপাতা, জানুয়ারি ২০১৪।

রায়চৌধুরি, তপন। *ইউরোপ পুনর্দর্শন*। অনুবাদ গীতশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, চতুর্থ মুদ্রণ জুলাই, ২০১৩।

___, *বাঙালনামা*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, এপ্রিল, ২০০৮।

___, *রোমন্থন অথবা ভীমরতিপ্রাপ্তর পরচরিতচর্চা*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ফেব্রুয়ারি, ২০১৩।

রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ। *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১৮।

___, *বাংলা কথাসাহিত্য প্রসঙ্গ*। কলকাতা: অন্নপূর্ণা পুস্তক মন্দির, প্রথম প্রকাশ ১৯৫৭।

শাকেরউল্লাহ, মোহাম্মদ সম্পাদনা। *রোকেয়া মানস ও সাহিত্য মূল্যায়ন*। কলকাতা: কমলিনী, দে'জ, ২০১৭।

শাস্ত্রী, শিবনাথ। *আত্মচরিত*। কলকাতা: সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গ্রন্থ প্রকাশন বিভাগ, ১৯১৮।

___, *গৃহ-ধর্ম্ম*। কলকাতা: ব্রাহ্মমিশন প্রেস, ১৩২৪।

শ্রীপান্থ। *শ্রীপান্থের কলকাতা*। কলকাতা: ত্রিবেণী প্রকাশন, ১৯৬১।

সরকার, বিনয়। *মগজ মেরামতের হাতিয়ার*। কলকাতা: পুরাতনী গ্রন্থমালা – ৩। কলকাতা: সেরিবান, ডিসেম্বর, ২০১১।

___, *বিনয় সরকারের বৈঠকে: প্রথম ভাগ*, হরিদাস মুখোপাধ্যায়, শিবচন্দ্র দত্ত, হেমেন্দ্রবিজয় সেন, ক্ষিতি মুখোপাধ্যায়, সুবোধকৃষ্ণ ঘোষাল এবং মন্মথনাথ সরকারের সঙ্গে কথোপকথন। কলকাতা: ছাতিম বুকস, ২০০০।

___, *বিনয় সরকারের বৈঠকে: দ্বিতীয় ভাগ*, হরিদাস মুখোপাধ্যায়, শিবচন্দ্র দত্ত, হেমেন্দ্রবিজয় সেন, ক্ষিতি মুখোপাধ্যায়, সুবোধকৃষ্ণ ঘোষাল এবং মন্মথনাথ সরকারের সঙ্গে কথোপকথন। কলকাতা: চক্রবর্ত্তী, চ্যাটার্জ্জী এণ্ড কোং লিমিটেড, ১৯৪৫।

সরকার, শিপ্রা এবং অনমিত্র দাশ সংকলিত। *বাঙালির সাম্যবাদ চর্চা*। কলকাতা: আনন্দ, ২০১৯।

সরকার, সুমিত। *আধুনিক ভারত: ১৮৮৫-১৯৪৭*। কলকাতা: কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ২০১৩।

___, *মডার্ন টাইমস: ভারত ১৮৮০-র দশক থেকে ১৯৫০-এর দশক*, ভাষান্তর আশীষ লাহিড়ী। কলকাতা: কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ২০১৯।

সরস্বতী, প্রভাবতী দেবী। *প্রেম ও পূজা*। কলকাতা: শ্রীকালী প্রকাশালয়, ১৩৪৫।

___, *আয়ুষ্মতী*। কলকাতা: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, চৈত্র, ১৩৩০।

___, *বাংলার বউ*। কলকাতা: তরুণ-সাহিত্য-মন্দীর, দ্বিতীয় সং. ১৩৪৪।

___, *চিরবাঞ্ছিতা*। কলকাতা: শরৎ সাহিত্য ভবন, প্রথম সং., প্রকাশ সাল নেই।

___, *ধূলার ধরণী*। কলকাতা: ফাইন আর্ট পাবলিশিং হাউস, দ্বিতীয় সং. প্রকাশ সাল নেই।

___, *হৃদয়ের চাঁদ*। কলকাতা: বরেন্দ্র লাইব্রেরী, ১৩৩৪।

___, *সান্ধ্যদীপ*। কলকাতা: প্রকাশক অনুল্লেখিত, ১৯৪৬।

সান্যাল, অরুণ সম্পাদিত। *প্রসঙ্গ: বাংলা উপন্যাস*। কলকাতা: ওয়েস্টবেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৯৬০।

সান্যাল, প্রবোধকুমার। *দুরাশার ডাক*। কলকাতা: পাবলিশিং সিন্ডিকেট, আশ্বিন, ১৩৪৯।

___, *বনস্পতির বৈঠক (অখন্ড)*। কলকাতা: সাহিত্য সংস্থা, ১৯৬০।

___, *আমিরী*। কলকাতা: স্ট্যান্ডার্ড পাবলিশার্স, প্রকাশ সাল নেই।

___, *কল্পান্ত*। কলকাতা: বেঙ্গল পাবলিশার্স, চৈত্র ১৩৫২।

___, *দুই আর দু'য়ে চার*। কলকাতা: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স।

___, *নদ ও* নদী। সোদপুর: গুপ্তপ্রকাশিকা, চতুর্থ সংস্করণ।

___, *প্রবোধকুমার সান্যালের রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড*।কলকাতা: গ্রন্থপ্রকাশ, আষাঢ়, ১৩৮১।

___, *প্রবোধকুমার সান্যালের রচনাবলী, প্রথম খণ্ড*। কলকাতা: গ্রন্থপ্রকাশ, ফাল্গুন, ১৩৮০।

___, *প্রিয় বান্ধবী*। কলকাতা: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স, দ্বাদশ মুদ্রণ।

___, *ঘুমভাঙার রাত*। কলকাতা: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স, তৃতীয় সংস্করণ।

সান্যাল, হিরণকুমার। *ছড়িয়ে ছিটিয়ে*। কলকাতা: প্যাপিরাস, ১৯৯১।

সিংহ, আশালতা। *বিয়ের পরে*। কলকাতা: কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির, প্রথম সং. ১৩৪২।

___, *সমী ও দীপ্তি*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং ও মানবী বিদ্যাচর্চা কেন্দ্র, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৩।

___, *সহরের মোহ*। কলকাতা: ফাইন আর্ট পাবলিশিং হাউস, ১৩৪৪।

সিকদার, অশ্রুকুমার এবং কবিতা সিংহ সংকলন ও সম্পাদিত। *বাংলা গল্প সংকলন, দ্বিতীয় খণ্ড*। নতুন দিল্লি: সাহিত্য আকাদেমি, ২০১৫।

সেন, রুশতী। *ভারতীয় সাহিত্যকার পুস্তকমালা: ধুর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়*। নয়া দিল্লি: সাহিত্য আকাদেমি, ২০১৫।

সেন, সুকুমার। *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস: পঞ্চম খণ্ড ১৮৯১-১৯৪১*। কলকাতা: আনন্দ, ২০১০।

সেনগুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার। *কল্লোল যুগ*। কলকাতা: এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা: লি:, আশ্বিন, ১৪২১।

___, *রচনাবলী প্রথম খণ্ড*। কলকাতা: গ্রন্থালয়, ১৩৫৯।

___, *রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড*। কলকাতা: গ্রন্থালয়, ১৩৫৯।

____, *অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী, চতুর্থ খন্ড*। কলকাতা: গ্রন্থালয়, ১৩৬১।

____, *অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী, তৃতীয় খন্ড*। কলকাতা: গ্রন্থালয়, ১৩৬০।

____, *অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী, পঞ্চম খন্ড*। কলকাতা: গ্রন্থালয়, ১৩৬১।

____, *অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী, ষষ্ঠ খন্ড*। কলকাতা: গ্রন্থালয়, ১৩৬১।

____, *একশ এক গল্প*। কলকাতা: বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা: লি: আষাঢ়, ১৩৭২।

____, প্রজাপতয়ে। কলকাতা: প্রকাশনা অপ্রাপ্ত, ১৩৪০।

____, *প্রেমের গল্প*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ভাদ্র, ১৩৬৬।

____, *গ্রন্থাবলী ১ম খণ্ড*। কলকাতা: আনন্দধারা প্রকাশন, ১৩৩৫।

সেনগুপ্ত, নরেশচন্দ্র। *প্রবন্ধ সংগ্রহ*, সংকলন ও সম্পাদনা অলোক রায়। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০২।

____, *শুভা*। কলকাতা: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রকাশ সাল নেই।

____, *দ্বিতীয় পক্ষ*। কলকাতা: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ফাল্গুন, ১৩৩১।

____, *গ্রামের* কথা। কলকাতা: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, জৈষ্ঠ্য, ১৩৩১।

সেনগুপ্ত, সুবোধচন্দ্র এবং অঞ্জলি বসু সম্পাদিত। *সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান*। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, মে, ১৯৬০।

সেহানবীশ, চিন্মোহন। *৪৬নং একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রসঙ্গে*। কলকাতা: সেরিবান, ২০০৮।

হালদার, গোপাল। *একদা*। কলকাতা: বেঙ্গল পাবলিশার্স, আষাঢ়, ১৩৫৬।

____, *গোপাল হালদার রচনাসমগ্র, প্রথম খণ্ড*। কলকাতা: এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রা: লি: জানুয়ারি, ১৯৪৯।

____, *বাজে লেখা*। কলকাতা: পুথিঘর, অক্টোবর ১৯৪৩।

___, *রূপনারানের কুলে: দ্বিতীয় খণ্ড*। কলকাতা: প্রকাশ ভবন, নভেম্বর, ২০১৭।

___, *রূপনারানের কুলে: প্রথম খণ্ড*। কলকাতা: প্রকাশ ভবন, অগাস্ট। ২০১৭।

বাংলা পত্র-পত্রিকা এবং পুস্তিকা

কর, বোধিসত্ত্ব। "ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস লিখতে যাওয়ার আগে"। *অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা ২০১৬*। কলকাতা: শুচি, ৩ মে, ২০১৬।

ঘোষ, অগ্নিভ। "ফ্রয়েড বনাম মার্কস অথবা প্রগতির দুই পিঠ।" *বাংলা জর্নাল: বাংলা ও বাঙালি বিষয়ক জর্নাল*, ডিসেম্বর। ২০১৪, ১২শ বর্ষ, ২০শ সংখ্যা। ১৯-৩৭।

___, "অবচেতনার অবদান: রবীন্দ্রনাথ ও বিশ শতকের সাহিত্যাসরে মনঃসমীক্ষণ।" *যাদবপুর জার্নাল অফ কমপ্যারেটিভ লিটারেচার, ৫০। ২০১৩-২০১৪।*

ঘোষ, শঙ্খ। "অন্ধের স্পর্শের মতো"। *প্রণবেশ সেন স্মারক বক্তৃতা ২০০৭।* কলকাতা: গাঙচিল, মে ২০০৭।

ঘোষ, সাগরময় সম্পাদিত। *দেশ: ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় শতবর্ষ*। ৬২ বর্ষ, ১৬ সংখ্যা, জুন, ১৯৯৫।

চক্রবর্তী, দীপেশ। "মানবিকতা ও অ-মানবিকতা"। *সমর সেন স্মারক বক্তৃতা ২০১৫*। কলকাতা: অনুষ্টুপ, জানুয়ারি ২০১৮।

চৌধুরী, সুকান্ত। "ইতিহাসের পাঠ ও ইতিহাসপাঠ"। *সুশোভন সরকার স্মারক বক্তৃতা ২০০৫*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, অগাস্ট ২০০৫।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। "সাহিত্য ধর্ম", *বিচিত্রা*। কলকাতা: পাবলিশিং কোং লিঃ, শ্রাবণ, ১৩৩৫।

দত্ত, জ্যোতির্ময় সম্পাদিত। *কলকাতা,* বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা, সপ্তম ও অষ্টম যুগ্ম সংকলন, ডিসেম্বর ১৯৬৮, জানুয়ারি ১৯৬৯ এবং দশম ও একাদশ সংকলন, ১৯৭৪। কলকাতা: প্রতিভাস, ২০০২।

দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ সম্পাদিত। *পরিচয় পত্রিকা*। দ্বিতীয় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৩৯।

___, *পরিচয় পত্রিকা*। ষষ্ঠ বর্ষ, প্রথম খণ্ড, শ্রাবণ- পৌষ, ১৩৪৩।

___, *পরিচয় পত্রিকা*। ১ম সংখ্যা, মাঘ, ১৩৪৫।

___, *পরিচয় পত্রিকা*। নবম বর্ষ, প্রথম খণ্ড, শ্রাবণ, ১৩৪৬- পৌষ, ১৩৪৬।

দাশ, দীনেশরঞ্জন সম্পাদিত। *কল্লোল: মাসিক সাহিত্য*। ২য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ১৩৩১।

দেবী, সুধা সম্পাদিত। *কিশোরী: কিশোরীদের সচিত্র বার্ষিকী*। কলকাতা: দি ষ্টুডেন্টস এম্পোরিয়াম, আশ্বিন, ১৩৩৮।

নন্দী, আশিস। "স্মার্ত সংস্কৃতি।" *প্রণবেশ সেন স্মারক বক্তৃতা,* ২০১৪। কলকাতা: পরম্পরা, ২০১৫।

বন্দ্যোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি সম্পাদিত। *সাহিত্য: মাসিক পত্র ও সমালোচনা*। ৩৩ ভাগ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৩০।

বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক ও স্বপন মজুমদার, গৌতম ঘোষ, সুমন মুখোপাধ্যায়। "ব্যক্তি সময় সংস্কৃতি"। *কল্যাণ মিত্র স্মারক ভাষণমালা ১৪*। কলকাতা: থীমা, ২০১৫।

বাগচী, যশোধরা। "পশ্চিমের সংহতি, প্রাচ্যের প্রগতি: বাঙালি নারীর আধুনিকতা"। *সুশোভনচন্দ্র সরকার স্মারক বক্তৃতা ২০০১*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ২০০১।

বসু, বুদ্ধদেব। "রজনী হল উতলা"। *কল্লোল*। চতুর্থ বর্ষ, জৈষ্ঠ্য, ১৩৩৩।

ভট্টাচার্য, মালিনী। "পরাধীনের রোমান্টিকতা ও যুগসন্ধির রবীন্দ্রনাথ"। *সুশোভনচন্দ্র সরকার স্মারক বক্তৃতা ২০০২*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ১৯ অগাস্ট ২০০২।

ভদ্র, গৌতম। "বাঙালির বই পড়া"। *পঞ্চম বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য স্মারক বক্তৃতা*। কলকাতা: বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মেমোরিয়াল ট্রাস্ট, এপ্রিল, ২০০৪।

ভট্টাচার্য, বিশ্ববন্ধু সম্পাদিত। *পরিচয়: সমালোচনা সংখ্যা*। ১০-১২ সংখ্যা, ৭৯ বর্ষ, মে-জুলাই, ২০১০।

মজুমদার, যামিনীরঞ্জন সম্পাদিত। *কৃষক: মাসিক পত্রিকা*। ২৮ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৩৪।

মুখোপাধ্যায়, সৌম্যেন্দ্রনাথ। "কলকাতা: কল্পনাতে ও বাস্তবে"। *অশীন দাশগুপ্ত স্মারক বক্তৃতা ২০১৪*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ২২ জানুয়ারি ২০১৫।

রায়, অন্নদাশঙ্কর এবং অন্যান্য সম্পাদিত। *আকাদেমি পত্রিকা*। একাদশ সংখ্যা, জুন ১৯৯৯।

___, দশম সংখ্যা, নভেম্বর, ১৯৯৭।

___, ত্রয়োদশ সংখ্যা, জুন, ২০০১।

রায়, অলোক। "বাংলার নবজাগরণ ও সুশোভনচন্দ্র সরকার"। *সুশোভনচন্দ্র সরকার স্মারক বক্তৃতা ২০১৩*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, অক্টোবার ২০১৩।

রায়চৌধুরী, তপন। "অন্নদাশঙ্কর ও আমাদের ধর্মনিরপেক্ষতার ঐতিহ্য"। কলকাতা: *পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি*, মার্চ, ২০০৯।

শূর, চিরঞ্জীব সম্পাদিত। *আলোচনা চক্র*। সংকলন ২৪, অগাস্ট ২০০৬ ও জানুয়ারী ২০০৭ যুগ্ম সংখ্যা।

সরকার, পবিত্র। "ইতিহাস ও সাহিত্য"। *অশীন দাশগুপ্ত দশম স্মারক বক্তৃতা ২০০৮*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ২০০৮।

সরকার, সুমিত। "জাতীয়তাবাদ ছাড়িয়ে: স্বদেশী যুগোত্তর বাংলার কয়েকটি দিক"। *অধ্যাপক অশীন দাশগুপ্ত স্মারক বক্তৃতা*, ৩। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ২০০১।

সেনগুপ্ত, নরেশচন্দ্র । "সাহিত্যধর্মে সীমানা"। কলকাতা: *বিচিত্রা,* ভাদ্র, ১৩৩৫।

ইংরাজি গ্রন্থ তালিকা
ব্যবহৃত এবং সহায়ক গ্রন্থাবলী

Achuthan, Asha, Ranjita Biswas, Anup Kumar Dhar. *Lesbian Standpoint.* Kolkata: Sanhati, 2007.

Amin, Shahid and Dipesh Chakrabarty edited. *Subaltern Studies IX: Writings on South Asian History and Society*. New Delhi: Oxford University Press, 2008.

Baldick, Chris. *Oxford Dictionary of Literary Terms.* New York: Oxford University Press, 2008.

Bandopadhyay, Sekhar edited. *Nationalist Movement in India: A Reader.* New Delhi: Oxford University Press, 2009.

___. *From Plassey to Partition and After: A History of Modern India.* New Delhi: Orient Blackswan Pvt. Ltd. 2015.

Benjamin, Walter. *Illuminations*, edited by Hannah Arendt, translated by Harry Zohn. New York: Schocken Books, 1969.

Berman, Marshall. *All That Is Solid Melts into Air: The Experience of Modernity*. Canada: Penguin Books, 1988.

Bhattacharya, Malini and Abhijit Sen edited. *Talking of Power: Early Writings of Bengali Women from the Mid-Nineteenth Century to the Beginning of the Twentieth Century*. Kolkata: Stree, 2003.

Bloch Ernst, Georg Lukacs, Bertolt Brecht, Walter Benjamin and Theodor Adorno. *Aesthetics and Politics*, edited and translated by Ronald Taylor. London: Verso, 1980.

Bocock, Robert. *Sigmund Freud: Revised Edition.* London: Routledge, 2007.

Bose, Brinda and Suvabrata Bhattacharyya edited *The Phobic and the Erotic: The Politics of Sexuality in Contemporary India.* Kolkata: Seagull Book, 2007.

Bose, Sugata and Ayesha Jalal edited. *Nationalism, Democracy and Development: State and Politics in India.* New Delhi: Oxford University Press, 1997.

Brousse, Marie-Helene. *The Feminine: A mode of Jouissance*, translated by Janet Rachel. New York: Lacanian Press, 2021.

Brown, Judith M. *Windows into the Past: Life and Historians of the South Asia*. Indiana: University of Notre Dame Press, 2009.

Butler, Judith. *Excitable Speech: A Politics of the Performative.* London: Routledge, 1997.

Chakrabarty, Dipesh. *Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference*. New Jersey: Princeton University Press, 2000.

Chatterjee, Partha & Pradip Jaganathan edited *Subaltern Studies xi: Community Gender and Violence.* New Delhi: Permanent Black, 2007.

___. *Nationalist Thought and the Colonial World: A Derivative Discourse.* London: Zed Books, 1993.

___. *The Black Hole of Empire: History of a Global Practice of Power.* Ranikhet: Permanent Black, 2013.

___. *The Partha Chatterjee Omnibus.* New Delhi: Oxford University Press, 2008.

___. "The Nationalist Resolution of the Women's Question", in S. Sangari & S. Veid edited *Recasting Women*. New Delhi, India: Kali for Women, 1989.

Chattopadhyay, Swati. *Representing Calcutta: Modernity, Nationalism and the Colonial Uncanny.* London and New York: Routledge, 2006.

Cobley, Paul. The New Critical Idiom: Narrative. London: Routledge, 2001.

Das Sisir Kumar. *A History of Indian Literature: 1800-1910, Western Impact: Indian Response*. New Delhi: Sahitya Akademi, 2005.

Davidson, Arnold I. *The emergence of Sexuality: Historical Epistemology and the Formation of Concepts*. Cambridge, Massachusetts, London, England: Harvard University Press, 2004.

Derrida, Jacques. *Writing and Difference*, translated by Alan Bass. London: Routledge, 2005.

___. *Acts of Literature*, edited by Derek Attridge. New York: Routledge, 1992.

___. *Dissemination*, translated by Barbara Johnson. London: The Athlone Press, 1981.

___. *Of Grammatology*, translated by Gayatri Chakravorty Spivak New Delhi: Motilal Banarsidass, 1994.

Eagleton, Terri. *Marxism and Literary Criticism*. New Delhi: Routledge, 2002.

Felski, Rita. *The Gender of Modernity*. Cambridge, Massachusetts, London and England: Harvard University Press, 1995.

___. *Beyond Feminist Aesthetics.* Cambridge: Harvard University Press, 1989.

Forbes, Geraldine. *The New Cambridge History of India IV.2: Women in Modern India.* Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

Foucault, M. *History of Sexuality: The Will to Knowledge, Vol. 1*, translated by Robert Hurley. Australia: Penguin Books, 2008.

___. *Power/ Knowledge: Selected Interv iews and Other Writings 1972-1977*, edited by Colin Gordon and translated by Gordon Colin, Leo Marshall, John Melham and Kate Soper. New York: Pantheon Books, 1980.

Freud, Sigmund. *The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Freud, Sigmund, Vol. XXII (1932-1936): New Introductory Lectures on Psycho-Ananlysis*, translated and edited by James Strachy et. al. London: Vintage, 2001.

___. *Totem and Taboo*, translated by A. A. Brill. Harmondsworth, Middlesex, England: Pelican Books, 1938.

___. *Civilization and Its Discontents*, translated by David Melintock. New Delhi: Penguin Books India, 2002.

___. *The Uncanny*, translated by David Melintock. New Delhi: Penguin Books India, 2003.

Frow, John. *Marxism and Literary History*. Cambridge: Harvard University Press, 1986.

Gayatri Chakrabarty Spivak. edited *Can the Subaltern Speak? Reflection on the History of an Idea*, edited by Rosalind C. Morris. New York: Columbia University Press. 2010.

Ghatak, Ritwik Kumar. *On The Cultural Front*. Kolkata: Natyachinta Foundation, 2003.

Gilbert M. Sandra & Susan Gubar. *The Madwoman in The Attic: The Womam Writer and the 19th c. Literary Imagination*. Delhi: World View Publication, 2007.

Glover, David and Cora Kaplan. *The New Critical Idiom: Ideology*. Routledge, 2007.

Gramsci, Antonio. *Selections From the Prison Notebooks*, edited and translated by Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith. New Delhi: Orient Blackswan Pvt. Ltd. 2009.

Guha, Ranajit edited. *Subaltern Studies VI: Writings on South Asian History and Society.* New Delhi: Oxford University Press, 2008.

___. *Subaltern Studies V: Writings on South Asian History and Society.* New Delhi: Oxford University Press, 2008.

Gulati, Leela and Jasodhara Bagchi edited. *A Space of Her Own: Personal Narratives of Twelve Women.* New Delhi: Sage Publications, 2005.

Gupta, Charu. *Sexuality, Obscenity, Community: Women, Muslims and the Hindu Public in Colonial India.* New Delhi: Permanent Black. 2005

Hegel, George W. F. *The Phenomenology of Spirit*, translated and edited by Terry Pinkard. Cambridge, New York, Melbourne, New Delhi: 2018.

Hubermas, Jurgen. *The Philosophical Discourse of Modernity*, translated Frederick Laerence. Massachusetts: The MIT Press Cambridge, 1993.

Hutcheon, Linda. *The Politics of Postmodernism*. New Delhi: Routledge, 2005.

Irigaray, Luce. *This Sex Which Is Not One*, translated by Catherine Porter and Carolyn Bruke. New York: Cornell University Press, 1995.

Jameson, Frederick. *The Jameson Reader*, edited by Hardt, Michael and Kathi Weeks. Oxford: Blackwell Publisher, 2000.

Jung, Carl Gustav. *Aspects of the Masculine*, edited by John Beebe and translated by R. F. C. Hull. Oxon, New York: Routledge, 2003.

Kundera, Milan. *Life is Elsewhere*. Trans. By Peter Kussi. London: Faber and Faber, 1987.

Lacan, Jacques and Ecole Freudienne. *Feminine Sexuality*, edited by Jacqueline Rose and Juliet Mitchell. London: Palgrave Macmillan UK, 1982.

Landry, Donna and Gerald MacLean., ed. *The Spivak Reader: Selected Works of Gayatri Chakrabarty Spivak*. New York: Routledge, 1996.

Lukacs, Georg. *The Theory of the Novel*, translated by Anna Bostock. Cambridge and Massachusetts, 1977.

Majumder, Rochona. *Marriage and Modernity: Family values in Colonial Bengal*. Durham and London: Duke University Press, 2009.

Malpas, John J. Jonghinand Simon edited. *The New Aestheticism.* Manchester: Manchester University Press, 2003.

Marx, Karl. *The Communist Manifesto*, introduced and notes by Gareth Stedman Jones. London: Penguin Books, 2002.

Menon, Nivedita. *Sexualities*. New Delhi: Women Unlimited an Associate of kali for Women, 2007.

Mitra Ashok edited. *The Truth Unites: Essays in Tribute to Samar Sen.* Kolkata: Subarnarekha, 1985.

Mukherjee, Meenakshi. *Realism and Reality: The Novel and The Society in India*. Delhi: OUP, 1994.

Mukherjee. S. N. *Calcutta: Myths and History*. Calcutta: Subarnarekha, 1977.

Munsi, Sunil K. *Calcutta Metropolitan Explosion: Its Nature and Roots*. New Delhi: People's Publishing House, 1975.

Murshid Ghulam, *Reluctant Debutante: Response of Bengali Women to Modernisation,1849-1905*, Rajshahi: Sahitya Samsad, Rajshahi University,Bangladesh, 1989.

Nair, Janaki and Mary E. John. *A Question of silence: The Sexual Economy of Modern India*. New Delhi: Kali for Women, 1998.

Nandy, Ashis. *The Bonfire of Creeds: The Essential Ashis Nandy.* New Delhi: Oxford University Press, 2012

___. *Exiled At Home.* New Delhi: Oxford University Press, 2008

Nietzsche, Friedrich. *Beyond Good and Evil: Prelude to a Philosophy of the Future*, translated by R.J. Hollingdale. New Delhi: Penguin Books India, 2003.

Rajan, Rajeswari Sunder. *The Scandal of the State: Women, Law, and Citizenship in Postcolonial India*. New Delhi: Permanent Black, 2008.

Ray, Rajat Kanta. *Exploring Emotional History: Gender, Mentality and Literature in the Indian Awakening.* New Delhi: Oxford University Press, 2003.

Roychoudhuri, Tapan. *Perceptions, Emotions, Sensibilities: Essays on India's Colonial and Post-Colonial Experiences.* New Delhi: Oxford University Press, 1997.

Sarkar, Sumit. *Modern Times: India 1880s-1950s*. New Delhi, Patna, Mumbai, Kolkata etc.: Permanent Black, 2015.

___. *Writing Social History.* New Delhi: Oxford University Press, 2008.

Sarkar, Tanika. *Words To Win: The making of Amar Jibon: A modern Autobiography*. New Delhi: kali for Women, 1999. ___. *Hindu Wife, Hindu Nation: community, religion, and Cultural Nationalism*. New Delhi: Permanent Black, 2001.

Shiva, Vandana. *Staying Alive: Women, Ecology and Development*. London: Zed Books, Eighth impression 2002.

Selden, Ramen and Peter Widdowson, Peter Brooker. *A Reader's Guide to Contemporary Literary Theory.* Noida: Pearson, 2005.

Sengupta, S. C. *Portraits and Memories.* Kolkata: Thema, 2003.

Sinha, Mallarika Roy. *Gender and Radical Politics in India: Magic Moments of Naxalbari (1967-1975).* New York: Rouledge, 2011.

Spivak, Gayatri Chakravorty. *Nationalism and the Imagination.* Calcutta. Seagull Books, 2010.

___. *Out Side the Teaching Machine*. New York: Routledge, 1993.

Stromberg, Roland N edited. *Realism, Naturalism and Symbolism: Modes of Thought and Expression in Europe, 1848-1914.* London: Palgrave McMillan, 1968.

Thapan, Meenakshi. *Embodiment: Essays on Gender and Identity*. New Delhi: OUP, 1997.

Vishwakarma, Sanjeeb K, edited by. *Feminism and Literature: Text and Context.* Allahabad: Takhtotaaz Prakashan, 2015.

Viswanathan, Gauri. *Masks of Conquest: Literary Study and British Rule in India*. New York: Columbia University Press, 1989.

Visweswaran, Kamal. *Fictions of Feminist Ethnography.* London: University of Minnesota Press, 2003.

Williams, Raymond. *Marxism and Literature*. New Delhi: OUP, 2010.

___. *The Politics of Modernism*, edited and introduced by Tony Pinkney. New York: Verso, 1994.

পত্রিকা তালিকা

Adorno. Theodor W. "Kierkegaard: Construction of the Aesthetic*"*. *Theory and History of Literature, Vol. 61*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1999.

Angol, Padma. "Agency, Periodisation and Change in the gender and Women's History of Colonial India." *Gender & History*, 20, no. 3, November 2008.

Bagchi, Jasodhara. "Representing Nationalism: Ideology of Motherhood I Colonial Bengal." *Economic and Political Weekly*. October 20-27, 1990.

___. “Positivism and Nationalism: Womanhood and Crisis in Nationalist Fiction Bankimchandra’s Anandamath.” *Economic and Political Weekly*. XX, no. 43, October 26, 1985.

Banerjee, Nirmala, Samita Sen and Nibedita Dhawan, edited by. “Mapping the field: Gender relation in Contemporary India.” *Reading in Gender Studies 1*, volume 1. Kolkata, School of Women’s Studies, Jadavpur University: Stree, 2011.

Bhattacharya, Malini. “A Quest for Cultural Identity.” *Economic and Political Weekly*. 25, no. 18/19, May 5-12, 1990.

Bose, Neilesh. “Muslim Modernism and Trans-Regional Consciousness in Bengal, 1911-1925: The Wide World of *Samyabad*.” *South Asia Research*, 31(3), doi: 10.1177/026272801103100303.

Castind, A. “A Embodying Utopia In 1935: Poetry and the Feminized Nation.” *Open Library of Humanities*, 5 (1), no. 8, 2018, 1-21, doi: org/10.16995/olh.385.

Chakrabarty, Dipesh. “The Difference: Deferral of (A) colonial Modernity: Public Debates on Domesticity in British Bengal.” *History Workshop*, no. 36, Autumn, 1993.

Chaudhuri, Supriya. “The Nation and Its Fiction: History and Allegory in Tagore’s Gora.” *South Asia: Journal of South Asian Studies*, 35, no. 1, 97-117, doi: org/10.1080/00856401.2011.648907.

Choudhury, Ajit. “Rethinking Maxism in India: The Heritage We Renounce”, in *Rethinking Marxism*, fall, 1995 Volume 8, Number 3.

Dalley, Hamish. “Realism in the Twentieth-Century Indian Novel: Colonial Difference and Literary Form by Ulka Anjaria.” *The Cambridge Journal of Postcolonial Literary Inquiry*.” 1, issue 02, September, 2014, 301-302, doi: 10.1017/pli.2014.6.

Das, Anirban. *Sexual Difference in Historiography: Writing the Nation in ‘My Life’* in Occasional Paper 9, School of Women’s Studies, *Scripting the*

Nation: Bengali Women's Writing 1870's to 1960's. Kolkata: J.U. Press, 2009.

___. *Not for A Place of Her Own: Beyond the Topos of Man* in Occasional Paper 167, Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta. March 2009.

Derrida, Jacques, et al. "Women in the Beehive: A Seminar with Jacques Derrida." *A Journal of Feminist Studies*, 16.3, Fall 2005. 139-157.

Dhar, Anup. "Girindrasekhar Bose and the History of Psychology in India." *Indian Journal of History of Science*, 53.4, 2018, T198-T204, doi: 10.16943/ijhs/2018/v53i4/49545.

Dutta, B. C. "Hand Book of Calcutta." *All India Educational Conference Calcutta*, XIII session, 1937.

Ghosh, Srabashi. ""Birds in a Cage" Changes in Bengali Life as Recorded in Autobiographies by Women." *Economic and Political Weekly*. XXI, no. 43, October 25, 1986.

Gupta, Charu. "The Icon of Mother in Late Colonial North India: 'Bharat Mata', 'Matri Bhasa' and 'Gau Mata'." *Economic and Political Weekly*. November 10-16, 2001.

Haraway, Donna J. "A Manifesto for Cyborgs: Science, Technology, and Socialist Feminism in the 1980's." *Socialist Review*, no. 80, 1985.

Irigagay, Luce and Noah Guynn. "The Question of the Other." *Yale French Studies*, 0, issue 87, 1995.

John, Mary E. "Alternate Modernities? Reservations and Women's Movement in 20th Century India." *Economic and Political Weekly*. October 28, 2000.

Joshi, Umashankar. "Modernism and Literature." *Indian Literature*, 1, no. 2, Sahitya Akademi, April-September 1958.

Kaviraj, Sudipta. "An Outline of a Revisionist Theory of Modernity." *European journal of Sociology*, 46, issue 3, 497-526 doi: 10.1017/S0003975605000196. ___. "Modernity and Politics in India." *Daedalus*, 129, no. 1, Winter, 2000. 137-162.

Misra, Girishwar. “Psychology & Psychoanalysis.” *History of Science, Philosophy and Culture in Indian Civilization*, XIII, part 3, 2013.

Mohanty, Chandra. “Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourses.” *Feminist Review*. Autumn, no. 30, 1988.

Nair, Janaki. “On the Question of Agency in Indian Feminist Historiography”, *Gender and History* 6, 82-100, 1994.

Ray, Bharati, edited by. “Women of India: Colonial and Postcolonial Periods.” *History of Science, Philosophy and Culture in Indian Civilization*, IX, part 3. New Delhi: PHISPC association with Pauls Press, 2005.

Roy, Ananya. “City Requiem. Calcutta: Gender and Politics of Poverty.” *Globalization and Community*, 10. Minneapolis, London: University of Minnesota Press, 2003.

Sarkar, Tanika. “Nationalist Iconography: Image of Women in 19th Century Bengali Literature.” *Economic and Political Weekly*. November 21, 1987. 2011-2015.

___. “Birth of a Goddess: ‘Vande Mataram’, *Anandamath*, and Hindu Nationhood.” *Economic and Political Weekly*. Setember 16, 2006.

Spivak, Gayatri Chakravarty. “Three Women’s Text and a Critique of Imperialim.” *Critical Inquiry*, 12, no. 1, Autumn, 1985.

Tharu, Susie and tejaswini Niranjana. “Problems of Contemporary Theory of gender.” *Social Scientist*, 22, no. ¾, March- April, 1994.